ওঁ তৎসৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি।

কলিকাতা।

৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে শ্রীহরিশঙ্কর
মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

[মূল্য ৷৹ বার আনা মাত্র।

৺দ্বারিকা নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্র নাথ
ঠাকুরের পুত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র,
আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ
প্রণেতা, কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী
শাণ্ডিল্যগোত্র,
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি
কর্ত্তৃক বিরচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থ ১৮৩১
শক, ৫০১০ কলিগতাব্দে ৮০ ব্রাহ্ম সম্বতে শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে
কুম্ভরাশিস্থ ভাস্করে শুভ শ্রীপঞ্চমী দিবসে ২রা ফাল্গুন সোমবারে প্রকাশিত হইল।

সালিখা যন্ত্রালয়ে শ্রীনফর চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
কলডাঙ্গা লেন, সালিখা, হাবড়া।

উৎসর্গ পত্র।

অখিলমাতার মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি মাতৃদেবী
শ্রীনীপময়ী দেবীর শ্রীচরণে এই গ্রন্থ-
খানি ভক্তিভরে উপহৃত হইল।

সেবক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ভূমিকা।

পরমাত্মা এক, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতচরাচরের জীবগণ অনেক। গন্তব্য এক, গমনের পথ অনেক। সমুদ্র এক, নদনদী অনেক। এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি স্থূলত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—দ্বৈতবাদমূলক এবং অদ্বৈতবাদমূলক। এই উভয় মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বৃথাই দ্বন্দকলহ চলিতে দেখা যায়। আমাদের মতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মতত্ত্বের এপিঠ ও ওপিঠ। সংসারে থাকিতে গেলে চরাচরের সকল বস্তুকেই তাহাদের যথাযথ স্থানে রাখিয়া যথাযথ ব্যবহার করিতে হয়। সংসারের উপরে উঠিলে ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না—সর্ব্বময় ব্রহ্ম তখন স্বপ্রকাশ। বর্ত্তমানে আমরা যেরূপ শারীরিক প্রভৃতি অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে অনেক সময়েই সংসারে বিচরণ করিতে বাধ্য, কেবল সময়ে সময়ে মাত্র সংসারের পরপার উপলব্ধি করিবার অবসর পাই। সংসারকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সংসারের অতীত হইবার চেষ্টা বৃথা। সংসারে থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ সংসারের অতীত হইতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে। সংসারের পরমাত্মাকে প্রিয়তম জানিতে পারিলে সংসারের অতীত পরমাত্মাকে সর্ব্বগত ও বিশ্বরূপ জানা সহজ হয়। সংসারের মধ্যে থাকিয়া পরমাত্মাকে ডাকিবার মত ডাকিতে চাহিলে বোধ হয় দ্বৈতমূলক ব্রহ্মতত্ত্বই বিশেষ সহায়। সংসারের অতীত অবস্থায়

দাঁড়াইয়া একমেবাদ্বিতীয়ংরূপে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে অদ্বৈততত্ত্বই বোধ হয় এক মাত্র অবলম্বন। দ্বৈতবাদ যতদূরই অগ্রসর হউক, তাহা সোপান মাত্র। অদ্বৈততত্ত্ব ধ্রুব লক্ষ্য। দ্বৈতমূলক মতরাজ্যে এই কারণে নানা ভেদসংস্থান দৃষ্ট হয়। প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্বের রাজ্যে মূলগত কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারের ধর্ম্ম, গৃহস্থের ধর্ম্ম, সুতরাং বলা বাহুল্য দ্বৈতমূলক। সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার জন্য যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস যে সেই সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মই—তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা নাই, এই কারণে তাহা সমগ্র মানবজাতির ব্রহ্মপথে অগ্রসর হইবার একটী অত্যুৎকৃষ্ট অবলম্বনীয় পন্থা। এই পন্থা অবলম্বনে যখন আমরা সংসারের অতীত হইতে শিক্ষা করিব, তখন দ্বৈতবাদের বন্ধন ধীরে ধীরে আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে খসিতে থাকিবে। আমরা ক্রমশঃ অদ্বৈততত্ত্বের পূর্ণজ্যোতি ধারণে অভ্যস্ত হইয়া পড়িব।

সংসারের ভেদতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বর্গীয় পিতৃদেব সেই ব্রাহ্মধর্ম্মভিত্তি অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহের বিবৃতি করিয়া "ব্রহ্মদর্শন সত্যং" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে দেহান্তর প্রাপ্তিবশতঃ তাঁহার সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। "ব্রহ্মদর্শন" বাক্যটী আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে অধিরূঢ় থাকিবার কালে যখন বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সেই সময়ে এই ব্রহ্মদর্শনের ভাব

আংশিকরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থোক্ত শ্লোক ও বিষয় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সূত্রে তাহাদের অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব সকল বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতাম। সেই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আমি সেগুলি যথাযথ পরিবর্ত্তন সহকারে একত্র সঙ্কলিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। এবিষয়ে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয়। ব্রহ্মতত্ত্বের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্ভ এবং এবিষয়ে আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। কিন্তু ব্রহ্মনামযে কোন উপায়ে হউক শুনিতে ও শুনাইতে আমার ভাল লাগে, তাই এই ধৃষ্টতা! এই গ্রন্থ সাধুসর্জ্জনের হস্তে পড়িয়া অন্তত ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের কর্ণে ব্রহ্মনামের অমৃতবারি বর্ষণ করিবে, তাহা স্মরণ করিয়াই আনন্দপুলকে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে।

যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলিকে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোক ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে পাঠকবর্গের এই গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণার পক্ষে সুবিধা হইবে আশা করি।

এই গ্রন্থ যদি বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে একটী আত্মারও ব্রহ্মসাধনে সহায়তা করে, তবেই আমার প্রাণের ইচ্ছা ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। সেই আশায় মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে বারম্বার নমস্কার করি।

যোড়াসাঁকো, কলিকাতা,
২রা ফাল্গুন, ১৮৩১ শক,
১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ,
সোমবার।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অনুক্রমণিকা।

—————

ওঁ তৎসৎ

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি।

অভয় প্রার্থনা। *

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমার মহিমা গাহিবারে
যাচি হে অভয়দান।
অভয় পাইয়া দিশি দিশি
শোনাব তোমারি নাম॥

হাসিয়া উঠিবে তরু লতা
পাইয়া নূতন প্রাণ।
উঠিবে গাহি বিহগগণে
উচ্ছ্বাসপূরিত গান॥

পাপতাপ যত দূরে যাবে
শুনিয়া তোমার নাম।
পুণ্য প্রেম আসিবে সে গানে
করিবারে যোগদান॥

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩ কল্প, ১ ভাগ, ১৮১০ শক কার্ত্তিক।

বিশ্বজগত উঠিবে জাগি
করি' সে অমৃত পান।
মাতি' হরষে করিবে শুধু
তব দেব! জয়গান॥
জয় জয় ভগবান।
তব দেব জয়গান॥

উদ্বোধন।

যে দেবতা সম্মুখের এই অনন্ত আকাশে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছেন, যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমরা অন্তরে সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ অনুভব করিতেছি; অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, সেই দেবতাকে, আইস, আজ এই শুভ দিবসে আহ্বান করিয়া আমাদের আত্মাতে তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি। সেই আত্মার আত্মাকে ভুলিও না। "যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও।" সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে ভুলিও না। আমাদের এই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য বাহিরের উপকরণ কিছুই আবশ্যক নাই, অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার উপকরণই তাঁহার পূজার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের এই পূজায় দেবতার বিসর্জ্জন নাই। যতই হৃদয়কে পবিত্র করিব, যতই আত্মাকে উন্নত করিতে থাকিব, যতই অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকলকে শাসনে রাখিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিব, ততই নবনবরূপে আমাদের আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হইবেন। আজ এই ব্রহ্মপূজা উপলক্ষে আমাদের হৃদয় কত না পবিত্র হইতেছে, আত্মাতে পরমাত্মার কত না প্রকাশ অনুভব করিতেছি। আইস, আমরা সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরমেশ্বরকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই গুণগানে প্রবৃত্ত হই, ভক্তিভরে তাঁহারই চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

প্রথম বিবৃতি—ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা। *

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।

[রাত্রে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র পুষ্পে সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইলে একটী বেদগান হইল ; পরে একটী সঙ্গীত হইলে—]

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

যে পরমদেবতা আমাদিগকে আজ এই সভামণ্ডপে আনয়ন করিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই এবং তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।

যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত শতসহস্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে ; যে ব্রহ্মাণ্ডে "যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক ;" যেখানে ঐ অসীম আকাশস্থিত এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্যসমান, সেখানে আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র! আবার যে পৃথিবীতে শত শত সাধু মহাত্মা ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মোক্ষপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেখানে আমার ন্যায় দীনহীন মলিন বঙ্গবাসী কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর! আমার সাধ্য কি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সম্যক্ গুণ-কীর্ত্তন করিতে পারি।

---

* পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে যোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর-ভবনে ৬৫ ব্রাহ্মসম্বতে, ১৮১৬ শকে ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে বিবৃত।

আমি আমার দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার মধ্যে এমনি আবদ্ধ যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের পক্ষ-সমর্থন করিয়া বিশেষ যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিব, সে আশা করি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছেন, তেমনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন, আমরা তাহা গ্রহণ করি বা নাই করি; আমরা তাহার পক্ষে দুটো কথা বলি বা নাই বলি। তবে আমি আজ এখানে কিছু বলিতে দাঁড়াইয়াছি কেন? এই যে সাধুসজ্জনদিগের সমাগম হইয়াছে, ইহাঁদিগের নিকটে প্রাণের আশা ভরসার কথা বলিবার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? আমিও সেই লোভে পড়িয়াই এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি এবং আমার ইহাও আশা আছে যে, আমার আশাভরসার কথা সমাগত সাধু সজ্জনদিগের হৃদয়স্পর্শ করিবে এবং তাঁহাদিগের হৃদয়োত্থিত সহানুভূতি-বিশিষ্ট মুখশ্রীতে ঈশ্বরের মঙ্গলকিরণ দেখিতে পাইব।

আজই বা এত সাধু মহাত্মাদিগের সমাগম হইল কেন? অনন্ত আকাশে প্রতিদিন যে প্রভাততপন পূর্ব্বসমুদ্রকে রঞ্জিত করিয়া উদিত হয়, আজও প্রভাতে সেই সূর্য্যই উদিত হইয়াছিল। প্রতিদিন যেমন অযুতকোটি গ্রহনক্ষত্র নৈশগগনকে হীরকখচিত করে, আজও সেইরূপ নৈশগগন হীরকখচিত হইয়াছে। প্রতিদিন যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের জীবনদান করে, আজও সেই বায়ুই আমাদিগের জীবনদান করিতেছে। প্রতিদিন যে জাহ্নবী বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামল করিয়া প্রবাহিত হয়, আজও সেই জাহ্নবীই প্রবাহিত হইতেছে। তবে আজ এই সাধুসজ্জনদিগকে এখানে নব উৎসাহে, নব আনন্দে, জাগ্রতভাবে আসিতে দেখি কেন? ইহাঁরা

কি এই গৃহপ্রাঙ্গনকে সুসজ্জিত মাত্র দেখিতে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছেন? ইহাঁরা কি সঙ্গীতের সুমধুর স্বরমাত্র শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে আসিয়াছেন? আমার তাহা হৃদয়ে লয় না। গৃহপ্রাঙ্গন প্রতি বৎসরই সুসজ্জিত হয়, তাহাতে নূতনত্ব কোথায়? এই গৃহপ্রাঙ্গন অপেক্ষা কত শত গিরিকানন উপবন অধিকতর সুসজ্জিত আছে, কিন্তু আজ তো তাহারা আমাদিগকে প্রলোভন দেখাইতে পারিতেছে না। সঙ্গীতের সুমধুর স্বরই যদি এই সাধু-সমাগমের কারণ হয়, কত মধুরতর সঙ্গীত আরও কত-স্থানে গীত হইতেছে, কিন্তু সেই সকলতো আজ আমাদিগকে প্রলোভিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। তবে আজ কিসের কারণে এই সাধুসমাগম? অদ্যকার দিনে কি নূতনত্ব আছে যে তাহার বলে আকৃষ্ট হইয়া আজ আমরা এই শুভ স্থানে সমাগত হইয়াছি?

অদ্য ব্রহ্মোৎসবের দিবস। এই ব্রহ্মোৎসবে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি চিরপুরাতন হইয়াও এই ব্রহ্মোৎসবের নূতনত্ব বিধান করিতেছেন। তাঁহারই প্রেমা-কর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা নবোদ্যমে নবোৎসাহে বৎসরান্তে পুনরায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমরা তাঁহার করুণা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি। আজ, সুহৃৎগণ, আইস, দ্বেষহিংসা হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করি। যখন পৌত্তলিকতা এবং তীব্র জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় বলবৎ সম্প্রদায়বিদ্বেষরূপ বিষকীট, উভয়ে মিলিত হইয়া এই পবিত্র ভারতভূমির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জরাজীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর যে উদারহৃদয় মহামনা ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার মনে একটা গুরুতর অভাব

বোধ হইতে লাগিল। কোন্ সত্যধর্ম্মের উপরে সকলে মিলিতে পারে, কিসে পরস্পরের মধ্য হইতে উপধর্ম্মমূলক বিরোধ বিবাদ চলিয়া যাইতে পারে, এই প্রশ্নই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তৃষ্ণা দিয়া তৃষাতুরের জন্য যিনি জলের সৃজন করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়া যিনি ক্ষুধাতুরের জন্য অন্নের সৃজন করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়ের সেই অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। সেই মহান্-হৃদয় ক্ষণজন্মা পুরুষ একাকী নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের সকলেরই মধ্যে অত্যন্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান কালে সাম্প্রদায়িকতারূপ বাঁধ ভাঙ্গিবার প্রথম সূত্রপাত করিলেন।

জগতে যতগুলি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সকলগুলিই প্রায় সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ। প্রায় সকল ধর্ম্মেই এমন এক এক সাম্প্রদায়িক ভাব, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, যাহা অবলম্বন না করিলে সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মনেই হয় না যে ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল। কোন ধর্ম্ম বলিল যে অমুক মহাপুরুষকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিতে হইবে; কোন ধর্ম্ম বলিল যে অমুক মহাপুরুষকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রেরিত বলিয়া মানিতে হইবে। একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িকতার এতটুকুও গন্ধ পাওয়া যায় না, দ্বেষহিংসার উল্লেখ নাই, আত্মাভিমানের স্ফীতি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদারভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে "মনুষ্যমাত্রেরই আত্মাতে ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি

কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই।” যেমন পৃথিবীর যাবতীয় নদী সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বরই সকল মনুষ্যেরই গম্যস্থল। “নৃণামেকোগম্যস্তমসি পয়সামর্ণবইব।” এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন অতীত কালের ধর্ম্ম, তেমনি বর্ত্তমান কালেরও ধর্ম্ম; যেমন বর্ত্তমান কালের, তেমনি ভবিষ্যত কালেরও ধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন বঙ্গদেশের ধর্ম্ম, তেমনি সমগ্র ভারতেরও ধর্ম্ম; যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র পৃথিবীরও ধর্ম্ম; যেমন পৃথিবীর, তেমনি ইহা প্রতি-জনেরও ধর্ম্ম; ইহাই সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম এবং ইহাই মানবের সহজ ধর্ম্ম।

আজকাল আমরা এই সনাতন সত্যধর্ম্মের—ব্রাহ্মধর্ম্মের—প্রচার বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হইতেছি। চারিদিক হইতেই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অন্বেষণে সকলকেই ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে—ইউরোপে, আমেরিকায়—এই বিষয়ের বিশেষ আন্দোলনই দেখা যাইতেছে; সেখানে মহাত্মা লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক দলাদলিতে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া এখন ধর্ম্মের এমন কতকগুলি মূলসত্য অন্বেষণ করিতেছেন, যেগুলিতে তাঁহারা নির্ব্বিবাদে একত্র মিলিতে পারেন। এই বিষয়ের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্মের এই মূলসত্য অন্বেষ-ণের প্রারম্ভভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কি পরিতাপের বিষয় যে, আমরা তেমন শোভনসুন্দর, আকাশের ন্যায় মুক্ত ও উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমরা দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের যে তরঙ্গ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়াছিল, এখন তাহা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বিস্তৃত আকারে ভারতে আসিয়া লাগিয়াছে। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের—তাহাকে যে নামেই অভিহিত কর না কেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের

দুর্দ্ধর্ষ তেজ নিরীক্ষণ করিয়া নাস্তিকেরাও ভয়ে কম্পমান হইতেছে, আপনাদিগকে আর নাস্তিক বলিতে ইচ্ছা করে না; বরঞ্চ তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ করিতেছে। আমাদের এইটুকু দুঃখ যে, আমরা যে এতদিন অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, স্বদেশীয়গণ তাহা তত আদরে গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহার প্রশংসা করিলেন, অমনি স্বদেশীয়গণ তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা যে এক ধর্ম্মধনে ধনী ছিলাম, সেই ধর্ম্মবিষয়েও কত পরাধীন, কত দুর্ব্বল, কত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল কেন্দ্র দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা সমুদ্র, জীবাত্মা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। সমুদ্র না থাকিলে যেমন কোন স্রোতস্বতী থাকিতে পারে না, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মার অস্তিত্বই সম্ভবে না। পরমাত্মা সূর্য্য, জীবাত্মা চন্দ্র। সূর্য্যের কিরণেই যেমন চন্দ্র কিরণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মার অস্তিত্বে জীবাত্মার অস্তিত্ব, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানে জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞান, তাঁহার অনন্তত্বেই জীবাত্মার পরিমিত ভাব। পরমাত্মা আতপ, জীবাত্মা ছায়া। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, তেমনি পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় (পরস্পর ভিন্ন) করিয়া বলেন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অতি মধুর সম্পর্ক। তিনি পিতা, আমরা পুত্র। "সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা।

আমরা যেমন আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে পরমাত্মাকে জানিয়া কৃতার্থ হইতেছি, প্রাচীন ঋষিরাও তাঁহাদের পরিপুষ্ট ও সুমার্জিত সহজ-জ্ঞানে ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেমন সহজে পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং"—একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই যাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ—বলিলেন। তাঁহারা কেমন বলের সঙ্গে বলিলেন:—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥"

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না; যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন?

"এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূলচ্ছেদন করা হয় এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে এবং কার্য্যকারণের অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কথনো জ্ঞানগোচর নিত্য সত্য মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হয়েন এবং ঈশ্বরসহবাস-জনিত সুনির্ম্মলা শান্তি কদাপি লাভ করিতে পারেন না।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্রদ্বয় পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং তাহার ভিত্তি আত্মপ্রত্যয়, এই কারণে একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইতে পারে; কারণ এই তিনটী সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, জাতি-নির্ব্বিশেষে, ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিজস্ব। ইহার বাহিরে

গিয়া পরিমিত সৃষ্ট কোন বস্তুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে রাখিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিলেই তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে। সাম্প্রদায়িকভাব প্রবেশ করিলেই সত্যধর্ম্ম কলুষিত হইয়া যাইবে। "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া বেদ যাঁহাকে বারম্বার ঘোষণা করিয়াছেন এবং আমাদের আত্মাও যাঁহাকে ঐ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া সহজেই জানিতেছে, যাঁহার স্বরূপই হইল অনন্তত্ব, তিনি কথনো দেশে, কালে, জ্ঞানে, শক্তিতে, কি কোন বিষয়ে পরিমিত হইতে পারেন না। "নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ" ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হন নাই। ইনি নির্ব্বিকার, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব।

এই আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে আমাদিগের এখন দুইটী প্রধান বিঘ্ন বাঁচাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে চালাইতে হইবে—পরিমিত সৃষ্ট বস্তুর পূজা এবং নাস্তিকতা। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মতরণী বর্ত্তমান সংসারস্রোতের প্রতিকূলে চলিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ ইহা আমাদিগকে লক্ষ্যস্থান ব্রহ্মধামে লইয়া না যাইবে, ততক্ষণ ইহা আর কোথায়ও দাঁড়াইতে পারিবে না—স্রোতের একদিকে সৃষ্টবস্তুর পূজারূপ প্রস্তররাশি, তথায় লাগিলেই তরণীথানি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে; অপরদিকে নাস্তিকতার "কাছাড়ভূমি," তথায় লাগিলেই প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তরনীকে একেবারে জলমগ্ন করিয়া দিবে। আমরা যদি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-তরণীকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধামের দ্বারে পৌঁছিতে পারি, তবে, যেমন হরিদ্বার হইতে ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত গঙ্গানদী আর্য্যাবর্ত্তকে শস্যশ্যামল, ফলফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মধামযাত্রীর প্রত্যেকেই ব্রহ্মধামের দ্বার হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের এমন এক এক প্রবল স্রোত আনয়ন করিবেন,

যে সকল স্রোত কেবল বঙ্গদেশকে কেন, কেবল ভারতবর্ষকে কেন, সমগ্র জগৎকে আপ্লাবিত করিয়া দিবে এবং জ্ঞানপ্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রভৃতি শস্যসমূহ উৎপাদিত করিয়া এই কঠিন ধরণীকে শ্যামল করিয়া তুলিবে।

আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কিরূপ অসাম্প্রদায়িক, সাম্প্রদায়িকতার কঠিন শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার কি কঠোর ব্রহ্মাস্ত্র, তাহার পরিচয় ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের মূল মন্ত্র এই—"সর্ব্বস্রষ্টা, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনা দ্বারাই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।" এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে যিনি বিশ্বাস করিবেন, তিনিই ব্রাহ্ম, তিনিই ব্রহ্মোপাসক; আর এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে কে না সম্পূর্ণ সায় দিবে? ঈশ্বর স্বয়ং সকলের মিলনের ভিত্তিভূমি করিয়া এই উদার ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রেরণ করিয়াছেন। যতদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধমূলক এই বীজ অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বন্ধন চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই ইহা সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কেহ কেহ বলেন বটে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলে ধারণা করিতে পারে না এবং সুতরাং ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নহে—তাহা নিতান্তই ভ্রম। আমি অসভ্য সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা আকাশের দিকে কেমন প্রশস্তভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল যে তাহাদের প্রধান দেবতা ঐ আকাশের মধ্যে। কবীর বড় বিদ্বান্ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীত দেখ—কি গভীর জ্ঞানের কথা—

পানিমে মীন পিয়াসীরে
মোক শুনত শুনত লাগে হাসিরে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে খোঁজত ফেরত উদাসীরে।
আত্মজ্ঞান বিনা নরভটকে কেয়া মথুরা কেয়া কাশীরে।
কহত কবীর শুন ভাই সাধো সহজ মিলে অবিনাশীরে।

জলের মধ্যে মৎস্য বাস করিয়াও তৃষ্ণাতুর; এ কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিতেছে। সকল বস্তুতেই পূর্ণব্রহ্ম, আর লোকে উদাসী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া ফেরে। আত্মজ্ঞান বিনা মনুষ্যের মথুরাই বা কি আর কাশীই বা কি। কবীর বলে, শুন ভাই সাধু, অবিনাশী পরব্রহ্মকে সহজেই পাওয়া যায়।

নানক কি সুন্দর ভাষায় বলিতেছেন—

থাপিয়া ন জায়ি কীতা ন হোই
আপি আপ নিরঞ্জন সোই।"

কেহ তাঁহাকে কোথাও স্থাপনা করিতে পারে না; কেহ তাঁহাকে হাত দিয়া গড়াইতেও পারে না,—আপনাতে আপনি, নিরঞ্জন তিনি।

এইরূপে একদিকে কবীর, নানক, দাদু, প্রভৃতি সাধক—যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না—অপরদিকে উপনিষদাদির জ্ঞানী ঋষিগণ, ইহাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিলে কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারি না যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদ্বান্ অবিদ্বান্, ধনী দরিদ্র সকলেরই উপযোগী। তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম একথা বলেন যে, যে পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া আত্মার অন্তরত্মাকে অন্বেষণ করিবে, তাহারই নিকটে সেই স্বপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।

যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

ভ্রাতৃগণ! আইস, আমরা এই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। সমস্ত হৃদয়ের সহিত সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের জয়ঘোষণা করি। সংশয় ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান করি এবং জাগ্রত হই। যে ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করিয়া এক সময়ে এই ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং যে ব্রহ্মবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া আজ আমরা এত হীন হইয়া পড়িয়াছি, এস, সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রাণপণে অবলম্বন করি, অচিরাৎ উন্নতি দেখিতে পাইব। কে বলে যে ব্রহ্ম-বিদ্যা আজ মৃতপ্রায়? ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি যখন অবিনশ্বর ঈশ্বর হইতে, তখন তাহা মৃতপ্রায় হইবে কিরূপে? তাহা যদি মৃতপ্রায় হইবে, তবে তাহা কি প্রকারে আজ আমাদিগের অন্তরে প্রাণ আনয়ন করিতে সক্ষম হইল? এস, সেই ব্রহ্মবিদ্যার বলে প্রাণবান্ হইয়া "সকল ছলনা ছাড়ি বিমল করি অন্তর, করি স্বার্থ বলিদান সত্যের উদ্দেশে।" অপমান অবনতি প্রভৃতি অমঙ্গলরাশি নিমেষে ঘুচিয়া যাইবে এবং ভারতের উপরে পুনরায় মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হইবে। এস, সকলে একহৃদয়ে পরস্পরকে বলি—

"এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।"

এই আত্মস্বরূপে অবস্থিত নিত্য পরমাত্মাই জ্ঞেয়। তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

"তমেবৈকং জানথ আত্মান মন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ"

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে
ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক
প্রথম বিবৃতি সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বিবৃতি—ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ।*

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ॥

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং। সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি॥

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব॥

[৭ পৌষ সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বন্দনাগীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের পর—]

---

* ১৮১৫ শক, ৬৪ ব্রাহ্মসম্বৎ, ৭ই পৌষ দিবসে বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরে তৃতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে বিবৃত।

"রসোবৈ সঃ" পরমেশ্বর রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। আজ এই উৎসবের দিনে, আইস সকলে মিলিত হইয়া একপ্রাণ হইয়া সেই ব্রহ্মনামের জয়-ঘোষণা করিয়া জীবনকে সার্থক করি। আজ আইস আমরা সেই ভূমানন্দ পরমদেবের নামোচ্চারণ করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিয়া আনন্দ লাভ করি। আজ যেন আমরা হৃদয়কে নিরানন্দে পূর্ণ হইতে না দিই। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ নিরানন্দকে সঙ্গে আনিয়া থাকেন, তিনি যেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া না যান; যিনি রিক্তহস্তে আসিয়াছেন, তিনি যেন পূর্ণহস্তে আনন্দ-মনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন; যিনি নিরাশাকে বহুদিন যাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, আজ যেন তাঁহার আশার সঞ্চার হয়। আর কিসের জন্যই বা হৃদয়কে নিরানন্দ ও নিরাশা-হ্রদে নিমগ্ন রাখিব? আমাদের এই উৎসবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কেবল আজ নহে, তিনি কি চিরকালই আমাদের সঙ্গে নাই? আর তিনি কি জীবন্ত জাগ্রত নহেন? তিনি যখন জীবন্ত জাগ্রত দেবতা এবং সেই পরমদেব যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন, তখন আমাদের নিরানন্দই বা কিসের আর নিরাশাই বা কিসের? বৈদিক ঋষি সেই মহান্ আত্মাতে আপনার আত্মা সমর্পণ করিয়া নিজেও নির্ভয় হইয়াছেন এবং সকলকেই এইরূপে নির্ভয় হইতে বলিতেছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দ জানিলে সাধক আর কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হয়েন না। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, আর তাঁহারই উদ্দেশে এই উৎসব; আজ এই উৎসবের দিনে সকলে নিরানন্দ ও নিরাশাকে দূরে পরিত্যাগ করুন এবং সকলে আশান্বিত হউন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই, সত্যের জয় হইবেই।

বর্ত্তমান কালের অবস্থা যিনি একটু বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা

করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারিবেন যে সত্যধর্ম্মের অনুকূল বাতাস চারিদিক হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা এ ভাব দেখিতে পাই নাই। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বৈজ্ঞানিকদিগেরও মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহাদেরও সত্য-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। সত্যধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবৃদ্ধিই সেই মহান্ অজ আত্মার জাগ্রত সত্তা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছে। এই যে সে দিন আমেরিকাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মহাসঙ্ঘ বসিয়াছিল, তাহাতে কি সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই হস্ত দেখা যায় না? সেখানে নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আলোচনা হইলেও অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের, ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার দেশভেদে নামান্তর মাত্র, সেই সত্যধর্ম্মেরই আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহা আমাদের অল্প আশার কথা নহে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের পণ্ডিতেরা এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়া একই জাগ্রত জীবন্ত দেবতা পরমেশ্বরেরই চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিলে আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আরও আশার কথা এই যে আমাদের স্বদেশেই আজকাল সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। নানা সূত্রে উপনিষদ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, সেই সকলের আলোচনা বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে অতি আহ্লা-দের বিষয়। আমরা জানি যে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মপিপাসু ব্যক্তি কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পরিণামে তাঁহাকে অধ্যাত্মধর্ম্মে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মে পৌঁছিতেই হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে, এই কারণে সকল ব্যক্তিই, সকল জাতিই আপনার আপনার যত্ন ও চেষ্টা

দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে বটে; কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব অনেক বিজ্ঞানশাস্ত্র, অনেক দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া নির্ণয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন এবং এখনও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতেছেন না, ঋষিরা সেই সকল সত্য বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে সহজজ্ঞানের বলে উপলব্ধি করিয়া এরূপ জলন্ত অগ্নিময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে তাহা শ্রবণমাত্রেই অন্তরে মুদ্রিত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বীজ চারিটী—(১) পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে, (২) তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, (৩) একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় এবং (৪) তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে জগত সৃষ্ট হইয়াছে। সেই অনন্তস্বরূপের প্রতিই আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতি ও ভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। অনন্তস্বরূপ আমাদের যে প্রীতিভক্তি আকর্ষণ করেন, কোনো পরিমিত পদার্থ সে প্রীতিভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না। একমাত্র সেই ভূমা পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিলে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়; পরিমিত পদার্থের উপাসনাতে আমাদের মঙ্গল নাই, আমাদের শ্রেয় নাই। পরিমিত পদার্থের উপাসনা করিলে, উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক আইসে। ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে অমঙ্গল উপধর্ম্মের এক প্রধান সহচর। এই কারণেই বোধ করি শাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে অতি কঠোর নিন্দাবাদ আছে। শাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এখন দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বীজ সেই ভূমা পুরুষের স্বরূপ অবগতির উপর নির্ভর করিতেছে। কত শত

ব্যক্তি যাঁহাকে জানিবার জন্য হতাশ হৃদয়ে গিরিনদীকানন সকল অতিক্রম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহস্র দার্শনিক যুক্তি ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সত্ত্বেও স্বীয় গর্ব্বদোষে যাঁহার জ্ঞানের ও মঙ্গলভাবের পরিচয় পদে পদে পাইলেও যাঁহাকে জানিতে পারেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদ-মন্ত্রে প্রাচীন ঋষির অগ্নিময় সরল ভাষায় সেই অতিমহান্ পরমাত্মার স্বরূপ কেমন সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥" তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত; শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

তিনি স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বব্যাপী; তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি অকৃত-কারণ। সৃষ্টিকার্য্য একটী প্রণালীমাত্র; সৃষ্টিকার্য্যের কারণ সৃষ্টির অতীত ইচ্ছাময় মহান্ পরব্রহ্ম। তাঁহার আদি নাই, কারণ নাই, সুতরাং তিনি জন্মরহিত, অনাদি; তিনি চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান আছেন। যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে; সুতরাং যিনি অনাদি, তিনি অনন্তস্বরূপ ভূমা পরব্রহ্ম। তিনি দেশকালের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন নহেন; এই কারণেই তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী। সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আছেন বলিয়াই জগতের অশেষ বিচিত্রতার মধ্যেও এক মহান্ ঐক্য বিরাজ করিতেছে। সূর্য্যে গিয়া দেখ, সেখানেও যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেও সেই শক্তি কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তি হিমাচ্ছন্ন সুমেরুকেন্দ্রেও কার্য্য করিতেছে এবং সেই শক্তি সাহারার মরুভূমিতেও কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তি মহান

হিমাচলের শিখরদেশেও কার্য্য করিতেছে এবং সেই শক্তি সামান্য বালুকার উপরেও কার্য্য করিতেছে। তিনি নিরবয়ব; তিনি শিরা ও ব্রণরহিত। তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি তো অন্তত দেশে পরিমিত সীমাবদ্ধ হইতেন। তাঁহার যখন্ শরীর নাই, তখন তাঁহার শিরা প্রভৃতি কোন প্রকার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও থাকিতে পারে না এবং তাঁহার কোন প্রকার শারীরিক পীড়া বা যন্ত্রণাও হইতে পারে না। তিনি অন্তর্যামী থাকিয়া সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। জগতে যত জীব আছে, তন্মধ্যে যাহার যাহা প্রয়োজনীয় এবং যে, যে বিষয়ের উপযুক্ত, তাহাকে তিনিই তাহা প্রদান করিতেছেন। তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তাঁহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। আমাদের অন্তরে যে সদসৎ জ্ঞান আছে এবং অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া সৎ পথে চলিবার যে প্রবৃত্তি আছে, তাহাই পরমেশ্বরের শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি অনাদ্যনন্ত পুরুষ, তাঁহাতে পরিপূর্ণ ন্যায়পরতার বিন্দুমাত্র অভাব হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে পাপও স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মনীষী, মনের নিয়ন্তা। তিনি পশুপক্ষীদিগের মনকে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা মানসিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি মনুষ্যকে এরূপ নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন যে তাহারা আত্মাকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে পারে। তিনি আমা-দিগকে স্বাধীনতা দিয়া জগতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা যখনি সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না করিয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের দাস হইয়া পড়ি, তখনি তিনি উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া আবার আমাদিগকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনেন। আর যাঁহারা

তাঁহারি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে থাকিয়া তাঁহাকেই ভজনা করেন, তাঁহারা ক্রমিকই উন্নতি লাভ করিয়া, উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে গমন করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহান্ পুরুষের অনন্তভাব আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন এবং আমরা যত্ন ও চেষ্টা করিলে যাঁহার জীবন্ত সত্তা আত্মাতে উপলব্ধি করি, সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর যখন আমাদের নিত্য-সহচর, তখন আমাদের নিরানন্দ কোথায়, নিরাশা কোথায়? সম্মুখের দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার পবিত্র প্রশান্ত ভাবের, তাঁহার মঙ্গল ভাবের কেমন সুন্দর পরিচয় দিতেছে। অদ্যকার এই উৎসবে তাঁহার উপস্থিতি জানিতে পারিয়া আমরা কত না আশান্বিত হইতেছি। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ কর। তখন এইস্থানে দস্যুদিগের ভীষণ আবাসস্থল ছিল, আর আজ এই স্থান ব্রহ্ম-নামে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! ধন্য সেই পরমেশ্বর! ধন্য তাঁহার মহিমা! যখন এখানে এই আশ্রম প্রভৃতি কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কে বা জানিত যে এই সুদূর পল্লীগ্রামে, লোকালয়শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে? এই আশ্রম পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের জীবন্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই আশ্রম, এই উৎসব আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে অনন্ত মঙ্গলস্বরূপের অনন্ত সত্যস্বরূপের রাজ্যে অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠা নাই, অসত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। আমরা যেন দু একটী অমঙ্গলকে জয়ী হইতে দেখিলে ভয়ান্বিত না হই। অমঙ্গলের আপা-তত জয় হইতে দেখিলেও পরিণামে তাহার সমূলে বিনাশ সাধিত হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমাদের আত্মাতে মঙ্গলস্বরূপের এই আশাবাণী নিত্যই শ্রবণ করিতেছি।

যতই সত্যধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম—জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের উপা-

সনা—জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই জগতে মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। জগতে মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হওয়াই ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা। আমাদের কর্ত্তব্য, এই ইচ্ছার প্রতিকূলে না যাইয়া আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহারই ইচ্ছার সহিত মিলিত করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে রত হই এবং ব্রহ্মোপাসনা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হই। এই ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল আমাদের মঙ্গল নহে, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিরও মঙ্গল সাধিত হইবে; এবং আমাদের সকলেরই কেবল ঐহিক নহে, অনন্তকালের জন্য পারত্রিক মঙ্গল হইবে।

চন্দ্রতপন যাঁহার অহরহ আরতি করিতেছে; দেবমনুষ্য একপ্রাণ হইয়া যাঁহার চরণবন্দনা করিতেছে; সর্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে তাঁহার এই জগতমন্দিরে এবং এই উৎসবক্ষেত্রে বর্ত্তমান দেখ, জাগ্রত জীবন্তভাবে উপলব্ধি কর। অনাদি কাল, অনন্ত গগন তাঁহারি অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; ধরণী তাঁহারই চরণে শত বিচিত্রবর্ণ বিচিত্রগন্ধ পুষ্প সকল উপহার দিতেছে এবং শত ভক্তজনের ব্যাকুল প্রাণ তাঁহার দর্শন পাইয়া আনন্দসঙ্গীত গাহিতেছে।

হে পরমাত্মন্! আজ এই উৎসবের দিবসে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও, আত্মাকে উন্নত করিয়া দাও। হে আনন্দস্বরূপ! আজ আমাদের সকলেরই আত্মা যেন তোমার সহবাসজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের শরীরে বল দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও, যাহাতে তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া সুবিশাল এই ভারতবর্ষে এক সুদৃঢ়-

তিতি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হই। আমাদিগের এই প্রার্থনা, হে পরমপিতা, আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ বিষয়ক দ্বিতীয়
বিবৃতি সমাপ্ত।

তৃতীয় বিবৃতি—ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ।

আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি—

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

পূজ্যপাদ পিতামহদেব এক পারিবারিক উপাসনার দিবসে বলিয়াছিলেন—"সমস্তজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে কি

বিস্তায় কি ধর্ম্মে কি অর্থে, উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।”

আজ প্রায় কুড়ি বৎসরের উর্দ্ধকাল অতীত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভের আশায় আমার নিজের চলিবার পথ স্থির করিয়া যে কয়েকটি মন্ত্র স্বীয় আত্মাতে সেই পথের নির্দ্দেশক স্তম্ভস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, এবং যে মন্ত্রগুলি আমার অধ্যাত্মপথে চলিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, আমার ন্যায় পশ্চাদ্বর্ত্তী পান্থদিগের অন্তত কতকাংশে উপকারে আসিতে পারে, এই আশায় ঈশ্বরের আদেশে সেই কয়েকটি মন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় তৃতীয় বিবৃতিস্বরূপে প্রকাশিত করিলাম।

মন্ত্রবিংশতি।

১। পরমপিতাকে সম্মুখে রাখিয়া সকল কার্য্য করিব।
২। পিতার ইচ্ছানুসারে এবং মাতৃ-আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিব।
৩। অনাসক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব।
৪। প্রতিদিন অন্তত দুইবেলা উপাসনা করিব।
৫। কাম প্রভৃতি ষড়রিপু হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিব।
৬। কলহ প্রভৃতি দুশ্চিন্তার স্থানে কদাপি যাইব না।
৭। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা ত্যাগ করিব।
৮। মিথ্যা কথা বলিব না।
৯। মিথ্যা ছলে লেখাপড়া বন্ধ করিব না।
১০। সাধ্যমত ধর্ম্মপুস্তক পড়া বন্ধ করিব না।
১১। কোন কর্ম্ম (বিশেষত মন্দ কর্ম্ম) লুকাইতে যাইব না।
১২। সাধু ব্যতিরেকে কাহারও সঙ্গগ্রহণ করিব না।

১৩। উপায় থাকিতে পরগৃহে বাস করিব না।

১৪। কাহারও প্রতি মন্দদৃষ্টি করিব না।

১৫। পরশ্রীকাতর হইব না।

১৬। শ্রদ্ধার সহিত দান করিব—অসৎপাত্রে কদাপি দান করিব না।

১৭। অসুস্থ না হইলে দিবাকালে ঘুমাইব না।

১৮। সাধ্যমত প্রতিদিন ব্যায়াম করিব।

১৯। সাধ্যমতে কাহারও সহিত অনাবশ্যক বাক্যালাপ করিব না।

২০। অতিরিক্ত হাসিব না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ বিষয়ক তৃতীয়
বিবৃতি সমাপ্ত।

চতুর্থ বিবৃতি—সৃষ্টিতত্ত্ব। *

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।
স বা এষ মহানজআত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। এতস্মাজ্জায়তে
প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগত উৎপত্তির পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

---

* নব্যভারত, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবাত্মার সহজ-জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে এইটুকু মাত্রই বলিতে পারিয়াছেন যে বিশ্বচরাচরের উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে এই সমুদয় চরাচর সৃষ্ট হইল। "তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়া দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্বযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" যে আত্মপ্রত্যয়ের উপর সত্যধর্ম্ম অটলভাবে দণ্ডায়মান আছে, সেই আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে আমরা কেবল এইটুকুই জানিতে পারি যে আমরা সৃষ্ট; আমাদের স্রষ্টা আছেন এবং সেই স্রষ্টার ইচ্ছাতেই আমরা ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উপলব্ধি করি যে এই সমুদয় বিশ্বচরাচর তাঁহারই ইচ্ছাতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত জ্ঞানের কোনই বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আমাদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, আমাদের ইহা নিশ্চয় থাকিবে যে সেই সকল প্রক্রিয়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছাতে সম্পন্ন হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় যেটুকু প্রকাশ করে, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে সে তদতিরিক্ত সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে পারে। মনুষ্য স্বীয় অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং বহির্জ্জগত দেখিয়াই ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তত্ত্ব যাহা কিছু উদ্‌ঘাটন করিতে পারে। মুণ্ডক ঋষি এই উপায়েই আত্মপ্রত্যয়ের উপর অধিষ্ঠিত এই সরল সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মও তাঁহারই সরল ও সবল বাক্যে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে এই মহান্ আত্মা পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও

সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়—একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্মেরই ইচ্ছাতে এই আব্রহ্মস্তম্ভ জগৎচরাচর উৎপন্ন হইয়াছে।

অনেকের এই সরল সৃষ্টিতত্ত্ব ভাল লাগিবে না, কারণ ইহা আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ এবং সুতরাং অতি সরল—ইহাতে মিথ্যা কল্পনার লেশমাত্র নাই। যাঁহারা মিথ্যাকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল বর্ণনার মধ্যে বহু-দিন যাবৎ বাস করিতেছেন, তাঁহারা সহজে তাহা ত্যাগ করিয়া সরল কথা গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন না; তাঁহারা মিথ্যার বন্ধনে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া যান যে তাঁহারা সত্যের যুক্তি, সত্যের স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না; সত্যের বিন্দুও যে রাশীকৃত মিথ্যা অপেক্ষা শ্রেয়—প্রত্যুত মিথ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না, একথা তাঁহারা জানিলেও যেন ভুলিয়া যান।

এই সহজজ্ঞানের প্রদর্শিত আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সরল সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়িয়া যে ধর্ম্মশাস্ত্র আত্মপ্রত্যয়ের বাহিরে যাইয়া কল্পনার আশ্রয়ে সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রই ভ্রমে পতিত হই-য়াছে। বাইবেলোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে আলোক অবধি মানব পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের ছয় দিবস পূর্ণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সপ্তম দিবসে ঈশ্বর অন্যান্য বিষয়ে বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকে আদিম মনুষ্য আদমের শরীরে জীবন-সঞ্চার করিয়া ইডেন উদ্যানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ঈশ্বর আদমের নিদ্রিত অবস্থায় একখানি পঞ্জরাস্থি বাহির করিয়া তাহা হইতে আদিম স্ত্রীলোক ঈবকে নির্ম্মাণ করিলেন।

এই সৃষ্টিপ্রকরণকে যে দিক দিয়া দেখা যাউক না কেন, কোন-রূপেই ইহার সমর্থন করিতে পারা যায় না। বিজ্ঞান হইতে আমরা

ইহার এতটুকুও সায় পাই না। বিজ্ঞান বলে যে, পৃথিবী প্রস্তুত হইতে দুই চারি দিন নহে, কত লক্ষ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। বাই-বেলোক্ত স্ঠিপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর পরে সূর্য্যচন্দ্রতারকা-গণের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান বলে যে পৃথিবীর পরে সূর্য্য নহে, কিন্তু সূর্য্যের পরে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে—প্রত্যুত সূর্য্য হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি।

এই সৃষ্টিপ্রকরণ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বলিয়াও কোনরূপেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। কারণ এই সৃষ্টিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়—ঈশ্বরের বিশ্রামদিবস—সম্বন্ধে একই লেখকেরই লিখিত বিভিন্ন অংশে পরস্পর-বিরোধী বাক্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই সকল বাক্যের সামঞ্জস্য করা বড়ই দুরূহ এবং সেগুলির একটি ঈশ্বরের বাক্য হইলে অপরটি কাহার বাক্য অথবা তন্মধ্যে কোন্‌টিই বা ঈশ্বরের বাক্য তাহা বুঝা নিতান্তই অসম্ভব। বাইবেলোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে রচ-য়িতার কবিত্বপ্রকাশের প্রয়াস অভিব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ বর্ণনায় যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বাইবেলোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের ন্যায় মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরা-ণের লিখিত সৃষ্টিপ্রকরণও আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে লেখক আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া এক সৃষ্টিপ্রকরণ গড়িতে গিয়া বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর তাঁহার জ্যোতির এক অংশ হইতে "ক্রমে জল, বায়ু এবং অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ;" পরে "বায়ুকে উক্ত জলরাশি আন্দোলন করিয়া ফেনোৎপাদন করিতে এবং অগ্নিকে অবশিষ্ট জলের সহিত মিলিত হইয়া ধূমরূপে পরিণত হইতে আদেশ করিলেন।" সেই ধূম সাতভাগে বিভক্ত হইয়া জল, তাম্র

প্রভৃতি সাত প্রকার পদার্থ স্বষ্ট হইল এবং "সেই সাত প্রকার পদার্থ হইতে প্রথম দ্বিতীয় ক্রমে সাত প্রকার আকাশ নির্ম্মিত হইল।" আর ইহাও লেখা আছে যে, ঈশ্বর তাঁহার জ্যোতির তিন ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা বুদ্ধি, লজ্জা ও প্রীতি স্বষ্টি করিলেন। সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বষ্টি করিতে ঈশ্বরের সর্ব্বশুদ্ধ চারদিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল।

এই স্বষ্টিপ্রকরণ অতি সামান্য পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে ইহা যেমন বিজ্ঞানবিরোধী, সেইরূপ ইহাতে এরূপ গুরুতর পরস্পরবিরোধী বাক্যও আছে যে ইহাকে মুসলমানদিগের বিশ্বাসের অনুযায়ী ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত স্বষ্টিতত্ত্ব বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেবল এইটুকু দেখিতে পাই যে এই স্বষ্টিপ্রকরণের লেখক স্বীয় স্বষ্টিতত্ত্বকে বাইবেলের স্বষ্টিতত্ত্ব অপেক্ষা স্বষ্টিকার্য্যে সময়-সংক্ষেপ এবং অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই লেখকও স্বলিখিত স্বষ্টিপ্রকরণে যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে পান নাই।

কেবল যে অন্য সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বহিঃস্থিত কল্পনাশ্রিত স্বষ্টিতত্ত্ব লিখিত দেখা যায় তাহা নহে। যে ভারতের ঋষিরা তাঁহাদের বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মার সহজজ্ঞান অবলম্বনে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সরল স্বষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই ভারতেরই কোন কোন ঋষি আবার কল্পনার আশ্রয়ে নূতনতর স্বষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কারে উদ্যত হইয়া প্রকৃত স্বষ্টিরহস্য বাহির করা দূরে থাক্, সমগ্র বিষয়টীকে বৃথাই জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এই কারণে হিন্দুশাস্ত্রে স্বষ্টি সম্বন্ধে নানা মত প্রবেশ করিয়াছে। বৈদিক ঋষিদিগের অভিব্যক্ত যে স্বষ্টিপ্রকরণ তাহাও হিন্দুর স্বষ্টিপ্রকরণ; পৌরাণিক মুনিদিগের বিবৃত যে স্বষ্টিপ্রকরণ তাহাও হিন্দুর স্বষ্টিপ্রকরণ; আবার

মনুসংহিতায় উল্লিখিত যে সৃষ্টিপ্রকরণ, তাহাও হিন্দুর সৃষ্টিপ্রকরণ। এই সকলের মধ্যে মনুকথিত সৃষ্টিপ্রকরণ হিন্দুদিগের মধ্যে সমধিক প্রচলিত এবং ইহাই হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক সৃষ্টিপ্রকরণের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়ে আদর্শ স্বরূপে গৃহীত হয়।

মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় দুইপ্রকার সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটী বর্ণনা আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে উভয়েতেই সহজজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কল্পনার সংমিশ্রণ আছে। মনু অথবা অন্য যে কোন ঋষি যে সময়ে এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সময়ে ভারতবর্ষ কোরাণ বা বাইবেলের সময়ে তত্তৎলিখিত সৃষ্টিপ্রকরণের লেখকগণের দেশ অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সেই কারণে মনু অনেকটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়া এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টির জন্য সুদীর্ঘ কালের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরে তিনি বিরাট পুরুষ কর্ত্তৃক মনুর সৃষ্টি, মনু কর্ত্তৃক প্রজাপতি সৃষ্টি প্রভৃতি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই স্বকপোলকল্পিত বলিয়া প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বর্ণনায় দেখিতে পাই যে, "ব্রহ্মা প্রথমে মন সৃষ্টি করিলেন; সেই মনস্তত্ত্ব হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল।" বলা বাহুল্য যে এই শেষোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে সহজজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদের সুন্দরতর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। কিন্তু এই উভয় সৃষ্টিপ্রকরণের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী এবং তৎসঙ্গে বিজ্ঞানবিরোধী বাক্য প্রভৃতির সমাবেশ হেতু উহাদিগের কোনটীকেই ঈশ্বরপ্রেরিত ও অভ্রান্ত বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে

যে, মনুষ্যপ্রণীত যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হউক, ঈশ্বরের "জ্ঞানবলক্রিয়া" সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া দিয়া কল্পনাকে অবলম্বন করিলেই ভ্রমে পতিত হইতে বাধ্য।

যেমন শাস্ত্রকারগণ একদিকে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ দার্শনিকগণও আবার অন্যদিক্ দিয়া নানা মত প্রচার করিয়া গুরুতর বিরোধরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন দার্শনিক আত্মপ্রত্যয়কে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, তিনিই এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন; কোন দার্শনিক বলেন যে ঈশ্বর ও পরমাণু অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে; কেহ বা বলেন যে ঈশ্বর নিজেই এই সকল হইয়াছেন।

পরমাণুকে ঈশ্বরের সহিত সমানভাবে নিত্য বলিলে তাহার স্বয়ম্ভুত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ম্ভু হইবার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে অচেতনে চেতন-ধর্ম্ম আরোপ করিতে হয়। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ জীবাত্মাকেও ঈশ্বরের সহিত সমানভাবে নিত্য করিয়া বলেন। জীবাত্মা বা পরমাণু আপেক্ষিকভাবে নিত্য হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ ও অবশ্যম্ভাবীরূপে একের অধিক বস্তুকে কদাপি নিত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। জীবাত্মা প্রভৃতির পূর্ণ নিত্যতা স্বীকার করিবার জন্য কিছু-না হইতে কিছু আসিতে পারে না, এইরূপ যে যুক্তি * প্রযুক্ত হয়, সেই যুক্তির বলে কি প্রাণ, কি আমাদের নব নব উদ্ভাবিত প্রত্যেক ভাব ও প্রত্যেক ইচ্ছা, সকলেরই পূর্ণ নিত্যতা স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অচিরোদ্ভূত ইচ্ছা প্রভৃতি কি নিত্য? কখনই নহে। ইহা আমরাও যেমন

---

* নাহসতো বিদ্যতে ভাবঃ।

সহজজ্ঞানের দ্বারা জানিতেছি, এই মতের সমর্থক দার্শনিকগণও তাহা ঠিক তেমনই জানিতেছেন। কিন্তু মূল কথা এই যে কিছু-না হইতে জীবাত্মা, পরমাণু প্রভৃতির আবির্ভাব হইতে পারে না—তাঁহাদের এই যুক্তি সহজজ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না; সহজ-জ্ঞান বলিতেছে যে ঈশ্বর যখন স্বয়ং পূর্ণসত্তা লইয়া নিত্যকাল বিরাজমান আছেন, তখন সৎস্বরূপ তাঁহার পূর্ণ শক্তি হইতে পরমাণু প্রাণ আদির সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণনিত্য, তাঁহার সৃষ্ট সমুদয় পদার্থই আপেক্ষিক নিত্য।

যে সকল দার্শনিক বলেন যে ঈশ্বর স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তোপাদান হইয়াছেন, তাঁহারা এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ-সংসারকে ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে যখন সমস্তই একমাত্র পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম, তখন সেই পরব্রহ্মের ভ্রমরূপ অসঙ্গতি পরিহারের নিমিত্ত তাঁহারা এক উপাধি শব্দ কল্পনা করিয়া নানা জটিলতা আনয়ন করেন। যখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তখন এই উপাধি-বস্তুই বা কোথা হইতে আইসে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অন্তত উপাধি একটী সৃষ্টবস্তু। যখন উপাধিই হউক বা অন্য যাহা কিছু হউক, একটী বস্তুকেও সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন কল্পিত বস্তু অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতাদি বস্তুকেই সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়।

আর যাঁহারা বলেন যে কাষ্ঠের দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণতির ন্যায় ঈশ্বর পরিণামোপাদানরূপে এই জগতে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা দেখেন না যে এইরূপ মত স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই থাকে না।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, যে দেশে হউক, যে কালে হউক, যেই কেহ আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে গিয়াছেন, তিনিই অকৃতকার্য্য হইয়া কল্পনারাজ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছেন। এইবারে আমরা এক বৈদিক ঋষির কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে তিনি সহজজ্ঞান এবং কবিত্বের কেমন সহজ সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছিলেন। সেই ঋষি অন্যতর আদিমতম ঋষি প্রজাপতি।

"সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই মহান্ আকাশও ছিল না।" যেমন আকাশকে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু? এই যে গহনগভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল?

"মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনের কোন প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাতপ্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রত ছিলেন। তাহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগতও ছিল না।

"অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহা শূন্যসমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্বকার্য্যের বীজ ছিল, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।

"মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল, সেই যে প্রেম, তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। সতের সহিত অকৃতকারণের যে বন্ধন সেই প্রেম-

বন্ধন; সেই প্রেমবন্ধনকে কবিরা হৃদয়ে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জানিলেন।" *

ঋষি প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই মহান্ আকাশ ও দ্যুলোক কোথায়, এক কণা রেণুও ছিল না। কোথায় বা এই সকল জীব-জন্তু, কোথায় বা তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, কোথায় বা তাহাদের সুখ-সৌভাগ্য—তখন ইহার কিছুই ছিল না। অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ যে এই আকাশকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও তখন ছিল না। গভীর সমুদ্র ছিল না, এক বিন্দু জলও ছিল না। এই সকল যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎবস্তু, তাহার কিছুই ছিল না। তবে কি তখন অসৎ ছিল; অসৎও ছিল না। যদি অসৎ থাকিত, তবে কোথা হইতে এই সতের উৎপত্তি হইত? "কথমসতঃ সজ্জায়েত?" অতএব সতের কারণ, সত্যের সত্য, অকৃত অমৃত একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম ছিলেন।

সেই পরব্রহ্মই অবাতনিশ্বাসে প্রাণিত ছিলেন। যখন মৃত্যু ছিল না, মর্ত্ত্য জীবও ছিল না; যখন অমৃত ছিল না, অমরণধর্ম্মা দেবতারাও ছিলেন না; যখন রাত্রির সহিত দিনের কোন প্রকার প্রজ্ঞানও ছিল না, রাত্রি দিন ঋতু সম্বৎসর কালের কোন অবয়ব ছিল না, তখন কালের কাল সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই জীবিত ছিলেন। সকল অভাবের মধ্যে সেই মহাপ্রাণই স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি সেই আশ্চর্য্য শক্তিসমন্বিত ছিলেন, যাহা হইতে এই বর্ত্তমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

তখনকার সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে অপ্রজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য

---

* ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১১শ অনুবাক, ১ম সূক্ত।

জ্যোতিহীন শূন্যের গর্ভে পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরেতে এই জগৎ কার্য্যের যে একটি বীজ নিহিত ছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান-আলোচনাতে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।

পরমেশ্বরের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইল, আর এই বিশ্বসংসার প্রকাশ পাইল। প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব, পরে জ্ঞানের আলোচনা, তাহার পরে তাঁহার ইচ্ছাতে দেশকালসূত্রে এই জগৎ অনুস্যূত হইল। প্রেমই মনের বীর্য্য, সেই প্রেমেরই প্রভাবে প্রভাকর প্রভা পাইল, সুধাকর শোভার আধার হইল, এই বিশ্বসংসার এক প্রেমের সংসার হইয়া উঠিল। যখন পুরাতন ঋষিদের মনে প্রেমের ছায়া পড়িল, তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া জানিলেন, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে বন্ধন, সে কেবল প্রেমের বন্ধন। এখনকার কবিরাও প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া গান করিতেছেন "যে দিকে ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি"।*

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের
বিবৃতি গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক
চতুর্থ বিবৃতি সমাপ্ত।

---

* বৈদিক মন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য্য পূজ্যপাদ পিতামহদেব কর্তৃক বিবৃত।

পঞ্চম বিবৃতি—আমাদের আদর্শ।*

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

আমরা দুর্ব্বল প্রাণী। চারিদিকে বিঘ্ন-বিপত্তির শ্রেণী দণ্ডায়মান। আমরা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়ি যে কোন্ পথে যাইব এবং কোন্ পথে যাইব না। মরুভূমির মাঝে যেমন শস্যশ্যামল খণ্ড-ভূমি পাওয়া যায়, কিন্তু উষ্ট্রের সহায়তা ব্যতীত সেখানে সহজে যাওয়া যায় না; সেইরূপ এই সংসারের মাঝে সত্য আছে বটে—এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে, এই অধ্রুব জগতের মধ্যে ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় এক "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" আছেন। কিন্তু কে অস্বীকার করিবে যে এই ধ্রুব সত্যকে দেখাইয়া দিবার জন্য একজন সুনিপুণ পথপ্রদর্শক আবশ্যক?

আমাদিগের পথপ্রদর্শক—যাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, তিনিই স্বয়ং আমাদিগের আদর্শ লক্ষ্য—সেই একমাত্র শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বরূপ পরমেশ্বর। আমরা এখন আর পরিমিত দেবতা-বৃন্দের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। মধুর রসের একবার আস্বাদ পাইলে মধুমক্ষিকারা কি আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? আমরাও সেইরূপ জীবন্ত জাগ্রত দেবতাকে পাইয়া কি প্রকারে অচেতন কাষ্ঠধূলিরাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে সক্ষম হইব? মনুষ্যের আত্মা অনন্তের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে চায় এবং এই

---

* আদি ব্রাহ্মসমাজে ১৮১৩ শক, ৬২ ব্রাহ্মসম্বৎ, ২১ জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন্ধ্যা-কালে বিবৃত।

জন্য সে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারুক আর না পারুক, কল্পিত সীমাবদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে কোন প্রকারেই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানের কথা শুনিবেন না, যাঁহারা যুক্তির কথা গ্রাহ্য করিবেন না; যাঁহারা অন্তরে অনন্তস্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবেন না, তাঁহারাই অতৃপ্তির মধ্যে তৃপ্ত থাকেন।

একটী প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ, তাহার অসংখ্য অভ্রভেদী ডালপালা লইয়া মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আকাশে কেমন খেলিতে থাকে। কিন্তু যদি ঐ শালবৃক্ষকে উৎপত্তির প্রথমাবস্থাতেই কোন আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইত, তাহা হইলে কি আর অভ্রভেদী শালবৃক্ষের সুমহান্ গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে দেখিতাম যে সেই অভ্রভেদী শালবৃক্ষের পরিবর্ত্তে একটী নিতান্ত বিকৃত শীর্ণকায় শালনামের অযোগ্য এক বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

এখানে বুঝিতে পারিতেছি যে একটী ক্ষুদ্র আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার কারণেই শালবৃক্ষের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে; আমরা নিজেদের আত্মাসম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করি না কেন? একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই বুঝিতে পারি যে যতই আমাদের আত্মাকে অনন্তের অভিমুখে ছাড়িয়া দিব, যতই আমাদের আত্মাকে জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রীতিতে ভক্তিতে উন্নত করিতে থাকিব, ততই দিনে দিনে সেই মুক্তস্বভাবের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিব।

ব্রহ্মপিপাসুমাত্রেরই সেই সত্যংজ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মকেই আদর্শ স্থানে রক্ষা করা উচিত। পরমেশ্বরের অনন্ত সত্যভাবের, অনন্ত মঙ্গলভাবের, অনন্ত প্রেমের অনুকরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং অধিকার—ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব।

এই অধিকার, এই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা অনায়াসের কর্ম্ম নহে—কঠোর সাধন আবশ্যক। কত স্বার্থত্যাগ আবশ্যক; সংসারের সহিত ।ত দারুণ সংগ্রাম আবশ্যক—এই সকল বিষয়ে আমরা যতটা অগ্রসর হইব, ততই আমরা ঈশ্বরের জলন্ত প্রেমভাব সহজেই হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে যে, যখনই সেই বিদ্যুৎপুরুষ বিদ্যুতের ন্যায় পলকের জন্যও অন্তরে দেখা দিবেন, তখনই তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া দিব—আর ছাড়িব না। কিন্তু প্রস্তুত হইয়া না থাকিলে, চক্ষু খুলিয়া সতর্ক না থাকিলে সেই বিদ্যুজ্জ্যোতি যে কখন্ আসিবেন, তাহা কি দেখিতে পাইব? হয়তো সমস্ত জীবনেও আর না দেখিতে পারি।

এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী উপাখ্যান মনে পড়িতেছে। "অলিঙ্গং অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বর নারদকে বলিলেন যে আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একটীবার মাত্র দেখা দিই, সেই দর্শনে যদি সে মোহিত হইয়া আমাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ন করে, তবে তাহার হৃদয়ে চিরবিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করি; তাহা না হইলে এ জন্মের মত আমি অদৃশ্য থাকি।" প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে একবার না একবার ধর্ম্মপিপাসা—ঈশ্বরকে জানিবার পিপাসা উপস্থিত হইবেই। সেই পিপাসা উপস্থিত হইলেই বিদ্যুৎপুরুষ একটী পলক-মাত্র দেখা দেন এবং সেই সময়ে যে ব্যক্তি যতটুকু পরিমাণে প্রস্তুত থাকেন, সেই ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণে সেই বিদ্যুৎপুরুষের বিদ্যুতাগ্নি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

আপনাকে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিতে না পারিলে ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি ধারণ করিতে পারিব না—ব্রহ্মসাধন অসাধ্য হইবে। কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা জানিয়া শুনিয়াও সেই জ্যোতি ধারণের

উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করি না। আমরা নিজেদের চেষ্টার অভাবে ব্রহ্মকে নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা অবস্থিত রাখিতে পারি না, তাই আমাদের মন অনেক স্থলেই ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে মহদাশয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগের প্রতি স্বতই ধাবিত হয় এবং তাঁহাদিগকেই পৃথিবীর অতীত দেবতা বোধে পূজা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এইখানে আত্মার সহজজ্ঞানের বিপরীতে কার্য্য হয় বলিয়াই মতবিভেদ উপস্থিত হয়। সহজজ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে, যখন মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া জানিতেছি তখন তাহাকে কি প্রকারে দেবতা বোধে পূজা করিব? হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ, যাহা কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য, তাহা মনুষ্যের চরণে কি প্রকারে নিবেদন করিব এবং নিবেদন করিয়াই বা কি ফল?

মনুষ্যকে দেবভাবে আদর্শ গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া মনুষ্যভাবে আদর্শ গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। মনুষ্যশ্রেষ্ঠদিগকে মনুষ্যভাবে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদিগের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না, বরঞ্চ লাভই হয়। ঈশ্বরকে আমাদিগের পূর্ণ আদর্শ করিব; তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মনুষ্যকে যখনই আদর্শ করিতে যাইব, তখন যেন অতি সাবধানে অগ্রসর হই; তখন যেন একবার অন্তশ্চক্ষে বুঝিয়া দেখি যে, আমরা যাঁহাকে আদর্শ করিতেছি, তিনি একজন মনুষ্য—তিনি পূর্ণ জীব নহেন, এক অপূর্ণ জীব। তাঁহার যেমন নানা গুণ আছে, তেমনি নানা দোষও থাকিতে পারে। তিনি কোন বিষয়ে যেমন পূর্ণতার দিকে কতকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি অন্য কোন বিষয়ে অনেক পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে, আমরা হংসের ন্যায় তাঁহার দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া গুণ গুলিই গ্রহণ

করি; তিনি যে যে বিষয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সেই বিষয়েই তাঁহাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করি।

আত্মার অন্তরে যে একটী বলবতী ধর্ম্মজিজ্ঞাসা আছে, বুদ্ধদেব আপনার নির্ম্মল জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন এবং আপনার জীবনকে ধর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার ভাবও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনুষ্য; তাঁহাকে সহস্রবার আদর্শরূপে চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিলেও পূর্ণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি যখন সংসারের চারি পার্শ্বে দুঃখরাশি বিপদরাশি দেখিয়া আপনার ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য স্বীয় পিতামাতা, নববিবাহিত পত্নী ও নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু এরূপ কার্য্যকে আদর্শ স্বরূপে অবলম্বন করিতে পারি না। আমাদের আদর্শ তিনি, যিনি "অতি ধীর গম্ভীর, আপনে আপনি স্থির" এবং যিনি সমুদয় হইতে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়াও একটী সামান্য কীটানুকীটের পর্য্যন্ত আহার প্রদানে বিরত থাকেন না।

চৈতন্যদেব যেমন ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভক্তি বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান বিষয়ে ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কর্ম্মের দিকে তাঁহার মন ততটা আগ্রহের সহিত ধাবিত হয় নাই, তাই তাঁহার ঈশ্বরোপাসনায় অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল। আমরা চৈতন্যদেবকে কোন দেবতা অথবা কোন অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না কিন্তু আমরা তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেমকে আদর্শস্বরূপে হৃদয়ে নিশ্চয়ই ধারণ করিতে পারি। আমাদের আদর্শ তিনিই, যিনি কেবলমাত্র "রসোবৈ" রসস্বরূপ নহেন, কিন্তু যাঁহার ভয়ে, যাঁহার শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে; যাঁহার

শাসনে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু, সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে—তিনিই আমাদিগের একমাত্র অভ্রান্ত গুরু, তিনিই আমাদিগের একমাত্র দেবতা।

ঈশ্বরই আমাদিগের প্রকৃত আদর্শ; কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠদিগকে আদর্শ করিয়া সেই পূর্ণ আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইবার উপায় অবগত হই। দেখিলাম যে নানক এক উপায়ে আপনাকে ধর্ম্মপথে, ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন; আমরাও চেষ্টা করিলে সেই উপায় সমূহের অনেকগুলিই আপনাদের লক্ষ্যসাধনে প্রয়োগ করিতে পারি। দেখিলাম যে রামমোহন রায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইহা দেখিয়া আমরাও সাহস পাইলাম যে ঈশ্বরের প্রীতিকামনায়, ধর্ম্মের জন্য একজন মনুষ্য—আমাদিগেরই মত একজন মনুষ্য—যখন আপনার সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তখন তিনি যে যে উপায়ে এরূপ নিঃস্বার্থপর হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমরাও দৃষ্টান্তবলে বলীয়ান্ হইয়া সেই উপায়গুলিকে আমাদের লক্ষ্যসাধনে প্রয়োগ করিতে অন্তত চেষ্টাও করিতে পারি—সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হই বা না হই।

আমরা যে কেবল এইরূপ চেষ্টা করিতে পারি তাহা নহে; আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য এই যে পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরকে নিয়তই নয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া ঋষিতুল্য মহাজনগণের প্রদর্শিত পথে চলি। সে দিন—সে শুভদিন কবে আসিবে যে দিন আমরা প্রত্যেকে সেই মঙ্গলময়ের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া ক্রমে তাঁহারই সন্নিহিত হইতে থাকিব। আমরা জানি যে সেই দয়াময় ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই, তখন তাঁহার নিকটে যাইতে আমরা যেন বৃথা কালহরণ না করি। ধর্ম্ম-

বিষয়ে কালহরণ করা কিছুতেই শ্রেয় নহে—সর্ব্বদাই যেন মনে থাকে যে মৃত্যু নিকটেই দণ্ডায়মান—"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম-মাচরেৎ।" আমরা যদি বা এত দিন বৃথা কালক্ষেপ করিয়া ঈশ্বরের পথে ধর্ম্মের পথে চলিতে চেষ্টা না-ও করিয়া থাকি, তবে আজই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরকেই আদর্শরূপে ধারণ করিয়া তাঁহারই আদিষ্ট পথে চলিতে থাকি; আজই যেন আমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করি যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা অর্পণ করিব না।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র, দ্যুলোক ভূলোক অবিরোধে শূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; তোমারই শাসনে দিন রাত্রি, পক্ষ মাস, ঋতু সম্বৎসর সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিতেছে। এই সকলে যেমন তোমার অতুলনীয় শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি, তেমনি তোমার অনুপম স্নেহও আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। তোমারি প্রসাদে পূর্ব্ব-পশ্চিমবাহিনী নদী সকল ধরণীকে শস্যশ্যামলা করিতেছে এবং সেই শস্যের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। তোমারি প্রসাদে আমরা পিতামাতার স্নেহযত্নে লালিতপালিত হইয়াছি। তোমারি প্রসাদে স্ত্রীপুত্র ভাইভগ্নী প্রভৃতি সকলের সুকোমল প্রেমভাব নিত্য নূতন ভাবে অনুভব করিতেছি। তোমা হইতে জীবনের এই সকল সুখশান্তি লাভ করিয়াও তোমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব না তো আর কাহাকে করিব? হে পরমাত্মন্! তুমি আমা-দিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি; তুমি সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক, তুমি আমাদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা

অপরিত্যক্ত থাক। আমরা দুর্ব্বল ভ্রান্ত জীব—তুমিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে আমাদের আদর্শ বিষয়ক পঞ্চম
বিবৃতি সমাপ্ত।

ষষ্ঠ বিবৃতি—গুরু ও শিষ্য। *

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যকপ্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং।

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনশ্বর পুরুষকে জানা যায়। ইহা ব্যতীত আর সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই সর্ব্বসুখদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে না জানা যায়, তাহা লইয়া আমাদের কি ফল? যেন জানিলাম যে তড়িৎকে পরিচালনা করিয়া আমরা আমাদের নানা প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিতে পারি; যেন জানিলাম যে দুই

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩ কল্প, ২য় ভাগ, ১৮১৪ শক আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিভিন্ন বাষ্পের একপ্রকার মিশ্রণে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ পায়, অন্য প্রকার মিশ্রণে জল হয়। কিন্তু এই সকল জানিতে পারিলেই কি আমাদের হৃদয়ে পাপতাপের অশান্তি দূর হইয়া শান্তি আসিতে পারে? এই সকল ভৌতিক ঘটনার মধ্যে যদি সেই কারণের কারণকে খুঁজিয়া না পাই, তবে ভৌতিক বিদ্যা ইন্দ্রজাল মাত্র হইয়া পড়ে এবং হৃদয়ে অশান্তি থাকিলে সহস্র ইন্দ্রজাল তাহা দূর করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল ভৌতিক ঘটনার মধ্যে যদি সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পাই, তখন তাঁহাকে মনেরও নিয়ন্তা জানিয়া তাঁহারই চরণে শান্তি ভিক্ষা করিয়া অশান্তিকে দূর করিতে পারি। তখন ভৌতিক বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করি বলিয়াই তাহার উপকারিত্ব উপলব্ধি করি।

ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের চরম লক্ষ্য। যে বিদ্যার সাহায্যে সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাই আমাদের পক্ষে উপকারী। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিব, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, অবশিষ্ট অংশ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম তেজস্বী মুণ্ডক ঋষির জ্বলন্ত বাক্যে ঘোষণা করিলেন যে

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এসমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা অক্ষরপুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। একবার যদি আমরা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়া দেখি যে, সেই নিরবদ্য পরব্রহ্ম কি মহান্, কি পবিত্র, এবং আমরা কি ক্ষুদ্র

ও কত-না পাপমলিন হৃদয় লইয়া বসিয়া আছি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, সেই পবিত্রস্বরূপের নিকট যাইতে হইলে আমাদের কত প্রাণপণ পরিশ্রম আবশ্যক ; নিমেষে নিমেষে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা মলিন ভাব দূর করিয়া হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে হইবে। ব্রহ্মপিপাসু মাত্রেই জানেন যে, আমাদের জীবিকাসংগ্রাম তত গুরুতর নহে, যত এই হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার জন্য পাপের সহিত সংগ্রাম। ব্রহ্মপিপাসুগণ বিশেষরূপেই জানেন যে কত বার এই শেষোক্ত সংগ্রামে সাধকগণকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

পূর্ব্বকালে মহামনা ঋষিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপিপাসুগণকে উপযুক্ত গুরুর নিকটে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন : "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" শিষ্য পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে গমন করিবেক ; "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্য সন্নিধানে যাইয়া জ্ঞানলাভ কর।

কেবলমাত্র আচার্য্যের নিকট যাইলেই হইবে না। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিদ্রিত থাকিলে সহস্র আচার্য্য কিছুই করিতে পারিবেন না। প্রথমে আপনার যত্ন চাই এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যেরও সহায়তা আবশ্যক। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় যখন সহজেই ব্রহ্মজ্ঞান আনিয়া দেয়, তখন আচার্য্যের সহায়তার প্রয়োজন কি ? আমরা আমাদের আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত পাইয়াছি বটে ; এবং আমরা যদি আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কথা, তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য সচেষ্ট থাকি ; যদি সেই আত্মাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিবার জন্য উৎসুক থাকি, তবেই আমরা সেই সত্যের সত্য পরমগুরুর নীরব

উপদেশ অতি সহজেই শুনিতে পাই। "যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ"। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিষয়-সুখে এরূপ ঘোর মত্ত হইয়া থাকি যে, তখন ঈশ্বরের উপদেশবাক্যের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। এমনও হয় যে, ঈশ্বরের জলন্ত উপদেশবাক্য শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু মোহবশত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই সত্যকে বিকৃতার্থ করিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিতে থাকি যে এই বিকৃত সত্যই শুনিতেছি। হয়তো বা পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরগণ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝাইতে থাকে এবং অনেক সময়ে আমরা মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিলেও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশত মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া মনে করি এবং তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে থাকি। হয়তো আমার একটী মিথ্যা কথার উপর প্রচুর বিষয়বিভব ও মানমর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে। তখন পরামর্শদাতা ক্রমাগত মন্ত্র দিতে থাকেন যে স্পষ্টত বা অস্পষ্টত যে কোন রূপেই হউক মিথ্যা কথাটী বলা কর্ত্তব্য; তিনি ক্রমাগত প্রলোভন দেখাইতে থাকেন যে ঐ মিথ্যা কথা না বলিলে বিস্তর ক্ষতি হয় এবং উহা বলিলে কত লাভ হয়; আর ঐ মিথ্যা কথা একটীবার বলিলে এমনই বা কি ধর্ম্মহানি হইতে পারে? কিন্তু আমার যিনি প্রকৃত গুরু এবং আমি যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি যদি বলেন "না, সত্যের পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইও না; সত্যই ঈশ্বরের পথ; তুমি মিথ্যার উপর চলিয়া বিপদে পড়িলে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে কিরূপে ডাকিতে পারিবে? যদি সত্যের পথ অবলম্বন কর, তবে ঈশ্বর স্বয়ং তোমার সহায় হইবেন"—তখন আমার হৃদয় কি দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হয় না? আমার হৃদয় হইতে তখন স্বতই এই কথা উঠে যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেও সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে

পরিত্যাগ করিব না—তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না। সঙ্গদোষে বা মোহ বশত যাহাতে বিপথে না যাই, সেইরূপ উপদেশাদি দেওয়াই প্রকৃত আচার্য্যের কর্ত্তব্য।

চক্ষুকে যেমন দর্শন করিবার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না, কর্ণকে যেমন শ্রবণ করিবার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না, সেইরূপ আত্ম-প্রত্যয়কেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। আচার্য্য কেবল নৈতিক শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মপথ, ব্রহ্মধামের পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন; আত্মপ্রত্যয়কে সত্য উপলব্ধি করিবার শিক্ষা দিতে পারেন না। আচার্য্যের উপদেশের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, যাহাতে আমরা স্বতঃপ্রাপ্ত সত্যকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ব্যবহার করি এবং আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে সত্যের অধীন করিয়া রাখি; সত্যের সহিত যেখানে কোন বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেখানে যাহাতে লোকভয় সমাজভয় করিয়া না চলি।

সত্যকে এইরূপে জীবনে পরিণত করা সম্বন্ধে "সহস্র গ্রন্থপাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে।" শিষ্য অপেক্ষা আচার্য্য কেবল জ্ঞানত নহে, কিন্তু কার্য্যতও জানেন যে কি প্রকারে সত্যকে ধারণ করিয়া রাখা যায়, কি প্রকারে পাপের সহিত সংগ্রাম করিলে জয়লাভ করা যায়। এই সকল বিষয়ে আচার্য্য শিষ্য অপেক্ষা বহুবার ভুগিয়াছেন, এই কারণে তিনিই এবিষয়ে ঠিক উপদেশটি দিতে সক্ষম। সঙ্গীতের তত্ত্ব জানা থাকিলেও যদি গায়কের নিকট কার্য্যত সঙ্গীত শিক্ষা না করা যায়, তাহা হইলে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তর অসম্পূর্ণতা থাকিবেই। এমন অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তা আছেন, যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা না করাতে গান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

প্রকৃত আচার্য্য হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্য প্রকৃত আচার্য্যের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—"আচার্য্য তর্কবিতর্ক করিয়া শিষ্যের ভ্রম দূর করিতে সমর্থ হইবেন; তিনি শান্ত, দান্ত হইবেন এবং রুক্ষস্বভাব না হইয়া শমদমদয়াদি গুণবিশিষ্ট হইবেন; তিনি বেদাদি বিদ্যা স্বায়ত্ত করিবেন; ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার ভোগে অনাসক্ত হইবেন; যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে বিরত হইবেন; ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎ হইবেন; সদাচারী হইবেন; দম্ভ কুহক শঠতা মায়া মাৎসর্য্য অহঙ্কার অনৃত মমত্ব প্রভৃতি দোষ হইতে দূরে থাকিবেন; কেবল পরহিতৈষণা-প্রেরিত হইয়া বিদ্যাদান করিবেন।"* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে সকল গুণ আচার্য্যের থাকা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে সেই সকল গুণ কোন এক ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া দুর্লভ। হয়তো যাঁহার বিদ্যা আছে, তাঁহার অহঙ্কার আছে; যাঁহার তর্ক করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি অপরের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি-পাত করা আবশ্যক বোধ করেন না।

কেবল উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিতে পারিলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারা যায় না—উপযুক্ত শিষ্যেরও প্রয়োজন আছে। শঙ্করাচার্য্য যেমন আচার্য্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রহ্মপিপাসু শিষ্যেরও লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—"শিষ্য সর্ব্বপ্রকার অনিত্য যাগ-যজ্ঞাদি হইতে বিরত হইবে; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা লোকৈষণা পরিত্যাগ করিবে; শমদমদয়াদি গুণযুক্ত হইবে; শাস্ত্রে শিষ্যের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল গুণসম্পন্ন হইবে; শুচি

* আচার্য্যস্তূহাপোহগ্রহণধারণশমদমদয়ানুগ্রহাদিসম্পন্নো লব্ধাগমো দৃষ্টাদৃষ্ট-ভোগেষনাসক্তস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতোঽভিন্নবৃত্তো দম্ভকুহক-শাঠ্যমায়ামাৎসর্য্যানৃতাহংকারমমত্বাদিদোষবর্জিতঃ কেবলপরানুগ্রহপ্রয়োজনো বিদ্যোপযোগার্থী। সাহস্রী গদ্যপ্রবন্ধ।

হইবে ; যথাবিধি আচার্য্য সন্নিধানে আগমন করিবে এবং জাতি, কর্ম্ম, শীল, বিদ্যা ও কুল বিষয়ে সুপরীক্ষিত হইবে।"*

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য সকল প্রকার ভোগসুখে অনাসক্ত হইয়া, সর্বথা শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া উপযুক্ত ভক্তিসহকারে আচার্য্যের সন্নিধানে আগমন করিবেক। গুরুর প্রতি শিষ্যের যদি ভক্তি না থাকে, তবে গুরুর বাক্যে শিষ্যের শ্রদ্ধাই বা থাকিবে কি প্রকারে ? এই কারণে শাস্ত্রকারগণ শিষ্যের গুরুভক্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে শিষ্যগণ শুশ্রূষাদি দ্বারা গুরুভক্তি প্রকাশ করিত। মনু বলিয়াছেন যে "যে শিষ্যের অধ্যাপনাতে ধর্ম্ম বা অর্থ না থাকে, অথবা যাহার নিকট অধ্যাপনার অনুরূপ শুশ্রূষা না পাওয়া যায়, ঊষর ক্ষেত্রে উত্তম বীজের ন্যায় তাদৃশ ছাত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিবে না।" (মনু ২য়-১১২) এই গুরুভক্তি ও গুরুশুশ্রূষা সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানা আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়।

গুরুভক্তি অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত এবং অযথাপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায় ভারতে নানা অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে এক গুরুবংশ জ্ঞানালোচনা ধর্ম্মালোচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও এক শিষ্যবংশের বংশপরম্পরায় গুরুগিরি করিয়া আসিতেছে। কোথাও বা দেখা যায় যে শিষ্য গুরুকে ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়া পূজা করিতেছে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে আছে "হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা আছেন,

---

* সাধনসাধ্যাদনিত্যাৎ সর্ব্বস্মাৎ বিরক্তায় ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণায় ......শমদমদয়াদিযুক্তায় শাস্ত্রপ্রসিদ্ধশিষ্যগুণসম্পন্নায় শুচয়ে ব্রাহ্মণায় (এই বাক্যটী উপলক্ষ্য মাত্র বলিয়া বোধ হয়) বিধিবদুপসন্নায় শিষ্যায় জাতিকর্ম্মবিত্তবিদ্যাভিজনৈঃ পরীক্ষিতায়। সাহস্রী গদ্যপ্রবন্ধ।

কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহই ত্রাণকর্ত্তা নাই।" মানব যখন মানবগুরুকে স্বীয় আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিল, তখন তাহা হইতে অমঙ্গল ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে? অমঙ্গল না হওয়াই আশ্চর্য্য। বাউল, সহজী, গুরুদাসী প্রভৃতি শাখাসম্প্রদায়ই আত্মার স্বাধীনতাবিসর্জ্জনে অমঙ্গল আসিবার প্রত্যক্ষ পরিচয়স্থল। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, চক্ষের সম্মুখে শিষ্য দেখিতেছে যে তাহার গুরু যতই কেন উন্নত হউন না, তাহারই মত একজন অপূর্ণ মানব, তথাপি সে কি প্রকারে গুরুকে আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করে!

আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে আমরা প্রথমে উপযুক্ত গুরু অন্বেষণ করিয়া লই। এমন গুরু লইতে হইবে, যিনি আত্মপ্রত্যয়ের বিরোধে উপদেশ না দেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত নানা গুণ থাকিতে হইবে। এই প্রকার গুরু লাভ করিলে তবে আমরা তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিব, তাঁহার প্রতি যথাযুক্ত ভক্তি প্রদর্শন করিব; কিন্তু কিছুতেই আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জন করিতে পারিব না। আত্মার স্বাধীনভাবের মূল আত্মপ্রত্যয়কে যদি সযত্নে পোষণ করি, তবে সেই আত্মপ্রত্যয়ই দেখাইয়া দিতে পারিবে যে কে প্রকৃত গুরু, আর কে-ই বা অপ্রকৃত।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে গুরু ও শিষ্য বিষয়ক ষষ্ঠ
বিবৃতি সমাপ্ত।

সপ্তম বিবৃতি—দ্যাবাপৃথিবী।*

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥

কাহার শাসনে এই সূর্য্য চন্দ্র, এই দ্যুলোক ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে? কে এই আকাশের মধ্যে থাকিয়া অগণ্য সূর্য্য-চন্দ্র, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রকে পরিচালিত করিতেছেন? কাহার আদেশে ইহারা ভ্রাম্যমাণ হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যে বলিতেছেন ঃ—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই সকলই সেই মহান্ পুরুষ পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে পরিচালিত হইতেছে, তাঁহারই শক্তি দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হইয়া এই সকলই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে।

আমাদের এই পৃথ্বীগোলক স্বীয় উপগ্রহ চন্দ্রের সহিত মহাশূন্যের মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে আঠারো মাইল ছুটিয়া থাকে। কি দারুণ বেগ! 'এক' এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতেই পৃথিবী নয় ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে! পৃথিবীকে এইরূপে আঠার কোটী মাইল চলিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

---

* ইতিপূর্ব্বে আনুমানিক ১৮১৬ শকে লেখকের রচিত "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" গ্রন্থে প্রকাশিত।

এই যে পৃথিবী এতটা পথ সবেগে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু কখনো কি কেহ ইহাকে অনিয়মিত ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছে? সেই যে প্রথম বৎসর পৃথিবী সূর্য্যকে কিঞ্চিদধিক তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছিল, আজও কি ঠিক ততদিনেই পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না? এই প্রদক্ষিণ কার্য্য বিন্দু পরিমাণেও অনিয়মিত ভাবে হইতে পারে না। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; যেমন পৃথিবী সেই চন্দ্রের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ আবার আমাদের এই সূর্য্য স্বকীয় গ্রহগণের সহিত হয়তো অপর এক বৃহত্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ সূর্য্যের পর সূর্য্য চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের এই পৃথিবী একবার যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বার সেই পথ দিয়া আর যাইতে পারিবে না। এই পৃথিবীর কক্ষপথের "অন্ত কোথা, অন্ত কোথা, এই কথা সবে জিজ্ঞাসে হে।"

আবার কেবল এই একমাত্র পৃথিবীই যে দারুণ দ্রুতগতিতে শূন্যপথে ভ্রমণ করিতেছে তাহা নহে। কত গ্রহনক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর বেগে চলিতেছে। ইহারি মধ্যে আবার কত ধূমকেতু চলিয়া যাইতেছে; কত নূতন জগত সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে তো কিছুমাত্র অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। সকলেই শৃঙ্খলার দ্বারা, নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে যে এই সকল কার্য্য সেই মহাশক্তি মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষের হস্ত প্রদর্শন করিতেছে না?

কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যেক পরমাণুতে গতিশক্তি আছে এবং সেই গতিশক্তির বলেই, কেবল এই গ্রহাদির পরিভ্রমণ নহে, জড়জগতের সকল কার্য্যই চলিতেছে। স্বীকার করিলাম যে,

পরমাণুর গতিশক্তির বলেই জড়জগতের সকল কার্য্যই চলিতেছে। তাড়িত শক্তিই বল, চৌম্বক শক্তিই বল, সকলই যে একমাত্র শক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন মাত্র, তাহা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানরাজ্যে স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা এই যে, পরমাণুগণ সেই গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? সকলপ্রকার শক্তি যে একই শক্তির বিভিন্ন আকার মাত্র, ইহা যেমন একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সেই-রূপ বিজ্ঞানের ইহাও আর একটি সিদ্ধান্ত যে পরমাণুগণের গতি থাকিলে তাহারা আপনা-আপনি থামিতে পারে না, এবং তাহা-দের গতি না থাকিলে আপনা-আপনি চলিতে পারে না—কারণ পরমাণুগন জড়বস্তু, সচেতন নহে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, পরমাণুগণ প্রথম গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? পৃথিবীই বল, সূর্য্যই বল, ইহারা প্রথমে চলিতে আরম্ভ করিল কি প্রকারে? ইহারা জড়বস্তু; সুতরাং শক্তি প্রাপ্ত না হইলে আপনা-আপনি শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। জড় বস্তুকে শক্তিশালী করিতে গেলেই তদতিরিক্ত শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। এই শক্তি তবে কে দিয়াছেন? যে শক্তিবলে অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র, অগণ্য গ্রহনক্ষত্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সে শক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা কোন্ পরিমিত শক্তিবিশিষ্ট জীবের থাকিতে পারে? সেই শক্তি দিতে পারেন কেবল সেই এক ইচ্ছা-ময় পূর্ণ পুরুষ। এই শক্তি তিনি যে কেমন করিয়া দিলেন, তাহা অবশ্য আমরা জানিতে পারি না, এবং তাহা মানবের বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে যে জড়বস্তুগণ স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জড়বস্তুকে শক্তিমান করিবার জন্য তদতিরিক্ত কোন শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক।

আবার কেহ কেহ বলেন যে পরমাণু বলিয়া কোন পদার্থ নাই; কেবল শক্তির কতকটা সমষ্টি মাত্র আছে। শক্তি পরমাণু ভিন্ন পৃথক থাকিতে পারে কি না, এবং পরমাণু শক্তি ভিন্ন পৃথক থাকিতে পারে কি না, অথবা কেবল শক্তিসমষ্টিই আছে, কিম্বা পরমাণু ও শক্তি উভয়ই আছে, এই সকল অতি দুরূহ সমস্যা হইলেও আমরা ইহা বলিতে পারি যে ব্যবহারিক পরমাণু ও ব্যবহারিক শক্তি, এই দুই বস্তু অন্তত আমাদের ব্যবহারিক চক্ষে নিতান্তই বিভিন্ন পদার্থ। এই দুই ব্যবহারিক পদার্থের ব্যবহারিক সংযোগই বা কে করাইয়া দিলেন? আর যদি বা কেবল মাত্র শক্তিসমষ্টিরই অস্তিত্ব থাকে, তবে সেই শক্তিসমষ্টিই বা আসিল কোথা হইতে? এই কারণ অন্বেষণ করিতে আমরা যতদূর যাই না কেন, যতক্ষণ না মূল কারণ ঈশ্বরে যাইয়া পড়ি ততক্ষণ কিছুতেই আমরা প্রকৃত কারণে উপনীত হইতে পারি না।

একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কথা উদ্ধৃত করিতেছি—"বৈজ্ঞানিক যদি কার্য্যকারণসম্বন্ধের সার্ব্বভৌমিকতা স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে স্বতন্ত্র এক অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি শক্তির পুঞ্জীকরণ স্বীকার করেন, তবে তিনি এক অনন্ত শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না; যদি তিনি চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে অন্তত পক্ষে চেতনার এক অনন্ত শ্রেষ্টার অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে হয়।" আমরা ইহার উপর তাঁহাকে ইহাও বলিতে বলি যে যদি তিনি প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত জ্ঞানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতেই হইবে। এই সঙ্গে তাঁহাকে

ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে জ্ঞান, প্রেম, চেতনা প্রভৃতি কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে? অথবা তাহারা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকিবে? অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি—এক সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর কে এই সকলের আশ্রয় হইবেন?

আর এক কথা এই যে, যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে আমাদের গুরুতর পরিশ্রম আবশ্যক, প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক, সেই সকল বিষয় দৈবক্রমে পরমাণুর গতিক্রম বশতঃ সংঘটিত হইয়াছে, ইহা কি কখনো সম্ভবপর? না, এক ইচ্ছাময় পূর্ণজ্ঞান পরম পুরুষের ইচ্ছানুসারে হইয়াছে ইহাই সম্ভবপর? মহাজ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদ জর্ম্মান পণ্ডিত কেপ্লার গ্রহগণের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"হে ঈশ্বর! আমি তোমারই চিন্তার অনুসরণ করিতেছি।" তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সকল গতির নিয়ম গ্রহগণের ঘুরিবার একটী প্রণালী মাত্র; কিন্তু পশ্চাতে যদি সেই শক্তিদাতা পুরুষ না থাকিতেন, তবে কিছুতেই গ্রহগণ গণিতের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত সকল অনুসরণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতে পারিত না। 'দৈবক্রমে' কথাটি উঠিয়াছে—জগতের এমন কোনো বস্তু কি আছে, এমন কোন ঘটনা কি আছে—যাহা দৈবাৎ হইতে পারে, যাহা কোনো কারণ বশতঃ হয় নাই বা নিয়মানুসারে হয় নাই? এমন কোন কিছু নাই। যাঁহারা এই জগৎসৃষ্টিকে দৈবক্রমে সংঘটিত হইয়াছে বলেন, তাঁহাদের কথা একেবারেই গ্রাহ্য নহে। ইহা জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সমূলে ধ্বংস করিবে। যদি এই জগৎসৃষ্টি প্রকৃতই দৈবক্রমে সংরচিত হইত, তাহা হইলে ভাস্করাচার্য্যই বা জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? আর গ্যালিলিও প্রভৃতি মনীষীগণ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত

হইলেন কেন? তাহা হইলে তাঁহারা গ্রহগণের গতির নিয়মাদি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতেন না; কারণ, যাহা দৈবক্রমে হইয়াছে এবং দৈবক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহার আবার নিয়ম কিসের?

আমরা যত কারণ দেখিতে পাই, সেগুলি অবান্তর কারণমাত্র, কিন্তু মূল কারণ অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাই যে ঈশ্বর ছাড়িয়া অপর মূল কারণ নাই; তাঁহাকেই বারম্বার নমস্কার করি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে দ্যাবাপৃথিবী বিষয়ক সপ্তম
বিবৃতি সমাপ্ত।

অষ্টম বিবৃতি—যাগযজ্ঞ।*

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে।
তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

হায়! আমরা আর কতকাল বৃথা ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকিব? কতকাল আর আমরা বৃথা যাগযজ্ঞ, বৃথা শরীরশোষণ প্রভৃতি লইয়া কালহরণ করিব? আমরাই না গর্ব্ব করি যে আমাদের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ জাতি আর পৃথিবীতে দেখা যায় না? এক সময় ছিল বটে যখন ভারতবাসী একথা বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত—কিন্তু আজ আর সে কাল নাই। এখন আমাদের হৃদয় সর্ব্বদাই এই ভয়ে

* বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৪ শক ৩০ কার্ত্তিক সন্ধ্যাকালে বিবৃত।

কল্পিত হয় যে আমরা বুঝি কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিনে দিনে ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি।

একবার সেই ঋষিদিগের বেদগানের বিষয় ভাবিয়া দেখ। যখন সমস্ত জগতে অজ্ঞান-অন্ধকার একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিল, সেই সময়ে ঋষিরা ভারতে বেদগান করিয়া অজ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মের নূতন জ্যোতি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্নির চতুঃপার্শ্বে বসিয়া বেদগান করিয়া, ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির স্তুতিগান করিয়া, কি আর্য্য, কি অনার্য্য, সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্মের এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব একবার প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, তাঁহারা কি ধর্ম্মের অংশ, একটুকু ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? তাহাতে কি তাঁহাদের জ্ঞান প্রেম ভক্তি পরিতৃপ্ত হয়? যাঁহারা একবার ধর্ম্মের আস্বাদ জানিয়াছেন, তাঁহারা যতক্ষণ না ধর্ম্মের মূল ব্রহ্মধামে গিয়া পৌঁছেন, ততক্ষণ তাঁহারা বিশ্রাম চাহেন না, শান্তি পান না। ঋষিদিগের জ্ঞান, তাঁহাদের প্রীতি ভক্তি কেবলমাত্র বৈদিক স্তুতিগানেই পরিসমাপ্ত হইতে পারিল না। তাঁহাদের হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহার মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা ক্রমে ভারতের অমূল্য রত্ন উপনিষৎ সমূহের ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইলেন।

ঋষিরা স্বীয় যত্ন ও চেষ্টায় শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, আর আমরা আমাদের অযত্ন ও নিশ্চেষ্টাবশতঃ দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা ধীরে ধীরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হারাইলাম, সেই স্তুতিগান সকলও হারাইলাম—রাখিলাম কেবল কতকগুলি বৃথা যাগযজ্ঞের আড়ম্বর।

এই বৃথা আড়ম্বরে মত্ত থাকিয়া আমরাও ক্রমে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট

হইয়া পড়িতেছি, কোন সৎবিষয়ে উৎসাহ পূর্ব্বক লাগিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে, ভারতবর্ষ হইতে মূর্ত্তিপূজা, মনুষ্যপূজা প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই জাগ্রত জীবন্ত দেবতা অনন্তজ্ঞান পূর্ণ পুরুষের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে হইবে। আমাদের দেবতা যে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাহা কেবল মুখের কথা নহে—কিম্বা কেবল জনশ্রুতি নহে—তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহা জ্বলন্ত সত্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, কি প্রাণের খেলা চলিতেছে, কি শক্তির খেলা চলিতেছে, কি জ্ঞানের খেলা চলিতেছে। এই সকলই আমাদিগের সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষকে দেখাইয়া দিতেছে।

সেই দেবতাকে অধিক দূরে যাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা প্রত্যেকে যে শত শত অমঙ্গল অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া আছি, আত্মাকে জ্ঞানধর্ম্মে সুসজ্জিত করিতে পারিতেছি, ইহাতেই কি সেই মঙ্গল্যদেবের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেছি না? এমন প্রেমময় জাগ্রত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কি প্রকারে মৃৎপাষাণ, অগ্নিজলকে পূজা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? ইহাতে কি আমাদের জ্ঞান প্রীতি ভক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে? কখনই নহে। মনুষ্য সচেতন এবং অপূর্ণ। সচেতন এবং পূর্ণ পুরুষ হইতে জ্ঞানপ্রেম আদান প্রদান করিতে না পারিলে মনুষ্য কখনই তৃপ্ত হইতে পারে না। যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে যে জগতের সকল কার্য্যই এক মহান্ জ্ঞানের কার্য্য, তখন সে সেই জ্ঞানময় পুরুষে প্রীতি স্থাপন করিতে পারে, নির্ভর করিতে পারে; এবং যখন সে এইরূপ নির্ভর করে, তখনই তাহার আত্মা কি জ্ঞানে, কি প্রীতিতে, কি কর্ম্মেতে, সকল বিষয়েই পরিতৃপ্ত হয়।

ঈশ্বরকে যতদিন না পাইব, আত্মাতে না উপলব্ধি করিব, তত দিন আমরা মোহাচ্ছন্ন জীবমাত্ররূপে জীবন যাপন করিব, ততদিন আমরা প্রকৃতই দারিদ্র্যসম্পন্ন থাকিব। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্যের তেজোময় বাক্যে বলিতেছেন ঃ—

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

হে গার্গি যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয় সে অতি দীন, কৃপাপাত্র ; হে গার্গি যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন তিনিই ব্রাহ্মণ।

প্রকৃতই আমরা যদি তাঁহাকে না জানিলাম, তবে আমাদের কি হইল ? সকলেরই আত্মা সেই অবিনাশী পুরুষের প্রতি যাইতে উদ্যত। সকলেরই হৃদয়ে সহস্র সুখের মধ্যে, সহস্র ভোগবিলাসের মধ্যে, সহস্র জ্ঞানভক্তির মধ্যে এমন এক অতৃপ্তি ও অশান্তি জাগিতে থাকে যে সকলেই অন্ততঃ একবার না একবার সেই একমাত্র তৃপ্তি-স্থল, শান্তির আলয় পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে উন্মুখ হয়।

এদেশের সংশয়বাদীগণের নিকটে আমার এই উক্তি অতিরিক্ত ভক্তির কথা বলিয়া উপহাসের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যে সকল সংশয়বাদী অজ্ঞেয়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের উপর স্বমতের পোষকতার জন্য নির্ভর করেন, তাঁহারাও অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; তবে তাঁহারা বহির্জগত লইয়া এতদূর ব্যস্ত থাকেন যে তাঁহারা আত্মার অন্তস্তম প্রদেশে নামিতে পারেন না এবং সেই কারণে কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহার পর আর যাইতে সাহস করেন না।

আমাদের ঋষিরা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল বহির্জগতের মধ্য দিয়া সকল বিষয় না দেখিয়া

আত্মার গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিলেন। সেখানে তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা স্বাধীনভাবে পুনরাবিষ্কার করিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের যে কতকাল লাগিবে তাহা কে বলিতে পারে? ঋষিরা এই আত্মার মধ্যে আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখিয়া নির্ব্বাক হইলেন—বলিলেন, "রসোবৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ; বলিলেন—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোনস্যাৎ," কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম না থাকিতেন। ঋষিরা সংশয়বাদকে অতিক্রম করিয়া দিব্যচক্ষে সকল জ্ঞানের সকল সত্যের মূলাধার পরব্রহ্মকে আত্মাতে অনুভব করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের দুরদৃষ্ট, ভারতের দুরদৃষ্ট—যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জগতের কতলোকে হতাশহৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; কতলোক যাহার জন্য আপনার সমুদয় ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়াও আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ঋষিরা ব্রহ্মেরই আশীর্ব্বাদে লাভ করিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, আর আমরা তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতেছি—আমরা জাগ্রত দেবতার পূজার পরিবর্ত্তে বৃথা আড়ম্বরে বৃথা যাগযজ্ঞে মত্ত হইয়া আছি!

গীতাকার যজ্ঞ নানাবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ইত্যাদি। তন্মধ্যে দ্রব্যযজ্ঞ সচরাচর যাগযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই দ্রব্যময় যাগযজ্ঞের ফল, গীতা বলেন, মেঘ হওয়া—"যজ্ঞাদ্ভবতিপর্জন্যঃ" (৩য়, ১৪); মনুও বলেন "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ.........।" (৩য়, ৭৬) অগ্নিতে আহুতি দিলে আদিত্যকে প্রাপ্ত

হয় এবং আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রকারদিগের মতে দ্রব্যযজ্ঞের ফল প্রধানতঃ বৃষ্টি, শস্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি। দ্রব্যযজ্ঞের ফলে আমরা বৃষ্টি পাই বা না পাই, শস্য পাই বা না পাই, শাস্ত্রকারদিগের মতে তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রশস্ত পথ নহে —জ্ঞানযজ্ঞ অথবা অধ্যাত্মযোগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র সরল উপায়; তপোযজ্ঞ প্রভৃতি সেই জ্ঞানযজ্ঞ সাধনেরই উপায় স্বরূপ। গীতা বলেন :—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। (৪র্থ, ৩৩)

হে পরন্তপ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ; হে পার্থ। সকল প্রকার কর্ম্ম জ্ঞানেতে পরিসমাপ্ত হয়।

জ্ঞানযোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ এবং তাহাই ঈশ্বরলাভের এক মাত্র সরল পথ।

এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ অবলম্বন না করিয়া বৃথা যাগযজ্ঞে মত্ত থাকিয়া আমরা কি মৃতপ্রায় হইয়া থাকিব? যে ভারতবর্ষ এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে দীপ্তসূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান ছিল, আজ কিনা সেই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের নামে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে থাকিতে ইচ্ছা করে? ধিক্ আমাদিগকে! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে উপদেশ দানচ্ছলে আমাদের সম্মুখেই যেন আজ বর্ত্তমান থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন :—

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা হস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

হে গার্গি। যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহুসহস্র বৎসর এই লোকে হোমযাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

"মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত

হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও বা লোকরঞ্জন বৃথা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মানমর্য্যাদা যশঃকীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হয় না।”

আমরা যখন ব্রাহ্ম হইয়াছি, যখন ইহা জানিয়াছি যে ব্রহ্মই আমাদের চিরন্তন দেবতা, হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর, তখন আমাদের আর তাঁহাকে ছাড়িয়া, কি বৃষ্টির জন্যই বল, কি শস্যের জন্যই বল, আর পাপতাপ নিবারণের জন্যই বল, কোনো কারণেই অন্য দেবতাকেও ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে অথবা অন্য কোন মনুষ্যকেও দেবতাবোধে ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা নির্ভয় হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বাস করিব এবং বিপদে সম্পদে সর্ব্বদা তাঁহাকেই ডাকিব। আমরা জানি যে পরমদেবতা এক পরব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইহার ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।

সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদিগের অন্তরে নিয়তই জ্ঞান প্রেরণ করিতেছ। তোমারই প্রসাদে তোমাকে জানিয়া কৃতার্থ হইতেছি। করুণানিধান প্রভো! যে ভারতভূমি তোমারই নামের প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভারত আজ তোমা

হইতে দূরে গিয়া কি দুর্দ্দশাই না ভোগ করিতেছে। তুমি এখান হইতে মূর্ত্তিপূজার মোহপাশ, যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বর প্রভৃতি উপ-ধর্ম্মের ভাব সকল দূর করিয়া দাও এবং পুনরায় এদেশে তোমাকে জানিবার সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। হে পরমাত্মন্! সেই শুভদিন শীঘ্র প্রেরণ কর। অন্য আর কি প্রার্থনা করিব?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে যাগযজ্ঞ বিষয়ক অষ্টম
বিবৃতি সমাপ্ত।

নবম বিবৃতি—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ। *

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কোন্ মানব আত্মার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া আত্মার গভীরতম প্রদেশে স্বীয় জ্যোতিতে বিরাজমান পরম পুরুষের পরম রূপ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? সেই আদিকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, কোন্ উপদেষ্টা সেই আদিদেবের স্বরূপ নিঃশেষে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কে তাঁহার স্বরূপের অন্ত করিয়াছে? কোটী কোটী জগত যাঁহার এক ইঙ্গিতে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া সবেগে ভ্রাম্যমাণ হই-তেছে, আমরা এই সামান্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব হইয়া সেই পুরুষো-

---

* ১২৯৯ বঙ্গাব্দ চৈত্র সংখ্যার নব্যভারতে প্রকাশিত।

গুমের স্বরূপ কি-ই নিরূপণ করিব? কিন্তু যখন নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করা যায়, কিম্বা যখন বিপদের কশাঘাত আমাদের আত্মাকে তাঁহার চরণ-প্রান্তে উপনীত করে, তখন আমরা তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ধারণ করিতে না পারিলেও আমাদের আত্মা নিতান্ত নীরব থাকিতে পারে না। তখন আমরা তাঁহাকে ডাকিতে থাকি, "পিতা তুমি পুত্র আমি, জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।" তখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, সখা বলিয়া, প্রাণের প্রাণ বলিয়া, আত্মার আত্মা বলিয়া ডাকিলে তবে আত্মার পরিতৃপ্তি হয়।

আজ আমরা যেমন ঈশ্বরের বিষয় জানিবায় পিপাসু হইয়াছি, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিরাও এইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধ্যানবলে যখন সেই জ্যোতির্ম্ময় "প্রাণস্য প্রাণং" পরম পুরুষের আভাস আত্মাতে অনুভব করিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তরে এক গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইল যে এই পরম পুরুষ কে?

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি॥

কাহার ইচ্ছায় মন পড়িতেছে, কাহার ইচ্ছায় মন প্রাণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে, কাহারই বা ইচ্ছাতে লোকেরা বাক্য বলিতেছে, কোন্ দেবতা চক্ষু কর্ণকে উপযুক্ত বিষয় সমূহে নিয়োগ করিতেছেন?

এই প্রশ্ন অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালকে এক সূত্রে সম্বন্ধ করিয়া দিতেছে। এই একই প্রশ্ন ছিল, আছে এবং থাকিবে। এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি তলবকার বলিলেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং সউ প্রাণস প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" এই পরম পুরুষ তিনিই, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু। ঋষি ধ্যানের উচ্ছ্বাসে দেখিলেন যে আমাদের যাহা কিছু, সকলেরই মূল কারণ তিনি।

ইহাই ঋষিদিগের ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই অধিকতর প্রচার প্রার্থনীয়। ইহারই উপরে আমাদের বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। পবিত্রহৃদয় ঋষি তলবকারের আত্মা হইতে প্রথমেই এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রকাশিত হইল—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান আত্মাতে পরিস্ফুট হওয়াই ঈশ্বরে নির্ভর অবিচলিত রাখিবার এক প্রধান উপায়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি এক বার আমাদের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়া যায়, তবেই আমরা চৈতন্য দেবের ন্যায় বলিতে পারিব যে যেথানেই যাই না কেন, সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিতে পাই। তখন তাঁহাতেই আমাদের তৃপ্তি, তাঁহাতেই আমাদের সুখশান্তি সকলই।

ঋষিরা এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন আরও গভীররূপে আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তন্ন-জ্ঞানও তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পত্রের যেমন এ-পিঠ ও-পিঠ দুই পিঠ আছে, সকল বিষয়েরই যেমন এদিক ওদিক দুই দিক আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানেরও তেমনি প্রত্যক্ষ এবং তন্ন দুই দিক আছে। ঋষিরা যতই ঈশ্বরকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা রূপে জানিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও জানিতে লাগিলেন যে, পরিমিত পদার্থের কিছুই ঈশ্বর নামে অভিহিত

হইতে পারে না। তাঁহারা বলিলেন—"অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং" (বৃহদাঃ শ্রুতি) ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ; ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা তাঁহার অন্য উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশ নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মও ঋষি তলবকারের কথায় বলিলেন—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণনীয় নহেন, যাঁহা দ্বারা বাক্য প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যাহা কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

পরিমিত কোন পদার্থই যে ঈশ্বর নহে, এইরূপ জ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ "তন্ন-জ্ঞান।"

ঋষিদিগের উক্তিতে আমরা ঈশ্বর বিষয়ক প্রত্যক্ষ ও তন্ন বা ব্যতিরেকী জ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল গভীর তত্ত্ব লাভ করিলাম তদতিরিক্ত আর কি তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারি? আমরা তাঁহাদিগেরই কথায় বলিতে পারি "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" যে সকল ব্রহ্মবাদী আচার্য্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা ইহাই শুনিয়াছি। ইহাতে আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত কোন কথাই নাই।

প্রত্যক্ষভাবে এবং ব্যতিরেকী বা তন্নভাবে, এই উভয় উপায়ে ব্রহ্মবিষয়ে প্রকৃতজ্ঞান লাভ করাই হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন উপদেশ

—ব্রাহ্মধর্ম্মও ইহাই শিক্ষা দেন। ভারতবাসীর অন্তরে যখন এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তন্নজ্ঞান দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া যাইবে, তখনই ভারতের প্রকৃত উদ্ধার সাধিত হইবে। তখন আমরা সুদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান থাকিয়াও সুদূর অতীতে সমাহিত তপোবর্দ্ধিত ঋষিদিগের সহিত একহৃদয়ে সারবান বেদমন্ত্রে ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিব। তখন অতীত বর্ত্তমানকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে এবং বর্ত্তমানও অতীতকে ভক্তিভরে আলিঙ্গন করিবে। ঈশ্বর সেই শুভদিন শীঘ্রই প্রেরণ করুন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ বিষয়ক
নবম বিবৃতি সমাপ্ত।

দশম বিবৃতি—অজ্ঞেয়বাদ।*

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥

বর্ত্তমানকালে দুই দিক হইতে দুইটী ভাবের স্রোত আসিয়া নাস্তিকতার পঙ্কিল জলাশয়কে একটী ভীষণ আবর্ত্তময় নদে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইতেছে—একটী হইতেছে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মহীন ও ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষা এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে, স্বদেশীয়দিগের অমূলক সংস্কার যে আত্মার আত্মা পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির নিতা-

* দাসী, ৬ষ্ঠ ভাগ ৯ম সংখ্যা, ১৮৯৭ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত।

স্তই অগম্য। এই দুইটী ভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবার ফল প্রায় একই প্রকার ঘটিয়া থাকে, কেবল তাহাদের প্রচার-গতি বিভিন্নমুখী হয়, এইমাত্র। স্বদেশীয়দিগের উল্লিখিত সংস্কারের ফলে এই হয় যে, লোকে মনে করে, যখন শুদ্ধসত্ব পরব্রহ্ম আমাদের বিবেকজনিত ও শ্রদ্ধাসমন্বিত বুদ্ধিরও নিতান্তই অগম্য, তখন তাঁহার অন্বেষণ করিতে যাওয়া আমাদিগের ন্যায় সাংসারিক ব্যক্তির পক্ষে বাতুলতা মাত্র। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহাদিগের সত্যের প্রতি এবং সত্য অন্বেষণের প্রতি শ্রদ্ধা চলিয়া যায়; তখন তাহারা স্বার্থদৃষ্টি হইয়া ভাবে যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক অপর পাঁচজনে যে পথে চলিতেছে, সেই পথে চলাই ভাল। এখন, মনুষ্যের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই আছে; কিন্তু আপাতরমণীয় মন্দ ভাবের প্রভাব অতি অল্প লোকেই সহজে অতিক্রম করিতে পারে। সুতরাং যে সমাজের সত্যনিষ্ঠা থাকে না, সেই সমাজের লোকেরা ধীরে ধীরে মন্দের দিকেই ঝুঁকিতে থাকে এবং এইরূপে আপনাদের সর্ব্বনাশের পথ আপনারাই প্রশস্ত করিয়া রাখে।

ইহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে না। তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে যে তাহার উৎপত্তি অতি উচ্চ আদর্শ হইতে; কিন্তু কে জানিত যে তাহার ফলে দুর্নীতিপরায়ণ কাপালিক প্রভৃতি ভীষণ সম্প্রদায় সকল উত্থিত হইয়া এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশকে একেবারে ছারখার করিয়া দিবে? বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে যে তাহার উৎপত্তি প্রেমের কত উচ্চ আদর্শ হইতে; কিন্তু কে জানিত যে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের এতদূর অধোগতি হইবে; বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে কুক্রিয়ান্বিত কদর্য্য সম্প্রদায়সমূহের অভ্যুত্থান হইবে?

প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার অভাবেই যে এরূপ অধোগতি ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আলোচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, যে ধর্ম্মসমাজে সত্যনিষ্ঠার অভাব হইয়াছে, সেই সমাজেই ধর্ম্ম আস্তে আস্তে সকলের অজ্ঞাতভাবে সরিয়া গিয়া অধর্ম্মের পথ এবং সেই সঙ্গে সেই সমাজের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই বিষয়ের আরও একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। ভারতের ঋষিমুনিগণ সাধনেচ্ছুদিগের হিতৈষণাপ্রেরিত ও তাহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া যে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, অথবা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, কত মনুষ্য সেই মূর্ত্তিপূজার নামে পশুবলি, নরবলি ব্যভিচার প্রভৃতি কত না অনাচার সাধন করিয়াছে। সত্যনিষ্ঠার অভাবেই যে এইরূপ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, নাস্তিকতা ও দুর্নীতি আসিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তরাশি আমাদের চতুর্দ্দিকে এতই অধিক পড়িয়া রহিয়াছে যে তদ্বিষয়ে আর অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক বিবেচনা করি। এই একদিকে, ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়, স্বদেশীয়দিগের এই অমূলক সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া অধর্ম্মের ভার আমাদের দেশকে অবনতির স্রোতে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া চলিতেছে।

অপর দিকে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মহীন ও ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষা এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতকে উৎসন্ন-দশায় লইয়া চলিতেছে। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সচরাচর যে সকল পুস্তক পাঠার্থে সন্নিবিষ্ট হয়, সে গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার নামগন্ধ নাই বলিলেও চলে। আর, পরে যুবকেরা উচ্চ শিক্ষার শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতিপরিচায়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, তাহারই বিজয়শব্দে বধির

হইয়া ধর্ম্মের অনাহত সুগভীর ধ্বনি অবহিত হইয়া শুনিবার অভ্যাস ভুলিয়া যান এবং তাহার অবকাশও প্রাপ্ত হয়েন না—কারণ ইচ্ছা না থাকিলে কোন বিষয়েরই অবকাশ পাওয়া যায় না। এই সকল বিজ্ঞান-পুস্তক যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত, তাঁহাদের অধিকাংশই সংশয়বাদী। যুবকেরা তাঁহাদের পুস্তকে এক বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া যান যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে সেই সকল সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অপেক্ষা যে অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতে পারেন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া কি বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মতত্ত্ব, সকল বিষয়েই তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারাও সংশয়বাদী হইয়া উঠেন। এইরূপে যখন তাঁহাদের হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব চলিয়া যায়, অধর্ম্ম তখন স্বীয় মায়াজাল বিস্তার করিয়া হৃদয়কে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। পার্থিব পদার্থের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহার সহায়তায় আমরা প্রলোভনমুক্ত হইতে পারি—সে ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র ধর্ম্ম।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সকলই অজ্ঞেয় অর্থাৎ ইহাঁদের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহাঁরা আমাদের জ্ঞানের অতীত পদার্থ, সুতরাং ইহাঁদের সন্ধানে না যাইয়া পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাই সুযুক্তিসিদ্ধ। স্বদেশীয়দিগের, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল অজ্ঞেয় অথবা বুদ্ধির নিতান্তই অতীত পদার্থ, এইরূপ সংস্কার এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-দিগের, অধ্যাত্মতত্ত্ব অজ্ঞেয়, এইরূপ সংস্কার, উভয়ই ফলত এক—উভয়ের কার্য্যও অনেকটা এক এবং উভয়ই অমূলক। উভয়ের উৎপত্তি বিভিন্ন—প্রাচ্য সংস্কারের উৎপত্তি কুদার্শনিকতা

হইতে এবং পাশ্চাত্য সংস্কারের উৎপত্তি কু-বৈজ্ঞানিকতা হইতে। প্রাচ্য সংস্কার ভারতের ঐতিহাসিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া অজ্ঞানান্ধদিগের ঘোর পৌত্তলিকতা, বামাচার প্রভৃতি আনয়ন করিল এবং পাশ্চাত্য সংস্কার পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞানান্ধদিগের ঘোর নাস্তিকতা আনয়ন করিল—উভয়েরই ফলে আসিল দুর্নীতি।

যে সকল স্বদেশীয় ব্যক্তি প্রাচ্য সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্ব অজ্ঞেয় এই কথা বলেন, তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে সত্য সত্যই যদি অধ্যাত্ম বিষয় সকল অজ্ঞেয় হইত, তবে ঋষিমুনিগণ কখনই আমাদিগকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে বলিতেন না; যদি পরমাত্মাকে আমাদের আত্মাতে উপলব্ধি করিতে পারা না যাইত তবে তাঁহারা কখনই এরূপ বলের সহিত বলিতে পারিতেন না এবং বলিলেও তাহা আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিতে পারিত না—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥

যিনি একমাত্র, সকলের নিয়ন্তা ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন,

তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় বৈদিক ঋষিমুনিদিগের এমন উপদেশ ও অনুশাসন থাকিতে স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ কি প্রকারে বলেন যে অধ্যাত্মতত্ত্ব অজ্ঞেয়, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গীতা তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন— "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর, এই সকল সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণের ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখাও কর্ত্তব্য যে বাস্তবিক ব্রহ্মবিষয়ক প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল একেবারে অজ্ঞেয় কি না। একেবারে যে অজ্ঞেয় হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ স্বরূপে ইহা দেখিলেই হয় যে অতি পুরাকাল হইতে এই সকলের নানাপ্রকারে আলোচনা হইতেছে। সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অতি অজ্ঞেয় কথা বলিলেও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে অন্তত সোনাও আমাদের জ্ঞানগোচর এবং পাথরও আমাদের জ্ঞানগোচর। সেইরূপ ঈশ্বর অজ্ঞেয় ইত্যাদিরূপ কথা আলোচনা করিলেই ইহা স্বীকার্য্য যে ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানগোচর বটে। তবে, আমরা এই পর্য্যন্ত বলি যে আমরা আমাদের সসীম জ্ঞানে ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি না; তিনি জ্ঞেয়ও বটে, অজ্ঞেয়ও বটে।

আমরা এতগুলি কথায় যে ভাবটী ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইলাম এবং যে ভাবটী সুব্যক্ত করিবার জন্য পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রাশি রাশি গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে রক্তবীজের ন্যায় নির্গত হইতেছে, সেই সমগ্র ভাবটী ঋষিরা একটি মন্ত্রে কেমন সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদচ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এম নও নহে, জানি যে এমনও নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

এইরূপ ভাবই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদীর ভাব। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ যেরূপ অর্থে আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে এইরূপ ভাবের সহিত অজ্ঞেয়বাদ শব্দ সংযুক্ত করিতে চাহি না; আমরা এরূপ ভাবকে শ্রদ্ধা-সমন্বিত জিজ্ঞাসা বলিয়া উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ শ্রদ্ধা-সমন্বিত জিজ্ঞাসা অবলম্বন করিলে আমাদের অনেক সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে ইহারই একান্ত অভাব। এই জিজ্ঞাসা অবলম্বনে আলোচনা করিয়া আমরা জানিতেছি যে ব্রহ্ম আত্মা প্রভৃতি বিষয়ক সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল একেবারে জ্ঞেয়ও নহে, একেবারে অজ্ঞেয়ও নহে। আমরা মনুষ্য বলিয়াই কতকটা জানিতে পারি, নহিলে মনুষ্য নামের গৌরব কোথায়? আবার মনুষ্য বলিয়াই কতকটা জানিতে পারিও না—নইলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইয়া পড়িতাম।

এই সকল অধ্যাত্মতত্ত্বের, যতটুকু আমরা জানিতে পারি, তাহার আধার আমাদের আত্মা। সূর্য্য যেমন জগৎকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাতে গভীরনিহিত সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য সকল পরমাত্মারও অস্তিত্ব প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে আত্মারও অস্তিত্ব প্রকাশ করে। আত্মার সহজজ্ঞানের প্রতি আমাদের সংশয় উপস্থিত হইলে কেবল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। আশ্চর্য্য এই যে, জড়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল

সত্য সহজজ্ঞানে প্রকাশ পায়, সেগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সত্য সহজজ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহারা সহজে ও সাদরে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়েন না। সহজজ্ঞানের বলেই আমরা আমাদের "আমিত্বে" নিঃসন্দেহ হই।

এই 'আমি' বা আত্মা নিরবয়ব এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যেমন বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত যন্ত্রসমূহ আত্মার জ্ঞানলাভের দ্বার মাত্র কিন্তু তাহারা আত্মা নহে, সেইরূপ আমাদের শরীরও আত্মার জ্ঞান-লাভের দ্বার মাত্র কিন্তু আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। আত্মা বিষয়ী এবং জগতে যাহা কিছু এই বিষয়ীর সম্মুখে অবভাসিত হইতেছে, সে সকলই তাহার বিষয়। তাই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত পিপ্পলাদ ঋষি বলিয়াছেন—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্ম পুরুষঃ।

আমাদের স্মৃতিশক্তি ও প্রতীক্ষাভাব অবলম্বনে স্পষ্টই জানিতে পারি যে আমাদের এই আত্মা সদ্বস্তু ও অবিনশ্বর; অবভাসিত বিষয় সকল সদ্বস্তুর বিপরীত ও ক্ষণস্থায়ী। অদ্যকার আমি ও দশ বৎসর পূর্ব্বের আমি এবং দশ বৎসর পরের আমি, সকলেই এক—কেবল দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিবে মাত্র। সুতরাং এই দেহ বিনষ্ট হইলেই যে আমিও বনষ্ট হইব, তাহার সম্ভাবনা কি? যেমন জানি যে এখনকার আমিই দশ বৎসরের পরের আমি থাকিব, তেমনি ইহাও জানি যে ইহলোকের আমিই মৃত্যুর পরপারে লোকলোকান্তরেরও আমিই থাকিব।

আমরা ইচ্ছাশক্তি বিষয়ে যতই আলোচনা করি, ততই এই

বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইতে থাকে। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের আত্মা হইতেই প্রসূত হয়, বাহির হইতে তাহা প্রাপ্ত হই না—এই শক্তি একটি মহান্ আধ্যাত্মিক শক্তি। কামনার প্রতিরোধ করিতে গেলেই আমরা ইহার তেজ অনুভব করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কোন শক্তিরই বিনাশ নাই। সুতরাং এই মহাশক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি হইলেও তাহার বিনাশ এবং তাহার আধার আত্মারও বিনাশ সম্ভব নহে, স্বীকার করিতেই হইতেছে।

এই অবিনশ্বর আত্মাতে যে সকল ভাব বা বৃত্তি চিরনিহিত আছে, আমরা তাহারই মধ্য দিয়া যতটুকু সম্ভব ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তাহার অতিরিক্ত বৃত্তির দ্বারা অপর কিছু জানা দূরে থাক, সেই বৃত্তির অস্তিত্বও কি আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি? সোনার পাথরবাটী, চতুষ্কোণ গোল, আমাদের কল্পনাতেই আসিতে পারে না।

আমাদের আত্মাতে শ্রদ্ধা বলিয়া একটী উচ্চতম বৃত্তি আছে। সেই শ্রদ্ধাভক্তির সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে আমরা আমাদের পরম পিতা ও পরম সখা পরমাত্মাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। এই শ্রদ্ধা-ভাব কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না; ইহা অনন্ত-স্বরূপের চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে চাহে। এই শ্রদ্ধাভক্তি-যোগে আমরা যেমন পরমেশ্বরকে আমাদের পিতা বলিয়া জানিতে পারি, তেমনি আমাদিগকেও তাঁহার সন্তান বলিয়া জানি। এই শ্রদ্ধাযোগেই তাঁহাকে ভক্তবৎসল ও দয়াময় মঙ্গলময় বলিয়া জানি এবং জগতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তি ভরে নমস্কার করি। অনেক বিষয়ে আমরা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সহজে ধরিতে পারি না। পৃথিবীর সৃষ্টির সেই আদিম কালে

পাথুরে কয়লার স্তরসমূহ যে সূর্য্যকিরণ কোটি কোটি বৎসর অবধি ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার ব্যবহার না জানা থাকিলে তাহা কি অপ্রয়োজনীয় ও অমঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইত না—মনে হইত যে তাহার স্থানে তৃণ শস্য হইলে কত উপকার হইত। কিন্তু তাহাতে এখন প্রত্যক্ষ উপকার দেখিতে পাইয়া আর কি কেহই তাহা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতে পারে? যে শ্রদ্ধাবলে ভগবানকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারি, সেই শ্রদ্ধা মিথ্যা পদার্থ নহে, অতীব সত্য পদার্থ—তাহা না হইলে তাহা ভক্তদিগকে ব্যাকুল করিয়া পরিণামে শান্তি দিতে পারিত না।

পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যেমন পিতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তেমনি তাঁহাকে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়াও জানি। তিনিই আত্মাতে নীতিজ্ঞান নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পুণ্যলাভে এত স্পৃহা, এবং পাপের প্রতি এত ঘৃণা। তাঁহারই ইচ্ছাতে আমরা সদনুষ্ঠান করিলে আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হই এবং অসদনুষ্ঠান করিলে আত্মগ্লানিতে মর্ম্মদগ্ধ হইয়া যাই। এই সকল জ্ঞান ও ভাবকে চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট করিতে পারে কিন্তু ইহাদের বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাদের বীজ পরমেশ্বরই আমাদের আত্মাতে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।

এই সুবিশাল ব্রহ্মচক্রও তাঁহাতেই অধিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা জানি যে জগতের সকল বস্তুই সাবলম্ব ও অপূর্ণ। জড়-শক্তি, প্রাণশক্তি, আত্মশক্তি প্রভৃতিকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। ইহাতেই আমরা জানিতেছি যে ইহাদের কেহই স্বয়ম্ভূত নহে। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রাকৃতিক

কারণই দেখাইতে পারে, অকৃত কারণ প্রত্যক্ষ করা বিজ্ঞানের অতীত। কিন্তু আমাদের আত্মা সেই অকৃত কারণে, সেই স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বরে না পৌঁছিয়া স্থির থাকে না। আমি যেমন জানি যে আমার আত্মা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, সেইরূপ জগৎকেও আত্মাতে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিলে বুঝি যে এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ সেই ইচ্ছাময় মহান্ আত্মা।

একমাত্র পরমেশ্বরই এই জগতের রচয়িতা ও নিয়ন্তা। তিনিই জড়শক্তি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি সকলই প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনিই এই ক্ষুদ্র মানবদেহে কি অপূর্ব্ব কৌশলে অমিততেজা আত্মাকে স্থাপন করিয়া তাহাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। সেই পূর্ণজ্ঞান এই জগতে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই জ্যোতির্বেত্তা গ্রহ উপগ্রহের গতিনিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন; উদ্ভিদ্‌বেত্তা উদ্ভিদের জন্মজরার, জীবতত্ত্ববিদেরা জীবগণের প্রাণনকার্য্যের এবং আত্মজ্ঞেরা অধ্যাত্মতত্ত্বের নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রাকৃতিক ঘটনা সকল আকস্মিক ঘটিলে তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারিত না।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি জানিতে গেলে অত্যধিক জ্ঞানের প্রয়োজন; আবার অনেকে বলেন যে অরণ্যগমন না করিলে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। আমাদের নিকটে এ সকল কথা মূল্যহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। এ সকল কথা আলস্যের কথা। অধ্যাত্মতত্ত্বলাভে আমার ইচ্ছা নাই, সুতরাং আমার ওজর আপত্তিরও অভাব নাই। অধ্যাত্মবিষয়ে যাঁহার আনুরক্তি থাকে, তিনি সকল অবস্থাতেই

তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" ভক্তিমান্ ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যে অধ্যাত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, গীতা এই একটি অমূল্য সত্য বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথাটি এই যে, শ্রদ্ধাবান্ হওয়াই বড় সহজ নহে। শ্রদ্ধাবান্ হইবার প্রথম সোপান নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তিসংযম। যিনি এই নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছেন, তিনিই জানেন যে ইহাতে কি কঠোর অধ্যবসায়, কত নির্ম্ম স্বার্থত্যাগ, এবং কি ঘোর বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই কারণে উপনিষদ্ বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অধ্যাত্মতত্ত্ব বলহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপলব্ধ হইতে পারে না। আবার যিনি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে ইহাতে কতটা বল লাভ করা যায়, দেহ মন আত্মা কত পবিত্র থাকে এবং নিবৃত্তি অবলম্বনে নিষ্কামভাবে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে পারা যায়। ইহাকে অবলম্বন করিলে জয়াজয়, লাভ ও অলাভ, সম্মান এবং উপহাস সমস্তই উপেক্ষার সহিত দৃষ্টি করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে প্রভূত বল আইসে এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এই বিষয়ে মহাযোগী বেদব্যাস দুইটী সুন্দর শ্লোকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি —

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২ অ, ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥৬৫

যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা রাগবিদ্বেষাদি-বর্জ্জিত। নিগৃহীতচিত্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও

আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সর্ব্ব দুঃখ নাশ হয় এবং প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি অবিলম্বে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটী শ্লোক গৃহে গৃহে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখা হউক।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে অজ্ঞেয়বাদ বিষয়ক দশম
বিবৃতি সমাপ্ত।

একাদশ বিবৃতি—ঈশাবাস্যং।*

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ঈশ্বরের সত্তাতে এই সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ দেখিতে হইবে। বৈদিক ঋষি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দাঁড়াইয়া আজিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন। আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এই ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জ যেমন শরীরকে অন্তরে বাহিরে আচ্ছাদন করিয়া আছে; আত্মা যেমন শরীরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে স্বকীয় প্রভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পরব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। পরব্রহ্মকে এই ভাবে উপলব্ধি করাই সাধকের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, তাঁহার যোগসাধনের চরম বিন্দু। পরব্রহ্মকে সকলের মধ্যে

---

* ১৮১৫ শক ২৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত।

এইরূপ অনুপ্রবিষ্ট না জানিলে অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হইবে না—যিনি যতটুকু এই পথে অগ্রসর হইবেন. তাঁহার ততটুকু যোগসিদ্ধি হইবে; এবং পরমাত্মার সহিত আত্মার এই অধ্যাত্ম-যোগ যতদিন সংস্থাপিত না হইবে, ততদিন প্রকৃতই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই।

আমাদের চারিদিকে কেবলই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি; ঘটনার পরিবর্ত্তন, জীবনের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তন। আমরা যদি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক দেখি, সেখানেও দেখিব যে কেবলি পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত মহাবেগে ঘুরিতেছে এবং অতৃপ্তির ও অশান্তির এক সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি দিবানিশি উত্থিত হইতেছে। আজ যে ধনাকে দ্রারিদ্র্যের প্রতি ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিতে দেখিতেছি, কাল হয়তো সেই ধনীকে পথের ভিখারী হইতে দেখিব; আজ যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া ভাবিতেছি কাল সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতেছে; আজ যাহাকে বন্ধু মনে করিতেছি, কাল সেই শত্রু হইতেছে; আজ সাধু হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি. কাল সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনস্রোতের মধ্যে কোথায় সুখ পাইব? আত্মা এই ভীষণ স্রোতে বিহ্বল হইয়া স্বভাবতই অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যের দিকে চক্ষু ফিরায়, তখন সেই প্রেমময় পিতা আত্মাকে আপনার সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করেন।

আত্মা অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকিলেও মধ্যে মধ্যে তৃপ্তির আলয় ও শান্তির আকর পরমত্মার দর্শন পাইয়াই বাঁচিয়া আছে। পরমাত্মদর্শনই আত্মার অমৃতবারি। পরমাত্মার প্রতি আত্মার এক স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বিষয়সুখ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রলোভন আসিয়া যদিও অধিকাংশ সময়েই এই আকর্ষণকে

বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি আত্মা সময়ে সময়ে সে সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই ধ্রুবসত্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং ব্যাকুলতা গভীর হইলে সত্যস্বরূপও আসিয়া দেখা দেন। আত্মা যদি সেই শান্তিনিলয় পরমেশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দর্শন করে, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারে না, শতসহস্র প্রলোভনও তখন তাহাকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তখন সে মাতৃহারা বৎসের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে আন্তরিক প্রেমোচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে থাকে—

"হরি তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি ;
সংসার সাগর মাঝে তুমি হে তরী।
তোমারে যখন পাই আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়তাপ সব পাশরি।"

আত্মা ব্যাকুল হইলে অমনি পরমাত্মা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। পরমাত্মা আত্মার আত্মা ; প্রকৃতই পরমাত্মার সহিত আত্মার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের বিষয়ে গীতা বলিতেছেন "পিতেব পুত্রায়, সখেব সখ্যুঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়" পিতার সহিত পুত্রের যে সম্বন্ধ, সখার সহিত সখার যে সম্বন্ধ, প্রিয়-জনের সহিত প্রিয়জনের যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত আত্মার সেই সম্বন্ধ। আত্মা সহস্র পাপে পাপী হইলেও সেই দয়াময় পিতা তাহাকে ত্যাগ করেন না। আত্মা যদি তাঁহার দিকে এক পদ অগ্রসর হয়, তিনি সহস্রপদ অগ্রসর হইয়া তাহাকে পাপতাপ হইতে উদ্ধার করেন। ইহা কেবলি কথার কথা মাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। পরমাত্মার ইহাই ইচ্ছা যে পথভ্রষ্ট আত্মা স্বয়ং তাঁহার মঙ্গলপথে ফিরিয়া আইসে। আত্মা যখনি ব্যাকুলতার সহিত

তাঁহাকে ডাকে, তখনি তিনি তাহাকে দেখা দেন, মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারেন না।

এই অবস্থায় পরমাত্মা আত্মার নিকট স্বপ্রকাশ। তখন আর আত্মাকে বলিয়া দিতে হয় না যে পরমাত্মা কে, তাঁহার স্বরূপ কি। শত সহস্র গাভীর মধ্য হইতেও মাতৃহারা বৎস যেমন আপনার মাতাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ আত্মাও পরমাত্মার দর্শন পাইলে একবারেই তাঁহাকে চিনিয়া লয়। তখন সহস্র নাস্তিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ হইয়া যায়। সে মহান্ আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছে—কুতার্কিকদিগের সহস্র তর্কজাল আর তাহার নিকট হইতে তাঁহার জ্বলন্ত সত্তাকে আবরণ করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিবার কালে আত্মা যেমন নাস্তিকের তর্করাশি দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের স্বরূপনির্ণায়ক তর্করাশিও দূরে পরিত্যাগ করে। সেই আত্মা অন্য কাহারও নিকট কিছুই শুনিতে চায় না, পরমাত্মারই প্রকাশ সর্ব্বভূতে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। তেজস্বী বৈদিক ঋষি সূর্য্যের নিকট কি সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছেন—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥" ঈশোপনিষদ্।

হে সূর্য্য! সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিবার পথ তুমি তোমার জ্যোতির্ম্ময় আবরণের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছ কেন? আমি তোমাকে চাহি না; আমি সত্যস্বরূপকেই প্রার্থনা করি অতএব তুমি তোমার অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগের পথ উদ্ঘাটিত কর। যাহার ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন ঘটিয়াছে,

সেই আত্মা এই বৈদিক ঋষির ন্যায় পরমাত্মাকে সকলের অন্তর্যামী দেখিয়া সকলেরই নিকট এই প্রার্থনা করে যে "আমাকে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ও চিরস্থায়ী যোগের পথ প্রদর্শন কর; আমি তর্ক প্রভৃতি বাক্যরাশি শুনিতে চাহি না।" প্রকৃতই সে যখন আনন্দস্বরূপের নিকট থাকিয়া এক মহান্ আনন্দ উপভোগ করে, তখন তর্কের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণের অবসর কোথায়?

পরমেশ্বরের প্রসাদে আত্মা তাঁহার সাক্ষাৎকার না পাইলে তর্কের দ্বারা তাঁহাকে নিরূপণ করে, কাহার সাধ্য? ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি সারবান্ ও স্বল্প কথায় এই মহাসত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন যে সেই নিত্যনিরঞ্জন পরমেশ্বর "অতর্ক্যং" তর্কের অগম্য এবং আস্তিক্যবুদ্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" আজ পাশ্চাত্য জগত হইতেও এই সত্যের প্রতিধ্বনি ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাইতেছি মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, ইহা কি তর্ক করিয়া বুঝান যায়? ইহা আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ একটী সত্য। আর যদি বা তর্কের উপসংহারে "ঈশ্বর আছেন" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তাহা হইলেও আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক বিশেষ কিছু জ্ঞানলাভ হইল না। আমরা তর্কের ফলে "ঈশ্বর আছেন" এই কথাগুলিতে সায় দিতে বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু সেই কথাগুলি আমার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিতে পারিল না। এইরূপে দেখিতেছি যে তর্কের দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মলাভ একেবারেই অসম্ভব।

ব্রহ্মপ্রসাদই ব্রহ্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের নিকটে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে আমরা কিছুতেই

তাঁহাকে পাইতে পারিব না। তিনি আত্মাতে কখন যে আবির্ভূত হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু জানি যে, যে আত্মা যত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে, সেই আত্মাতে তাঁহার সিংহাসন ততই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের আত্মা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইলে তবে সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপের তেজোময় আবির্ভাব ধারণ করিতে পারিব। আমরাই বা কিরূপে মলিনতাপূর্ণ আত্মাতে সেই দেবদেবকে আসীন্ হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারি? আর, আমরা যখন জানিনা যে তিনি কখন্ আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইবেন, তখন আমাদিগের আত্মাকে সর্ব্বদাই নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ রাখা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মলাভ অনায়াসসাধ্য কার্য্য নহে; ব্রহ্মলাভ করিতে গেলে কঠোর ব্রহ্মসাধন আবশ্যক। ভারতের আরণ্যক ঋষিগণ ব্রহ্মলাভের জন্য যেরূপ কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে তাঁহারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন; তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তাঁহাদিগের কঠোরতার আভাসমাত্র আমরা এইরূপ শ্লোকসমূহে পাইয়া থাকি—

বাসো বল্কলমাস্তরঃ কিশলয়ান্যোক স্তরূণাং তলং
মূলানি ক্ষতয়ে ক্ষুধাং গিরিনদীতোয়ং তৃষাশান্তয়ে।
ক্রীড়া মুগ্ধমৃগৈর্ব্বয়াংসি সুহৃদো নক্তং প্রদীপঃশশী
স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণা যাচন্ত ইত্যদ্ভুতং॥

বল্কলমাত্র তাঁহার পরিধেয়, বৃক্ষপত্র তাঁহার শয্যা এবং বৃক্ষতলই তাঁহার বাসস্থান, ফল মূলাদিতেই তাঁহার আহার কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং নির্ঝরিণীজলই তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করে; সরল হরিণ সকল তাঁহার ক্রীড়াসহচর, পক্ষী সকল তাঁহার বন্ধু এবং রাত্রিকালে চন্দ্রমাই তাঁহার পক্ষে প্রদীপস্বরূপ। ব্রহ্মসাধকের অন্য অর্থাদির প্রয়োজন নাই, প্রকৃতিই তাঁহার প্রয়োজন সাধন করিতেছে।

তাঁহারা যদি ব্রহ্মসাধনের জন্য এতদূর কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিলেন, আমরা কি ব্রহ্মলাভের জন্য কিছুমাত্র কঠোরতা অবলম্বন করিব না—ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিব না, স্বার্থত্যাগ করিব না—এই অত্যাবশ্যক বিষয়েও কঠোরতা অবলম্বন করিব না? কেবল বনে গেলেই যে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাও নহে! যিনি পূর্ব্বোক্ত কঠোরতার কথা বলিয়াছেন, তিনিই আবার বলিতেছেন—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

অর্থাৎ যাহার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার বনে গেলেও দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে এবং যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও বিষয়াসক্তিকে নিবৃত্ত করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়সংযমরূপ তপশ্চরণ করেন, তাঁহার পক্ষে গৃহই তপোবন।

ব্রহ্মসাধন বাল্যক্রীড়ার সামগ্রী নহে; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধন। এই ব্রহ্মসাধনের তিনটী অঙ্গ—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সাধক জানিতে পারেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য কি, সৎ কার্য্যই বা কি এবং অসৎকার্য্যই বা কি। তর্ক করা এক পদার্থ আর জ্ঞানাবলম্বন অপর পদার্থ। বৃথা তর্ক করিতে পণ্ডিতম্মন্য অহঙ্কারপূর্ণ ব্যক্তিরাই ভালবাসে।

জ্ঞানসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কর্ম্মসাধনের দ্বারা পবিত্র হইতে হইবে। যে বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে এই চরাচরকে ঈশ্বরের সত্তাতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইবে, তিনিই সেই প্রকার উপলব্ধি করিবার একটী উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং" অপরের ধনে লোভ পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্তরের কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিব, তাহা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে করিব; আমার যশ বৃদ্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি হইবে বা পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে, এই সকল ভাবিয়া যেন সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হই। কামনা পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের কামনাই যত অনিষ্টের মূল। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে পাপের উৎপত্তিবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে কামনাকেই পাপের প্রধান উৎপত্তি-কারণ ও মানবের সর্ব্বপ্রধান শত্রুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নির্ম্মূল করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। আমার যদি কামনা থাকে, তবে সেই কামনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক, এই কারণে ঋষিরা সকলেই এই কামনাকে জয় করিবার জন্য প্রাণগত যত্ন ও চেষ্টা প্রয়োগ করিতেন এবং অল্পাহার প্রভৃতি নানা কঠোর উপায় সকল অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা শিষ্যবর্গকেও এই বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ দিতেন। মনু বলিয়াছেন—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসারপার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি আপনার কামনাকে জয় করিয়া মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন। কামনাকে জয় করিয়া মনকে বশীভূত করাই প্রধানতঃ কর্ম্মযোগ। যে সাধক বিজ্ঞানকে সারথি করিয়াছেন ও মনকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে আর

কাহারও উপদেশ লইতে হয় না; তাঁহারই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হও-য়াতে ভক্তি স্বতই উথলিয়া উঠে এবং তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে এইরূপ ভক্তিমান্ সাধকই ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

ঋষিরা কেবলমাত্র এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে মনুষ্যের প্রকৃতি স্বভাবতই মন্দকর্ম্মের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে; সুতরাং সেই প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। এই প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহারা আমাদের শৈশবাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কঠোর সাধনের এক সুন্দর ব্যবস্থা, এক সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ব্রহ্মলাভ না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। হিন্দু রাজত্বের উন্নতির সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর কিরূপ ফল ফলিয়াছিল, তাহা সবিস্তার বলিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দুরাজত্বের যখন ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল, যে সময় হইতে হিন্দুরাজত্ব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখনও এই শিক্ষাপ্রণালীর ফল যাহা ছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কোন সুপ্রসিদ্ধ বিদেশীয় ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে তখন দ্বারে তালাচাবি লাগানো থাকিত না; হিন্দু মাত্রেই মিথ্যা কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করিত। কিন্তু এখন সেই শিক্ষাপ্রণালী বা কোথায় আর সেই ধর্ম্মবলই বা কোথায়! বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, ইহা দ্বারা ধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে কামনা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না সুতরাং এই শিক্ষা যে বহুল অংশে দূষিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালে পূর্ব্বের শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গীন

ভাবে প্রচলিত করাও দুঃসাধ্য ও অসম্ভব, কিন্তু সেই শিক্ষা আংশিকভাবেও যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে এদেশের শ্রেয় দেখিতেছি না—সম্মুখে কেবলই অন্ধকার। এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সহিত প্রাচ্য ধর্ম্মশিক্ষার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে।

আজ আমরা যে উৎসবে সমাগত হইয়াছি, এই স্থানে যে সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তাহারই স্মরণার্থ উৎসব নহে, ইহা অধ্যাত্মধর্ম্মের উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে এখানে অনেক সাধু সজ্জনের সমাগম হইয়াছে, সুতরাং এই উৎসব, কিসে আমাদের ধর্ম্মভাবের উন্নতি হইতে পারে, কিসে ভারতে সত্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার একটি উত্তম অবসর। আমরা পরস্পরের ধর্ম্মজীবনে পরস্পর সহায় হইব, এই উৎসব আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে। এখন চারিদিক হইতেই ধর্ম্মের মিথ্যা প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইতেছে। কেহ বলিতে-ছেন মনুষ্যত্বকে পূজা কর, কেহ বলিতেছেন যে অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার, তাঁহাকেই পূজা কর। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আর্য্যঋষিগণ যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশোদ্ভূত অনেক হিন্দু আজকাল সেই নিরাকার উপাসনাকে অশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। "সত্যমেব জয়তে" সত্যের জয় হইবেই, কিন্তু এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, এইমাত্র। যখন চতুর্দ্দিক হইতে সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে এইরূপ ধর্ম্মের মিথ্যা প্রতিমূর্ত্তি সকল দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন আমাদিগেরও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকেও সত্যধর্ম্মের পতাকাতলে

ম্নসন্নিবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং বংশানুক্রমে পুত্র-পৌত্রাদিকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগের স্থলাধিকার করিবার শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও অধর্ম্মের গতি ফিরাইতে না পারি, তখন সেই পাবনের পাবন, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকেই জানাইব "দয়াময়! আমরা দুর্ব্বল অসহায়; আমাদিগকে অধর্ম্ম বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর; দেবদেব, এই বিপদের সময়ে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদিগকে দেখা দাও; তোমারি আদেশে আমরা সত্যধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তুমি আমাদের আশা ভরসা সুখশান্তি, তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব"। এই প্রার্থনা শুনিয়া যখন তিনি আমাদের সহায় হইবেন, তখন সহস্রগুণ বল পাইয়া অধর্ম্মকে বিচূর্ণ করিতে সমর্থ হইব।

এইরূপে ব্রহ্মপ্রসাদে ব্রহ্মলাভ করিলে আমরা তো কৃতার্থ হইবই। কিন্তু যে দিন আমাদের পুত্রপৌত্রাদিগণও—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, পরমেশ্বর দ্বারা এ সমুদায়কে আচ্ছাদন কর; অপরের ধনে লোভ পরিত্যাগ করিয়া ও কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে ভোগ কর—

এই মহামন্ত্রকে স্বীয় জীবনে পরিণত করিবে, যে দিন তাহারা এই মহামন্ত্র অনুসরণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং আপনাদের প্রতি কার্য্যে ঈশ্বরেরই মহিমাপ্রচার ও জয়ঘোষণা করিবে, সেই দিন আমাদের সমস্ত জীবনের আশা, সমস্ত জীবনের পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমরা যদি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া পরলোকে

গমন করি, তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে আমরা সেখান হইতেও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিব এবং ঈশ্বর আমাদিগের সকলকেই তাঁহার আনন্দধামে লইয়া গিয়া অমৃতবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া দিবেন। অতএব বর্ত্তমান কালে আমরা যেন অধর্ম্মভাব প্রবল দেখিয়া নিরাশ হইয়া না পড়ি, সেই শুভ দিন সত্বর আনয়ন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে বিমুখ না হই। আমরা জানিতেছি যে সেই দিন আসিবেই—কারণ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন হইবেই। আমরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া অকাতরে পরিশ্রম করিব, কঠোরতা সাধন করিব এবং অসমর্থ হইলে কাতরপ্রাণে; ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকেই ডাকিব, বলিব

"কাতর আমার প্রাণ সংসারে,
ওগো পিতা দেহ তব চরণে স্থান।
তোমা ছাড়া আর কার দ্বারে যাব,
ওহে দীননাথ, কর দীনে শান্তিদান।"

তখন তিনিই আমাদিগকে আশ্রয়দান করিবেন। তিনি আমাদিগকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই এবং কখনো পরিত্যাগ করিবেন না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ঈশাবাস্যং বিষয়ক একাদশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

দ্বাদশ বিবৃতি--ভূলোকে ঈশ্বর।*

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষুচাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

দ্যুলোকে অসীম আকাশে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারকার মহাবেগে পরিভ্রমণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা যেমন সহজে উপলব্ধি করি, সেইরূপ এই ভূলোকেও, এই পৃথিবীতে নানা ঘটনা ও কার্য্যে সেই ঈশ্বরেরই হস্ত-পরিচয় পাইয়া তাঁহারই চরণে শ্রদ্ধাভক্তিতে অবনতমস্তক হইয়া পড়ি। দ্যুলোকের কার্য্য-কলাপেও যেমন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা ও নিয়মের অনতিক্রম-নীয় মর্য্যাদা দেখিতে পাই, সেইরূপ ভূলোকেরও কার্য্যসমূহে তাঁহা-রই প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা ও নিয়মের মধ্য দিয়া তাঁহারই "স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়ার" পরিচয় প্রাপ্ত হই।

এই ভূলোকে নানা দিকে নানা নিয়ম কার্য্য করিতেছে দেখা যায় একই মূল নিয়মের এই বিভিন্ন নিয়মগুলি বিভিন্ন আকার মাত্র কি না, সে বিষয় লইয়া বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক মহলে নানা বাদানুবাদ চলি-য়াছে। আমরা এখন সে তর্কসাগরে নামিতে চাহিনা। যাহা সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি,তাহাই অবলম্বন করিব। আমরা এখানে দেখি যে শক্তির পুঞ্জীকরণ (conservation of energy) কার্য্য

---

* লেখক রচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ গ্রন্থ হইতে পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত।

করিতেছে। এই এক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের জটিল তত্ত্বসমূহের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন। ইহা হইতেই তাঁহারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কোন শক্তির বিনাশ নাই—এক শক্তি অপর কোন শক্তির রূপান্তর মাত্র। অগ্নির যে তেজ তাহা রূপান্তরিত হইয়া তাড়িত শক্তিতে পরিণত হইতেছে, তাড়িত শক্তি চৌম্বক শক্তিতে পরিণত হইতেছে; আবার চৌম্বক তাড়িতে এবং তাড়িত আগ্নেয় তেজে পরিণত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় সকলেই এইরূপে একটী মূল মহাশক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই তাহার ঊর্দ্ধে যাইয়া সেই শক্তির পশ্চাতে এক শক্তিময় জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে আজও সমর্থ হয়েন নাই।

বৈজ্ঞানিকদিগের মতে যেমন জড়রাজ্যে শক্তির পুঞ্জীভাব অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ বর্ত্তমানে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই মতে প্রাণরাজ্যে অভিব্যক্তি নিয়ম কার্য্য করিতেছে। এই অভিব্যক্তি নিয়ম দুইটী প্রধান নিয়মের উপর দণ্ডায়মান—পরিবৃত্তি এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। জীবমাত্রেরই শাবকগণ যে পূর্ব্বপুরুষ পিতামাতা হইতে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন সহকারে জন্মগ্রহণ করে, তাহারই নাম পরিবৃত্তি। দেখা গিয়াছে যে এই পরিবৃত্তি নানা সূত্রে জীবগণের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির সহায় হয়। প্রথম প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান আজও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই, সেইরূপ কি উপায়ে জীবগণের আত্মরক্ষার সহায় পরিবর্ত্তনসমূহ সংসাধিত হয়, সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে বিজ্ঞান অসমর্থ। এই পরিবর্ত্তন জীবগণের আপনাদের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত হয় না—

পিতামাতা স্বীয় সন্তানগণের এই আত্মরক্ষার সহায়তাকারী পরি-বর্ত্তনের বিষয় কিছুই জানিতেই পারে না এবং জানিতে পারিলেও তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম ; বলা বাহুল্য যে পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবগণের ডিম্ব প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া তাহাদের নিজেদের আয়ত্ত নহে। অথচ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে সেই সকল পরিবর্ত্তন দুর্ব্বল প্রাণীগণকে সবল প্রাণীগণের আকৃতি গ্রহণে সহায়তা করে এবং তাহার ফলে তাহারা আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়।

অনেক সংশয়বাদী পণ্ডিত এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিয়-মিত কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক বিবেচনা করেন না। বাস্তবিক কি কোন প্রাকৃতিক নিয়ম স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারে ? আমি অগ্নিতে জল দিলাম, অগ্নি নিবিয়া গেল। এই কার্য্যটী প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়া সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কি অগ্নি নিবাইল অথবা আমি নিবাই-লাম ? প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহকে আমরা প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর ব্যাকরণ শাস্ত্র বলিতে পারি। আগে যেমন ভাষা, তাহার পরে যেমন ব্যাকরণ ; সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা আগে, তাহার পরে সেইরূপ ঘটনা নিয়মিতরূপে ঘটিতে দেখিলে আমরা সেই ঘটনা-সকলের কার্য্যকারণের মধ্যে একটী নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া সেই সম্বন্ধের নাম দিই "প্রাকৃতিক নিয়ম।"

কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা কে ? কার্য্যকারণের মধ্যে এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের যোজয়িতা কে ? পূর্ণশক্তি ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহাকে এই সকলের নিয়ন্তা বলিতে পারি ? আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের নিকটে যতই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, প্রাকৃ-তিক ঘটনা সকল কি উপায়ে হইতেছে, তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা

বৃথা। পরিবৃত্তিই বল বা অন্য যে কোন নিয়মই বল, কোনও নিয়মই বলিতে পারিবে না যে অমুক প্রাকৃতিক ঘটনা কি উপায়ে হইল; সে এইমাত্র বলিতে পারিবে যে, অমুক প্রাকৃতিক ঘটনা কেন হইতেছে অর্থাৎ কি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংঘটিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকলেরই মুখে অভিব্যক্তি নিয়মের অপর প্রধান ভিত্তি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নিয়মের কথা সর্ব্বদাই শোনা যায়। এই নিয়মের কথা শুনিলেই মনে হয় যে ইহাতো অতি সহজ কথা—যে যোগ্যতম হইবে, তাহারই জয় হইবে। কিন্তু সহজ কথা হইলেও এই বিষয়টী একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে যোগ্যতম বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বুঝায় না। যোগ্যতম বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে চতুর্দ্দিকের অবস্থার পক্ষে অধিকতম উপযোগী। প্রাণীবৃত্তান্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নানাজাতীয় জীবজন্তু এক সময়ে অবস্থার উপযোগী হওয়াতে সদলবলে পৃথিবীতে বিচরণ করিত, পরে অবস্থার প্রতিকূলতা হেতু লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। ইহারই সঙ্গে আরও এইটুকু দেখা যায় যে, সেই লুপ্তপ্রায় জীব-দিগের স্থানে আগত পরবর্ত্তী জীবগণ অনেক বিষয়ে "উন্নততর"; —তাহাদিগের শারীরিক গঠন, মস্তিষ্ক প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী জীবদিগের অপেক্ষা অধিকতর আবর্ত্তিত।

কাজেই দেখা যাইতেছে অভিব্যক্তি নিয়ম স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে উন্নতি; পরিবৃত্তি ও যোগ্য-তমের উদ্বর্ত্তন, এই নিয়মদ্বয় যে অভিব্যক্তি নিয়মের ভিত্তি, সেই অভিব্যক্তি নিয়মটী সেই উন্নতিরূপ উদ্দেশ্য সাধনের কার্য্যপ্রণালী মাত্র, যন্ত্র মাত্র। সৃষ্টির লক্ষ্য উন্নতি।

কাহার উদ্দেশ্য এই জগতের উন্নতি? ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে উন্নতির হিল্লোল অবিশ্রান্ত ভাবে বহিতে থাকিবে। যিনি সমুদয় বিশ্বজগতকে উন্নতির সহায় করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, যিনি মৃত্যুকেও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে নিরত রাখিয়াছেন, সেই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি পরব্রহ্ম ব্যতীত এই উন্নতির স্রোত জগতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া আর কাহাতে সম্ভবিতে পারে? তিনি ভিন্ন আর কে এতটা ক্ষমতা ধারণ করিতে পারে? এই উদ্দেশ্য যদি তাঁহারই না হইবে, তবে কি কতকগুলি অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এই উন্নতির উদ্দেশ্যকে স্থাপন করিয়াছে? অচেতন কার্য্যপ্রণালীমাত্র কোন মহান্ "উদ্দেশ্যকে" স্থাপনা করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা বাতুলতার কথা আর কি হইতে পারে?

আমি দূরে সংবাদ প্রেরণ করিব। সেই কারণে আমি কতকগুলি দণ্ড তাম্রতারে সংযুক্ত করিয়া দিলাম এবং সেই তারের সহিত একটী বিশেষ যন্ত্র সংযুক্ত করিলাম। এখন এই যন্ত্রটী বিশেষভাবে স্পর্শের ফলে তাড়িতশক্তি উৎপাদন করিয়া আমার অভিলষিত প্রদেশে প্রেরণ করে। আবার আমারই রচিত কোন বিশেষ সংকেত অনুসারে সেই তাড়িতশক্তি অবলম্বনেই আমি যথাস্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারি। দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য কি তাড়িত শক্তির অথবা আমার? আমিই কি এই উদ্দেশ্যের মূল প্রবর্ত্তক নহি? এবং তাড়িতশক্তি কি আমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের এক বিশেষ যন্ত্র ও নিয়মপ্রণালী মাত্র নহে? তাড়িতশক্তির উদ্দেশ্য দূরে সংবাদ প্রেরণ করা, ইহা কতদূর অসঙ্গত কথা?

উদ্দেশ্য মাত্রেরই পশ্চাতে এক সজ্ঞান পুরুষ আবশ্যক। সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উন্নতি-উদ্দেশ্যস্থাপন কতকগুলি অচেতন নিয়মপ্রণালীর দ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না। অচেতন নিয়মের কথা দূরে থাক, সজ্ঞান মনুষ্যই কি সকল সময়ে উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে? আমরা যখন আহার করি, তখন কি আমরা ইহা মনে করিয়া আহার করি যে, ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা আমার উন্নতি সাধিত হইবে? আমাদের ক্ষুধা পায় বলিয়াই আমরা আহার করি; ক্ষুধার সময়ে আহার না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই আমরা আহার করি। ক্ষুধা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে না। যে মঙ্গলবিধাতার আদেশে ক্ষুধা শরীরের মধ্যে আসিয়াছে, তিনিই জানেন যে, ইহা কেন আসিয়াছে, ইহা দ্বারা কি উন্নতি সাধিত হইবে। তবে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই, যখন দেখি যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে গিয়া মনুষ্যের প্রয়োজনীয় নানা তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; আহার করিয়া শরীরের বলবৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই সঙ্গে মানসিক বল, আধ্যাত্মিক বল সকলই বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমরা যে দিকেই ফিরিয়া দেখি, সেই দিকেই আমার সেই প্রিয়তমের সুগন্ধ আঘ্রাণ করি; সেই দিকেই আমরা দেখি যে চেতনের চেতন পরমেশ্বর জড়রাজ্যের অতীত থাকিয়া, প্রাণরাজ্যের অতীত থাকিয়া, সকলেরই অতীত থাকিয়া, সকলের দ্বারাই স্বীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লইতেছেন। সেই উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে উন্নতি হউক।

বিজ্ঞান যতই কেন নূতন নূতন তত্ত্বরাশি আবিষ্কার করুক না, সে সকলই সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের নিয়মপ্রণালী মাত্র—

বিশেষ বিশেষ পথমাত্র। ইহাদের মূলে এক সজ্ঞান, শক্তিমান নিয়ন্তা না থাকিলে ইহারা থাকিতেই পারে না। বিজ্ঞান যতই আলোচনা করা যায়, ততই সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরেরই হস্ত দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে থাকি। কে বলে যে, অভিব্যক্তি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরে শ্রদ্ধা দৃঢ় থাকে না? এমন কোনই কথা নাই যে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস আসিবে, অথবা ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেই সেই সকল সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস করিতে হইবে। জ্যোতির্বিদ্যায় কেপলার বা ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তই বল, পদার্থবিদ্যায় নিউটনের সিদ্ধান্তই বল, আর প্রাণীতত্ত্বে ডার্বিনের সিদ্ধান্তই বল সকল সিদ্ধান্তই সেই পূর্ণমঙ্গল পরব্রহ্মেরই মহিমা একবাক্যে কীর্ত্তন করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ভূলোকে ঈশ্বর বিষয়ক দ্বাদশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ বিবৃতি—তপস্যা।*

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; যিনি জগতের সকল ঘটনাই জানিতেছেন এবং যিনি জগতের প্রত্যেক ঘটনা জানিতেছেন; যাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না; যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিয়া

*১৮১৬ শক ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত।

এবং আমাদের চিরসঙ্গীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অনিমেষ আঁখিতে সকল ঘটনাকে মঙ্গলের পথে নিয়মিত করিতেছেন; যাঁহাকে ছাড়িয়া কাল দাঁড়াইতে পারে না "নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে" সেই পরব্রহ্মকে একাগ্রচিত্তে জানিতে ইচ্ছা কর "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।"

ব্রহ্মজ্ঞানই আমাদের চরম পুরুষার্থ। একবার ভাবিয়া দেখ, সমস্ত জীবন পৃথিবীকে লইয়া কাল কাটাইলে, একবারও সেই পরম পুরুষের দিকে চক্ষু ফিরাইলে না—তোমার হৃদয় কি ঘন-ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সহিত চির আবদ্ধ থাকিলে আমাদের হৃদয় কি শান্তি পাইতে পারে? কখনই নহে, কেবলই অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। কতকগুলি বৃথা কর্ম্মে দিন অতি-বাহিত হইয়া যায়। যে সকল বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাতে প্রাণমন ঢালিয়া দেয়, তাহাদের উন্নত ভাব সকল এতদূর চাপা পড়িয়া যায় যে তাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা কত অবনত হইয়াছে। তাহাদের সততই এই চিন্তা যে কে তাহাদের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং তাহারা অপরের কত সর্ব্বনাশ করিবে। একবার অন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে যে, সে অবস্থায় আমাদের সুখও থাকিতে পারে না, শান্তি তো দূরের কথা। পরমেশ্বর পৃথিবীর এই প্রকার কঠোর জীবদিগেরও পক্ষে তাঁহাকে জানিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; তিনি তাহাদেরও লৌহকবাট ভেদ করিয়া তাহাদের সমক্ষে প্রকাশ হয়েন—ইহাই তাঁহার করুণা। যখন বজ্রাঘাতে তাহাদের গৃহ ভগ্ন হইতে থাকে; যখন প্রবল বন্যা আসিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায় অথবা যখন মৃত্যু সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, তখন তাহাদের হৃদয় মুহ্যমান হইয়া

পড়ে—তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে পৃথিবীই কেবল সর্ব্বস্ব নহে, পৃথিবীর উপরেও এমন এক পুরুষ আছেন, যাঁহার ক্ষমতা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারেনা। এইরূপে তাহারা বিপদের কঠোর মূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বরের রুদ্রদণ্ড দেখিয়া ভীত হয়। বিপদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরকে দেখে, তাহারা তাঁহাকে বাহিরেই দেখে। তাহারা তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না।

আত্মজ্ঞানীরাই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। আত্মজ্ঞানীরাই ঈশ্বরকে আত্মস্থ—নিকটস্থ করিয়া জানেন। তাঁহারা আপনাদের প্রেম, আপনাদের জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রেমরূপ দেখিতে পান এবং জ্ঞানরূপ জানিতে পারেন। আত্মজ্ঞানীরাই যে ঈশ্বরকে অধিকতর রূপে জানিতে পারেন, এ কথাটী অতি পুরাতন; কিন্তু ইহা নিতান্ত সত্য এবং সত্য বলিয়াই ইহা পুরাতন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ

সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতি এবং তাঁহাকে আত্মজ্ঞানীরাই জানেন।

আর আজ বহুশতাব্দী পরে আমাদেরও আত্মা হইতে এই কথার পূর্ণগম্ভীর প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে। চেতন আত্মা অবলম্বনেই ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারা যায়, জড় অবলম্বনে সেরূপ হয় না।

ঈশ্বরকে যদিও আমরা আত্মার সহজ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষরূপে আত্মস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে তপস্যা অবলম্বন করা আবশ্যক। ঋষিরা তাঁহাকে যেরূপ "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" প্রতীতি করিয়াছিলেন, তপস্যা ব্যতীত আমরা তাঁহাকে সেরূপ বিশেষভাবে জানিতে পারি না। সংসারের

মোহমদিরাতে একেবারে মগ্ন হইয়া থাকিব অথচ তাঁহাকে জানিব, সে আশা বৃথা। তপস্যা অবলম্বনে আমরা বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যখন নির্লিপ্তভাবে সংসারের কার্য্য করিতে থাকিব, যখন পৃথিবীর উপরে উঠিব, তখনি মুক্ত আকাশের ন্যায় মুক্ত আত্মাতেও ঈশ্বরের জলন্ত প্রকাশ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই ঋষি বলিতেছেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর।

বরুণপুত্র ভৃগু ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় পিতাকে বলিলেন "অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা দাও; ভৃগু জিজ্ঞাসা করিলেন যে অন্ন, প্রাণ বা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহাদিগের কোন্‌টী ব্রহ্ম? বরুণ ঋষি তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

তপস্যার অভাবে ভৃগু প্রথমে অন্নকেই ব্রহ্ম স্থির করিয়া পিতা বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি অন্নই ব্রহ্ম—কারণ অন্ন হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্ন কর্তৃক জীবিত রহে এবং পরিণামে অন্নেতেই প্রবেশ করে?" পিতার নিকটে যখন তিনি জানিলেন যে অন্ন ব্রহ্ম নহে, তখন তিনি বলিলেন, হে ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা দাও "অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।" বরুণ বুঝিলেন যে তপস্যার বল না থাকিলে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-

জ্ঞান লাভ ও ধারণ করা অসম্ভব, সেই কারণে পুত্রকে উপদেশ করিলেন তপস্যা অবলম্বনে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে তপস্যা অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রাণকেই ব্রহ্মস্বরূপ স্থির করিয়া পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি প্রাণই ব্রহ্ম—প্রাণ হইতে জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া প্রাণ কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং অন্তে জীব সকল প্রাণেতে প্রবেশ করে?" এবারেও পিতার নিকটে, প্রাণ ব্রহ্ম নহে ইহা জানিয়া বলিলেন হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানশিক্ষা দাও—"অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।" বরুণ পুনরায় বলিলেন তপস্যা অবলম্বনে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" গুরুও যে প্রকার কঠোর, শিষ্যও সেই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভৃগু পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়া মনকেই ব্রহ্মের স্বরূপ স্থির করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি মনই ব্রহ্ম—মন হইতে এই সকল জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহে এবং অন্তকালে মনেতে প্রবেশ করে?" পুনরায় তাঁহাকে বলিতে হইল "অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।" বরুণও পুনরায় পুত্রকে বলিলেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" ভৃগু পুনরায় বিজ্ঞানকেই ব্রহ্মস্বরূপ স্থির করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি বিজ্ঞানই ব্রহ্ম—বিজ্ঞান হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞান কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং পরিণামে বিজ্ঞানেই এই সকল প্রবেশ করে?" বরুণ ঋষি স্বীয় পুত্রের এখনও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই বুঝিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভৃগু পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়া জানিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃকই জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মেতেই গমন করে ও প্রবেশ করে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ভৃগু বারম্বার তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া তবে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ পূর্ব্বক ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এখন আমাদিগের দেখিতে হইবে যে, তপস্যা বস্তুটা কি? ইতি পূর্ব্বে যে বৈদিক কালের কথোপকথন উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে তপস্ শব্দে গভীর চিন্তা বা একাগ্রচিত্তে আলোচনা এইরূপ কোন অর্থ বুঝাইত। পরে যখন পাতঞ্জলাদি দর্শনের কাল আসিল, তখন তপস্ শব্দের অর্থে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, মৌন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দ্বন্দ্বসহন ও মিতাহারাদি হইল। ক্রমে পৌরাণিক কালে তপস্যার অন্তর্নিহিত ভাব সকল বিকৃত আকার ধারণ করিয়া শারীরিক ক্লেশসহন ও ক্ষয়করণে পর্য্যবসিত হইল। এই পৌরানিক সময়ে তপস্যা এরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছিল যে গীতাকার ইহার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃত তপস্যা কি, তাহাও তিনি সুন্দররূপে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি তপস্যাকে শারীর, বাঙ্ময় ও মানস, এই ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শারীর তপস্যা কি?—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭শ অ

দেব, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, শুচিতারক্ষা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এই সকল শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।

ইহার মধ্যে শরীরকে বলহীন করিবার কথা কোথায়? বাঙ্ময় তপস্যা কি?—

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। ১৭শ অ।

লোকের অভয়জনক বাক্য, সত্য বাক্য ও লোকের মনোরঞ্জক অথচ হিত-কর বাক্য এবং বেদাদি পাঠ, ইহাই বাঙ্ময় তপস্যা।

মানস তপস্যা কি—

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, অযথা প্রলাপ না করা, আত্মসংযম এবং অন্তরে সাধুভাবকে স্থান দেওয়া, এই সকল মানস তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

গীতাতে আমরা তপস্যার যে ভাব দেখিতেছি, তাহার কোথায় পৌরাণিক বিকৃত ভাব আছে?—কোথায়ও নাই। গীতাতে যে ভাবে তপস্যাচরণ করিবার কথা আছে, তাহা কেমন স্বাভাবিক এবং সুতরাং কেমন সত্য। গীতা রচিত হইবার কালে তপস্যার অর্থ এতদূর বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে সাধারণে বুঝিত শরীরকে ক্লেশ প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়ার নামই তপস্যা। গীতাকার সেই কারণে শরীরশোষক কুতপস্বীদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—যে সকল ব্যক্তি দম্ভাহঙ্কার প্রভৃতি যুক্ত হইয়া মূর্খতাবশতঃ শরীরকে ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক কঠোররূপে অশাস্ত্রবিহিত তপস্যা করে, তাহারা আসুরসংকল্প। * গীতাকার

* অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

দেখিয়াছিলেন যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখনও অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী প্রকৃত ধর্ম্মপথে না গিয়া অনাহার প্রভৃতিরূপ মিথ্যা তপস্যা অবলম্বন করিয়া জনসাধারণকে প্রতারণা করিত। তাই তিনি ইহাদিগকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন।

গীতাতে ত্রিভাগে বিভক্ত তপস্যাপ্রণালীর প্রত্যেক বিভাগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত তপশ্চরণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক তপস্যা করেন। †

আর আমি তপস্যা করিলে লোকে আমাকে ধার্ম্মিক বলিবে, সাধু বলিবে, কি আমার লাভ হইবে, এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যাঁহারা তপশ্চরণ করেন, তাঁহারা রাজস তপস্বী। এইরূপ তপস্যার ভাব সকল সময়ে থাকিবে না—আপনার স্বার্থসিদ্ধি যদি না হয়, তাহা হইলে রাজস তপস্বীগণ কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে তপশ্চরণ করিবেন না। তাই গীতাকার রাজস তপস্যাকে অধ্রুব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡

আর যাহারা তামস তপস্বী, তাহাদিগের তপস্যা তপস্যা নামেরই উপযুক্ত নহে—কেবল কতকটা ভাবসাদৃশ্য বশতঃ তাহাকে তপস্যার মধ্যে ধরা হইয়াছে। পরের বিনাশ সাধনার্থে জপ প্রভৃতি এইরূপ

† শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥

‡ সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং॥

তপস্যার অঙ্গ। এইরূপ তপস্যাকে আমরা আসুর তপস্যা বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারি এবং বোধ হয় এইরূপ তপস্যাই গীতার সময়ে সমধিক প্রচলিত ছিল।* গীতাকার তামস তপস্যার বিষয় বলিতেছেন—যে ব্যক্তি শরীরের ক্ষয় করিয়া বা পরের বিনাশ সাধনার্থ তপস্যা করে, সে ব্যক্তির তপস্যা তামস তপস্যা। †

তপস্যা বস্তুটা কি এবং তপস্যার কত প্রণালী হইতে পারে, তাহা আমরা গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে সুন্দররূপে দেখিয়াছি। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ তপস্যাকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি—হেতুবিশিষ্ট ও অহেতুবিশিষ্ট। আমরা ভাল হইব, ধর্ম্মপথে না চলিলে অমঙ্গল হইবে, এই সকল ভাবিয়া যখন চেষ্টাচরিত্র করিয়া ধর্ম্ম পথে চলি, তখনই তপস্যা হেতুবিশিষ্ট হয়—ইহাকে কতকাংশে রাজস তপস্যা বলিলেও বলা যায়। ইহার মধ্যে অধিকাংশ সময়ে কোন না কোন প্রকারে ফলাকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া থাকে। আর অনেকের তপশ্চরণ যেন কতকটা স্বাভাবিক। এইরূপ ব্যক্তিদিগেরই তপস্যাকে আমরা অহেতুবিশিষ্ট তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাঁদিগের যেন যত্নপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে হয় না। কেহই ইহাঁদিগকে তপস্যা অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেয় না—প্রত্যুত ইহাঁরা সম্মুখস্থ শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেমন সহজভাবে

* এখনও এইরূপ তপস্যা ভারতে বহুল প্রচলিত। এইরূপ তপস্যা দ্বারা লোকের প্রকৃত অনিষ্ট হউক বা না হউক, অনেকে তাহা বিচার না করিয়া অনায়াসেই বিশ্বাস করে। এই সে দিন একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে জনৈক শাক্ত ধর্ম্মপ্রচারক হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিলেন যে এখনও অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী বশীকরণ, চাটন, মারণ প্রভৃতি বিদ্যা জানেন।

† মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং॥

তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ এইরূপ তপস্যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

ধ্রুব যখন তাঁহার বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া মাতার কাছে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন মাতা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তাঁহার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। আর যদি তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে, তবে তিনি পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান হউন, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে। *

ধ্রুব তাঁহার মাতার কথিত স্বল্প ঐশ্বর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে সকল ঐশ্বর্য্যের মূলাধারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার মাতাকে বলিলেন "হে মাতঃ! কঠোর বাক্যে বিদীর্ণ আমার হৃদয়ে তোমার শান্তিময় বাক্য দাঁড়াইতেছে না। আমি এরূপ তপস্যা করিব যাহাতে সর্ব্ব-জগতের পূজিত সর্ব্বোত্তম স্থান প্রাপ্ত হই। আমি অন্যদত্ত স্থান চাহি না। স্বকর্ম্মের দ্বারা এরূপ স্থান পাইতে অভিলাষ করি যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।" †

* তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎপুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ।

† অম্ব যৎত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতৎ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥
সোহহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমং।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতং॥
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমন্যং স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম॥

মাতাকে এই সকল বলিয়া তিনি বনপ্রস্থান করিলেন। তথায় কয়েকটী মুনিঋষির নিকটে ভগবান্‌কে উপসনা করিবার প্রণালী জানিয়া লইয়া গভীর অরণ্যে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই বালক ধ্রুবের বল কত হইল! তাঁহার পদভরে পৃথিবী বিকম্পিত হইতে লাগিল; দেবলোক ভয়ে আকুল হইল। দেবতারা তাঁহার যোগভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মায়াপ্রভাবে ধ্রুব দেখিলেন যে তাঁহার মাতা সুনীতি অতি কাতরভাবে তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। তাহাতেও ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ হইল না দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পিশাচরূপ ধারণ করিয়া দলে দলে ধ্রুবের সম্মুখে আসিয়া ভীষণ অস্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শৃগাল আসিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই বালকের তপস্যা ভঙ্গ হইল না। তখন ভগবান্ তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ধ্রুব এই যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রথমে একটুখানি রাজসিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু সেটী তাঁহার বাল্যভাব বশতঃ হইয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক বা অহেতুবিশিষ্ট তপস্যার ভাব থাকাতে তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে ভগবান্‌ই সকল ঐশ্বর্য্যের প্রদাতা এবং এইরূপ বুঝিয়া যখন তপস্যার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন ক্রমে রাজসিক ভাব চলিয়া গিয়া একমাত্র সাত্ত্বিক তপস্যার ভাব অর্থাৎ ভগবান্‌কে পাইবার জন্যই ভগবান্‌কে ডাকিবার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রহ্লাদের তপস্যার মধ্যে কেবলই সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হইতে পিতৃসমীপে আনীত হইলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি শিখিয়াছ? তাহার সার ভাগ বল।" প্রহ্লাদ বলিলেন "যাহা শিখিয়াছি তাহার সার এই যে যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অচ্যুত, মহান্ আত্মা, সর্ব্বকারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।" ইহার পর প্রহ্লাদের উপর তাঁহার পিতা কত অত্যাচার করিলেন তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। তথাপি তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার তপস্যার মধ্যে কিছুমাত্র স্বার্থভাব বা রাজসিক ভাব ছিল না। কথিত আছে হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার আজ্ঞাবহ ব্রাহ্মণেরা অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাতে মূর্ত্তিমতী অভিচার ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিয়া বিফলকাম হইল। তখন সে ব্রাহ্মণদিগের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইল। তখন প্রহ্লাদ দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। তিনি ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন "হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। তুমি সকল ভূতে, সর্ব্বব্যাপীরূপে আছ, তাহারই প্রভাবে এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। তুমি সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি —ইহারাও জীবিত হউক! যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল** আমি তাহাদিগকে মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের বলে এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।" তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

প্রহ্লাদের এইরূপ দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে দেখা দিলেন। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল যে, ভগবানের প্রতি তাঁহার যেন অচলা ভক্তি থাকে।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি,তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে তপস্যার প্রকৃত ভাব শরীর, বাক্য ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা। সংসারের মধ্যে থাকিয়া অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা বাছিয়া লইতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া পবিত্র-ভাবে থাকিতে পারিলেই আমাদিগের ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে। তাই ঋষিবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন, "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান-যুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। "জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নিসেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। জ্ঞানরূপ পথই তাঁহার পথ।"

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে তপস্যা বিষয়ক ত্রয়োদশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ বিবৃতি—হিরণ্ময় কোষ।*

[বীরভূমির সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নির্ম্মল প্রভাত কাল, নানারূপ তরুরাজি বিরাজিত সুপ্রশস্ত উদ্যান, শীতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু, সমস্তই ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবার অনুকূল। সর্ব্ব প্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল। মন্দির মধ্যে সুপ্রশস্ত ধূপাধারে সুগন্ধি ধূপ প্রধূমিত হইতে লাগিল। পরে আচার্য্যেরা বেদী গ্রহণ করিলে—]

আজ এই শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির উদার সদাব্রত উপভোগ কর। নগরের জনতায়, সংসারের কোলাহলে শান্তিজলের প্রত্যাশায় বৃথাই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ; এখন এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ, পিপাসার্ত্ত পথিক তুমি, শান্তিজল প্রচুর পরিমাণে পান কর এবং প্রাণ মনকে সুশীতল কর। আজ প্রভাততপনের সুন্দর কিরণে সূর্য্যের অতীত ও সূর্য্যের অন্তর্য্যামী পরম পুরুষকে সন্দর্শন কর; প্রকৃতির গম্ভীর সৌন্দর্য্যে প্রকৃতির অতীত ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পরম পুরুষকে সন্দর্শন কর এবং এই উৎসবের আনন্দকোলাহলে সেই আত্মার অন্তরাত্মা আনন্দময় পরমাত্মাকে সন্দর্শন কর।

কেবল প্রকৃতির মধ্যে, বহির্জ্জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে আমাদের পিপাসার শান্তি হইবে না। কেবল বহির্জ্জগতে তাঁহাকে দেখিতে অভ্যাস করিলে ফল এই হইবে যে, যেখানে প্রকৃতির

---

* ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, ৭ পৌষ দিবসে বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন আশ্রমের চতুর্থ বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বিবৃত।

সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির এক মহান্ উদার ভাব দেখিতে পাইব, সেই-খানেই প্রকৃতির নিয়ন্তা সেই অনন্তশক্তি পরম পুরুষকে দেখিতে পাইব। কিন্তু অন্তর্জ্জগতে তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, আত্মার আত্মা রূপে দেখিতে অভ্যাস করিলে ফল এই হইবে যে, যেখানেই থাকিনা কেন এবং যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন—রোগের মধ্যে, আরোগ্যের মধ্যে, সুখের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, সম্পদের মধ্যে, বিপদের মধ্যে—সকল স্থানে এবং সকল অবস্থাতেই সেই শান্তিদাতা, জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণপতিকে দেখিতে থাকিব। অন্যত্র তাঁহাকে দেখা দূর করিয়া দেখা এবং আত্মাতে তাঁহাকে দেখা নিকট করিয়া দেখা এবং তাহাই প্রকৃষ্ট দর্শন। অতএব আত্মাতেই তাঁহাকে বিশেষরূপে দেখিতে চেষ্টা কর।

পরমাত্মা যেমন এই অসীম আকাশের মধ্যে মহতো মহীয়ান্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেইরূপ এই শরীরমধ্যস্থিত আত্মার মধ্যেও অণোরণীয়ান্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই আত্মাই সেই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের জ্ঞানের ছায়া আমরা আত্মার জ্ঞানে দেখিতে পাই, তাঁহার মঙ্গল ভাবের ছায়া, তাঁহার প্রেমের ছায়া সকলই আমরা আত্মাতেই প্রতিবিম্বিত দেখি। কিন্তু আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব; আমরা ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপ ধারণ করিতে পারি না। আমাদের আত্মাতে তাঁহার যতটুকু প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং আত্মজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আত্মজ্ঞান যত উজ্জ্বল হইবে, পরমাত্মজ্ঞানও ততই পরিস্ফুট হইবে। আত্মজ্ঞানই পর-মাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার একই মাত্র উপায়। এই কারণে ঋষিরা আত্মাকে পরমাত্মার "হিরণ্ময় কোষ" বলিয়াছেন।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

সূর্য্য যেমন জগৎকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাতে যে সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য সকল নিহিত আছে, তাহা যেমন পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্য সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্বও প্রকাশ করে। সহজ-জ্ঞান-বলেই আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। আত্মার সহজ জ্ঞানের প্রতি আমাদের সংশয় উপস্থিত হইলে কেবল আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। ভারতের উন্নতমনা ঋষিরা তাঁহাদের পরিপুষ্ট সহজজ্ঞানে ব্রহ্মকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া জগত দেখিয়া আপ্তকাম হইতেন। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকগণ, জড় জগত হইতে ক্রমে ব্রহ্ম-কেন্দ্রে পৌঁছিতে গিয়া অনেক সময়ে সহজজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ হৃদয়ে জড়জগতেই ফিরিয়া আইসেন এবং আত্ম-তত্ত্বে সংশয়পূর্ণ হয়েন। জড়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য সহজ-জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহা তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন, কিন্তু আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সত্য প্রকাশ করে, তাহা তাঁহারা সহজে গ্রহণ করেন না।

সহজজ্ঞানের বলেই আমরা আমাদের "আমিত্বে" নিঃসংশয় হই। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্য্য করিতেছি, কিন্তু "আমি" যে এই সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় না। তথাপি সহজজ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি যে আমার কৃত কার্য্য 'আমি'ই করিতেছি।

এই "আমি" বা আত্মা নিরবয়ব এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যেমন বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি আত্মার জ্ঞান লাভের দ্বারমাত্র কিন্তু তাহারা আত্মা নহে, সেইরূপ শরীরের বিভিন্ন অংশ আত্মার জ্ঞানলাভের বিভিন্ন দ্বারস্বরূপ মাত্র ; আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। এই কারণে শরীরের এক অংশ বিনষ্ট হইলে বা শরীরে নূতন পরমাণু সংযুক্ত হইলে, যাহা প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, আমিত্ব-জ্ঞানের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কেবল তাহাই নহে। আমার চিন্তা, জ্ঞান প্রভৃতি কার্য্য বিশেষরূপে জানিতেছি এবং জানিতে পারি কিন্তু সেই সকল কার্য্যের একটী শারীরিক দ্বার যে মস্তিষ্ক, তাহার বিষয় অপরের মুখে না শুনিলে কিছুই জানিতেছি না এবং চেষ্টা করিলেও জানিতে পারি না। সুতরাং কেমন স্পষ্ট দেখিতেছি যে আমি এবং আমার শরীর কত বিভিন্ন। আত্মা বিষয়ী এবং জগতে যাহা কিছু এই বিষয়ীর সম্মুখে প্রতিভাসিত হইতেছে, সে সকলই তাহার বিষয়। প্রতিদিন যে অগণ্য অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আকাশে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে ; যদি কখনো ইহা দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার বিষয়ী প্রাণী না থাকে, তাহা হইলেও ইহা ঘটিতে থাকিবে এরূপ কল্পনা করিতে পারি—ইহা তখন জড় জগতের ঘটনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে ; কিন্তু যদি এই ঘটনাগুলি বিষয়ীভূত বা প্রতি-ভাসিত হয়, তাহা হইলেই জানিলাম যে সেই সকল প্রতিভাস দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার একজন বিষয়ীও আছে। আমাদের অন্তর্জগতের কার্য্যও এমন যে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী বিষয় মাত্র—জড় জগতের ঘটনা নহে, এবং আত্মাই সেই সকলের বিষয়ী এবং সুতরাং পরোক্ষভাবে বহির্জগতেরও সকল কার্য্যেরই আত্মাই বিষয়ী। তাই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত পিপ্পলাদ ঋষি বলিয়াছেন "এবহি

দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।”

আমাদের এই আত্মা সদ্‌বস্তু এবং অবিনশ্বর; প্রতিভাস বা প্রতিভাসিত বিষয় সকল সদ্‌বস্তুর বিপরীত এবং ক্ষণস্থায়ী। সহজ-জ্ঞান হইতেই আমরা এই জ্ঞানলাভ করিতেছি। অদ্যকার যে আমি, কল্যকারও সেই আমি; দশ বৎসর পূর্ব্বেও যে আমি, দশ বৎসর পরেও সেই আমি। এই আমি দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বা প্রতিভাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বিলুপ্ত বা আমিত্ব-বিহীন হয় না। সুতরাং এই দেহ বিনষ্ট হইলেই যে আমিও বিনষ্ট হইব, তাহারই বা সম্ভাবনা কি, বরঞ্চ অসম্ভাবনাই আছে। যেমন জানি যে, এখন যে আমি আছি, দশ বৎসর পরেও সেই আমি থাকিব, তেমনই ইহাও জানি যে ইহলোকে যে আমি আছি, মৃত্যুর পরপারে লোক-লোকান্তরেও সেই আমিই থাকিব।

ইচ্ছাশক্তির বিষয়ে একটু আলোচনা কর, কেমন সহজেই বুঝিতে পারিবে যে আত্মা অবিনশ্বর। এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই না কিন্তু আত্মা হইতেই তাহা প্রসূত হয়। এই শক্তি একটী মহান্ আধ্যাত্মিক শক্তি। কামনার উদয়ে তাহা নিবারণ করিতে গিয়া যিনিই এই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তিনিই জানেন যে এই শক্তি প্রকৃতই এক মহান শক্তি এবং এই ইচ্ছা-শক্তিরই বল কামনা সকল নিবারণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে জাগতিক কোন শক্তিই বিনষ্ট হইতে পারে না —তবে আমরাও বলিতে পারি যে এই ইচ্ছাশক্তিরও কোন কালেই বিনাশ নাই; সুতরাং সেই অবিনশ্বর ইচ্ছাশক্তি যে আত্মা হইতে

প্রসূত হয় সেই আত্মা কিছুতেই বিনশ্বর হইতে পারে না—সর্ব্বতো-ভাবেই অবিনশ্বর।

আজ এই উৎসবের দিনে আমি ভাবের উদ্দীপক কথা সকল না বলিয়া এই আত্মজ্ঞানের দার্শনিক কথা সকল বলিতে কেন প্রবৃত্ত হইলাম? ভাব চিরস্থায়ী হয় না; জ্ঞান সত্যবস্তু—ইহা এক-বার অন্তরে প্রবেশ করিলে সহজে পরিত্যাগ করে না। এই কার-ণেই আমি আত্মা সম্বন্ধীয় দুই চারিটী কথা বলিলাম।

বর্ত্তমানে যুবকেরা একদিকে নাস্তিকতার পক্ষপাতী বৈজ্ঞানিক-দিগের সুরচিত মনোরঞ্জক বিষয় সকল পাঠ করেন, অপরদিকে তাঁহারা কি গৃহে পিতামাতার নিকট, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের নিকট, কোথাও ধর্ম্মবিষয়ে হৃদয়গ্রাহী সত্য উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন না; এই সকল কারণে তাঁহারা বৈজ্ঞানিকদিগের নাস্তিকতার পক্ষ-পাতী কথা সকল নির্ব্বিচারে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন এবং পরি-ণামে তাহার বিষময় ফলভোগ করেন। এই পুণ্যস্থান ভারতভূমি সত্যধর্ম্মের, অধ্যাত্মধর্ম্মের আদিজননী এবং এই কারণে ইহার যশোগীত সমস্ত সুসভ্য জগতে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, আজ সেই ভারতের সন্তানগণ কথায় কথায় ধর্ম্মকে উপহাস করেন, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন এবং নাস্তিবাদের গুরু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথাকে অভ্রান্ত বেদ-বাক্য ও তাঁহাদিগকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই অধর্ম্মভাবের গতিরোধ করা যদি আবশ্যক হয়, তবে সকলে আত্মজ্ঞানপরায়ণ হউন, গৃহে পিতামাতা ব্রহ্মমহিমা শ্রবণ করাইতে থাকুন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সুনীতি শিক্ষা দিতে থাকুন; সক-

লের সমবেত চেষ্টায় এবং ঈশ্বরের কৃপায় অধর্ম্মভাবকে দূর করিতে কি সময় লাগে? বিলাতে ছাত্রগণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন; আমাদের দেশেও তীর্থপর্য্যটন সাধুতার একটী লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু আজকাল তীর্থপর্য্যটন অনেক সময়ে অসাধুতার লক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়, কারণ অধিকাংশ তীর্থই দুর্নীতি ও দুরাচারের আধার হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় আমরা যদি সময়ে সময়ে এই শান্তিনিকেতনের কোন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে আসিয়া ধ্যানপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদের অন্তরে অতি সহজে আত্মতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় সত্য প্রকাশিত হইবে। যখন আমরা আত্মা হইতে চক্ষু তুলিয়া এই মুক্ত সুবিশাল আকাশের দিকে চাহিব তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে

যশ্চাসাবাদিত্যে যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি স একঃ।

যিনি ঐ গগনমধ্যবর্ত্তী সূর্য্যে আছেন এবং যিনি এই শরীরপিঞ্জরস্থ আত্মাতে আছেন তিনি একই পরমেশ্বর।

তখন আমরা সকল জীবাত্মার, সকল জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিব—

সএবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি উত্তরে, তিনি দক্ষিণে; তিনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা, তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন।

তাই বলি হে প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ! আজ যখন এই শুভদিনে, এই পবিত্রক্ষণে, এই অতি রমণীয় স্থানে সমাগত হইতে পারিয়াছি, তখন যেন এই শুভ অবসরকে বৃথা নষ্ট করিয়া না দিই। হৃদয়ের

দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও, ব্যাকুল অন্তরে সেই প্রিয়তম সখাকে আহ্বান কর—তবেই তোমরা তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইবে। ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে ডাকিতে না পারিলে, তাঁহার জন্য প্রাণের বাস্তবিক পিপাসা না থাকিলে যতই কেন সুন্দর স্থানে গমন কর, যতই কেন বিদ্যা শিক্ষা কর, কিছুতেই তাঁহার দর্শন পাইবে না—যেমন শূন্য হৃদয়ে যাইবে, তেমনি শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া আসিবে। আর তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যদি পিপাসা থাকে, তবে সজন লোকালয়েই থাক, আর বিজন অরণ্যের মধ্যেই বাস কর, তাঁহার দেখা পাইবেই পাইবে; তখন তোমাদের মুখশ্রী আর এক সুন্দর ভাব ধারণ করিবে; পাপ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস করিবে না। সেই প্রাণের প্রাণকে একবার দেখিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানিবার প্রয়োজন বোধ হইবে না—

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই; তাঁহাকে জানিলে সকল জানার পরিসমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই।

হে ভ্রাতৃগণ! আইস আমরা সকলে এই মহান্ মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করি—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতে-ছেন; এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন,

সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে হিরণ্ময় কোষ বিষয়ক চতুর্দ্দশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

পঞ্চদশ বিবৃতি—অধ্যাত্মযোগ।*

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

[উদ্বোধনান্তে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে—]

এই পবিত্র শান্তিনিকেতনে আসিয়া হৃদয়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহা একমুখে কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? এখানে নগরের কোলাহলরাশি পৌঁছিতে পারে না। নগরের বিবাদকলহ এই পবিত্র স্থানকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। এখানে যে দিকে চাহি, ঈশ্বরের সদাব্রত উন্মুক্ত দেখিতে পাই। প্রভাতের সুমন্দ পবনহিল্লোল সেই দেবাধিদেবের গাত্রের সুগন্ধ বহন করিয়া আমাদিগকে আকুল করিতেছে, প্রভাতসূর্য্যের কনকচ্ছটা তাঁহারই বিমল জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। এই অসীম আকাশে তাঁহারই আভাস মাত্র ব্যক্ত করিতেছে। তাঁহারই মঙ্গল

---

* বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৭ শক, ৬৬ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭ পৌষ দিবসে প্রাতঃকালে বিবৃত।

ইচ্ছাতে "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রান্তরে।" তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছাতে দস্যু রত্নাকর মুনি বাল্মীকি হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে এই ভীষণ প্রান্তর দস্যুদিগের প্রিয় আবাস স্থান হইতে ভক্তজনের প্রিয় তপোবনে পরিণত হইয়াছে। যাঁহার উদার সদাব্রতে আমরা মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি লালিত পালিত হইয়া সংসারের শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ তাঁহারই চরণ-তলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি এবং যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় যেমন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জগতের প্রতি অংশে দেখিতে পাই, তেমনি চক্ষু নিমীলিত করিয়াও যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় আত্মার প্রত্যেক ভাবে, প্রত্যেক চিন্তায় দেখিতে পাই, তাঁহারই প্রতি আমাদের হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিতে আজ এই পবিত্র স্থানে আমরা সমাগত হইয়াছি। আজ আমরা এই শুভ মুহূর্ত্তে এই পবিত্র স্থানে বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সেই পরম করুণাময়ী মাতার প্রেমময় পিতার নাম কীর্ত্তন করিবার অবসর পাইয়াছি, ইহাতে কি হৃদয়ে আনন্দ ধারণ হয়? কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর তাঁহার উপযুক্ত গুণ কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্য কোথায়? আমরা সংসারের পাপতাপে দগ্ধপ্রায়; আমরা নূতন করিয়া, হৃদয়গ্রাহীরূপে তাঁহার গুণগান করিব, সে শক্তি কোথায়? তবে সেই শক্তিসামর্থ্য এখনও পাই নাই বলিয়া আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি হইতে অহর্নিশি এক মহান্ উদার সঙ্গীত সেই দেবাধিদেব মহাদেবের চরণতলে উত্থিত হইতেছে, আমরা যদি জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে সেই সঙ্গীত শুনিবার চেষ্টা করি এবং শুনিয়া তাহাতে যোগদান করি, তাহা হইলেই ক্রমে শক্তিসামর্থ্য আসিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই

সঙ্গীত যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার হর্ষশোক থাকে না; সুখদুঃখ, লাভালাভ সকলই তাঁহার নিকটে সাম্য ধারণ করে, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই ঋষি।

ঋষিরা প্রকৃতির সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, সংসারের মায়া মমতা দূরে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত যখন যোগদান করিতেন, সেই অবস্থায় তাঁহাদের হৃদয় হইতে যে অতুলনীয় উজ্জ্বল বাক্যরত্ন সকল উত্থিত হইয়াছে, সেগুলি অত্যন্ত সত্য বলিয়া যে প্রভা দ্বারা প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ঋষিদিগের মন হরণ করিয়াছিল, বহু শতাব্দী পরে আজিও তেমনই প্রভা বিস্তার করিয়া আমাদের জ্ঞান উজ্জ্বল করিতেছে, কিন্তু আমরা আজও তাহার সকলগুলি ধারণা করিতে পারি নাই। সেই সকল বাক্যের প্রত্যেকটীর অর্থালোচনা করিতে গেলে আমাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে কতটুকুই বা জানিতে পারিব, এবং কতটা আমাদের অজ্ঞেয় থাকিবে! আর যেটুকু জানিতে পারিব তাহার জন্য রীতিমত অধ্যাত্মযোগ অধিগত করা চাই—অধ্যাত্মযোগ বিনা ধর্ম্মরাজ্যে আমরা অতি নিম্নস্থানই অধিকার করিতে পারিব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই গভীর তত্ত্বটী কেমন স্বল্প ও সারবান্ উপনিষদ-বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন—

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন এবং নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।

সেই দেবদেব ভুবনরাজ এই শোভনসুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে দূরে পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন; এমন কি, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে যেমন অগ্নি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, তেমনি তিনি এই বিশ্বজগতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, একটী বিন্দুও তাঁহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নহে। বৃক্ষলতা-পুষ্পাদিতে পরিশোভিত উপবনের মধ্যেও তিনি যেমন আছেন, সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্প-সমাকুল পর্ব্বত গহ্বর প্রভৃতি অতি সঙ্কট স্থানেও তেমনই তিনি আছেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এবং তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।

হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকেরও ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীরও অধোতে, যাহা দ্যুলোকে ও ভূলোকে, যাহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ত্রিকালে, তাহা আকাশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এবং সেই আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অভিবাদন করেন।

তিনি এই অবিনাশী পরব্রহ্ম। সকল স্থানেই তিনি আনন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন।

আবার তিনি যেমন বহির্জ্জগতে রাজাধিরাজরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; তেমনি তিনি আমাদের আত্মাতেও আত্মার অন্তরাত্মারূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমাদের পুরাতন পিতামহ। তাঁহার সহিত আমাদের এত নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও আমাদের আপনাদেরই দোষে অনেক সময়েই তিনি আমাদের নিকটে দুর্জ্ঞেয় থাকেন। আমরা যখন

বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকি, যখন ঈশ্বর অপেক্ষা পুত্রবিত্তাদিকে প্রিয়তর বোধ করিয়া সংসারের বিষাস্বাদ অথচ মধুমাখা মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, তখন কি প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিব? সহস্র শাস্ত্রপাঠ করিলেও সে অবস্থায় পরম পিতা পরমেশ্বরকে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিব না। "বিশুদ্ধসত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিরই নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরমদেবতা দগ্ধদারুনিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন।" তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ রিক্তহস্তে শূন্যমনে ফিরিয়া আসে নাই।

"ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে প্রাণমন সঁপিয়ে,
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে।"

এই ব্যাকুলতা হইতেই ব্রহ্মসাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। যখন সংসারের সুখদুঃখের, সম্পদের ও বিপদের অনিত্যতা হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়, তখনই সকলের অতীত সেই নিত্য পুরুষের প্রীতি লাভ করিতে ব্যাকুলতা আসে। কঠোপনিষদে যে সুন্দর নাচিকেত উপাখ্যান আছে, তাহাতে এই ভাবটী সুন্দররূপে ব্যক্ত আছে। নচিকেতা যখন যমদেবের আবাসে গমন করিলেন, তখন যমদেব তাঁহাকে কত ধনরত্ন দিবার প্রলোভন দেখাইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু উৎসাহপূর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ নচিকেতা যমদেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি পার্থিব বিষয়ের ধনরত্নের অনিত্যতা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাহাতে প্রলোভিত হইতে পারেন না। অবশেষে তিনি যমদেবের নিকট তেজের সহিত এই প্রার্থনা করিলেন—

"হে মৃত্যু! মহান মঙ্গলসাধক যে পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে মনুষ্যগণ বিতর্ক করে, আমাকে তুমি তাহারই বিষয় বল। এই যে নিগূঢ় বর, ইহা ভিন্ন নচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করেন না।"

তখন যমদেব তাঁহাকে বলিলেন "শ্রেয় ও প্রেয় দুইটী ভিন্ন পদার্থ; এ উভয়ই পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আবদ্ধ করে, ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

"হে নচিকেতঃ! তুমি কাম্য বিষয় সকলের অনিত্যতা বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ। যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয় এমন যে বিত্তময়ী পদবী তাহা তুমি অবলম্বন কর নাই। * * নচিকেতাকে আমি বিদ্যা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রার্থী মনে করি, কারণ অশেষ কাম্য বিষয় সকল তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।"

এইরূপে যমদেব নচিকেতাকে সত্যনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবিদ্যার জন্য নিতান্তই ব্যাকুলান্তঃকরণ জানিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মও আজি উপনিষদের বাক্যে সেই উপদেশই আমাদিগকে দিতেছেন।

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

ধীর ব্যক্তি আধ্যাত্মযোগ অবলম্বনে সেই দুর্জ্ঞেয়, সকল বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, আত্মস্থিত এবং সঙ্কটস্থানেও অবস্থিত ও নিত্য পরমদেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন।

পরমাত্মাকে যিনি প্রকৃতই আত্মস্থ করিয়া জানিয়াছেন, তিনি যে হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবেন, তাহা

অপেক্ষা কি সত্য কথা আর কিছু আছে? জগতে মঙ্গলকার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিলেই তাঁহার আনন্দ হয় কিন্তু তাঁহার নিজের সম্পদ লাভ হইলে হর্ষে অতিমাত্র উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহার বিপদপাত হইলে তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু তাহাতে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়েন না। সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে তিনি প্রেমময় পরমপিতারই মঙ্গল হস্ত অনুক্ষণ অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহার কিসের ভয়? তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা ইহাই জাগিতে থাকে—

"সম্পদ বিষসম তোমা বিহনে জীবন মৃত্যু সমান;
বিপদ সম্পদ তব পদলাভে মৃত্যু সে অমৃত সোপান।"

মৃত্যুও তাঁহাকে ভয় দেখাইতে পারে না।

এইরূপে "পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। অধ্যাত্মযোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি উপহার দিয়া আনন্দসাগরে লীন হয় এবং বিষয়কামনা-জনিত হর্ষশোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়, ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয়।"

এক সময়ে ভারতে এই অধ্যাত্মযোগের বিশেষ আদর ছিল; সেই সময়ে ভারতের উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এখন ভারতে অধ্যাত্মযোগের আদর চলিয়া গিয়া বাহ্যিক আড়ম্বরের

প্রতিই আদর বাড়িয়াছে; সেই কারণে ভারতের আজ এত অবনতি এত দুর্দ্দশাও ঘটিয়াছে। আমরা আমাদের অন্তরের প্রকৃত বল হারাইয়া কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি। ঈশ্বরকে যত না ভয়ভক্তি করি, লোকাচার ও দেশাচারের নিকট-ততোঽধিক মস্তক অবনত করি। আমাদিগকে একদিকে সংসার আকর্ষণ করিতেছে, অপরদিকে ধর্ম্ম আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এই ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে এস, আমরা পরস্পরকে গীতার এই মহান্ বাক্যে উৎসাহিত করি, যাহাতে ধর্ম্মের জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারি—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

এইরূপ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন করিতে, আইস সকলে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হই। তাহাকে না দেখিয়া আজ যেন কেহই গৃহে ফিরিয়া না যাই; অন্ধকারের মধ্যে আপনার মহামূল্য জীবন যেন বৃথায় না কাটাই! এই জগতে থাকিয়া তাঁহারই মহিমা দর্শন করিব; "যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক" কেবল আমিই যেন একাকী আত্মার আলোক নিভাইয়া বৃথা কালহরণ না করি। আজ এই আনন্দের দিনে সকলেই তাঁহার আহ্বানে আনন্দের সহিত ছুটিয়াছে; আমিই যেন এই সংসারে দুঃখের বিষময় নিশ্বাস পরিত্যাগ না করি।

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছ; আমাদিগের নিজেদের সাধ্য কি যে তোমার অনুপম মহিমা বর্ণনা করি। তুমি আমাদের রসনাগ্রে আবির্ভূত হও, তুমি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান কর, তোমার নামগানের জন্য তেজোময়

বাক্যরাশি আপনিই অনর্গল নির্গত হইবে। তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কিছুই চাহি না, তোমাকে দিয়াই আমাদিগের এই তাপদগ্ধ জীবনকে শীতল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে অধ্যাত্মযোগ বিষয়ক পঞ্চদশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

ষোড়শ বিবৃতি—অমৃতসেতু।*

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃসহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার।

আমরা যদি সেই আদিকালের বিষয় অনুধ্যান করি, যখন দিক্ দেশ ছিল না, যখন কাল ছিল না, তখন কি দেখিতে পাই—কেবলি অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার; এখনকার কোন প্রকার অন্ধকারের সহিত সে অন্ধকারের তুলনাই হয় না। তখন দিবসে সূর্য্য উদিত হইয়া জগতকে আলোকিত করিত না; রাত্রিতে চন্দ্রমা উদিত হইয়া সুধাধারা বর্ষণ করিত না; গ্রহনক্ষত্র আকাশকে হীরকখচিত করিত না-বাহিরে জ্যোতির কণিকাও ছিল না—কেবলি এক দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, প্রলয়ের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।

* ১৮১৭ শক, ১লা বৈশাখে শুভ নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতঃকালে দ্বারকানাথ ভবনে বিবৃত।

"নাছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।"
সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে কেবল এক মহাজ্যোতি ধ্রুব-জ্যোতি পুরুষ ওতপ্রোত হইয়া বর্ত্তমান ছিলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের ইচ্ছা হইল, আর তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ অন্ধকারও ভেদ করিয়া জ্যোতি নির্গত হইল।

"ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি।"
কবির এই হৃদয়বিনিঃসৃত সত্য আজ বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে। আদিদেবের ইচ্ছা হইল আর তাঁহার জ্যোতির কণিকা মাত্র লইয়া সূর্য্য প্রকাশিত হইল। তাঁহারই জ্যোতিকণা লইয়া চন্দ্র তারা গ্রহ উপগ্রহ সকলেই প্রকাশ পাইল। আমরা দেখিতেছি এক সূর্য্য, কিন্তু এমন সূর্য্য এবং ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর সূর্য্য কতশত সহস্র কোটী কোটী আছে, এই অসীম আকাশকে জ্যোতিষ্মান্ করিবার জন্য যে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কত কোটী সূর্য্যদীপকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা কে কবে নিঃশেষে গণনা করিতে পারিবে?

যেদিন সেই প্রথম আলোকের অভ্যুদয় হইল, সেদিন কি আশ্চর্য্য দিন—হৃদয় ভাবিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, বর্ণনা করিতে গিয়া রসনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। যদি জগতের প্রাণ থাকিত, তবে সে কি আশ্চর্য্য ভাবেই তাহা নিরীক্ষণ করিত। জগতেরও যখন উৎপত্তি হয় নাই তখন একমাত্র সেই ইচ্ছাময় পরমাত্মাই জানিতে লাগিলেন যে, অন্ধকার ছিল, আলোক হইল এবং সেই সঙ্গে তিনি আপনাকেও প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মরূপে চিরবর্ত্তমান জানিতে লাগিলেন।

তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।

সেই যেমন জগতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য দিন চলিয়া

গিয়াছে, সেইরূপ আরও একটী আশ্চর্য্যের দিন চলিয়া গিয়াছে—যেদিন জগতে আদি মানবের জন্ম হইল, যেদিন এই জগত পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটী আত্মা বিসৃষ্ট হইল। কি নবীন-ভাবে বিস্ফারিত নেত্রে সেই আদিমানব বিচিত্র জগত দেখিয়াছিল। কেবল অগণ্য অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র যে নিয়মিতরূপে প্রকাশ হইয়া সেই আদিদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে তাহা নহে, কেবল যে সেই আদিমানব নূতন আলোকে নূতন ভাবে জাগ্রত হইয়া তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করিয়াছিল তাহা নহে; আজও অসংখ্য মানব অসংখ্য জীবাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহিমা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

মনুষ্য যতই কেন নূতন বস্তু রচনা করুক, কিছু দিন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলেই তাহা ফিরিয়া দেখিতেও অনেক সময়ে অরুচি-কর হইয়া উঠে। মনুষ্যহস্তের গঠিত রচনাতে চিরনূতনত্ব থাকে না—পুরাতন হইলেই তাহা পরিত্যাগ করিতে মনুষ্যের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি—প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইতেছে, কিন্তু প্রতিদিন মানবহৃদয়ে নূতন ভাব জাগ্রত করিয়া তাহা উদয় হইতেছে। নদী সকল একই ভাবে চির-কাল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু এমন কোন্ হৃদয়হীন মানব আছে যাহার হৃদয় তটিনীপ্রবাহের সঙ্গে অনন্তের দিকে ধাবিত না হয়? প্রতিদিন একই ভাবে সুনীল আকাশকে নক্ষত্রখচিত দেখি, কিন্তু প্রতিদিনই ইহাতে ভাবের কত নূতন রাজ্য আবির্ভূত দেখিতে পাই। প্রতি পূর্ণিমায় ধরণী জ্যোৎস্নার রজতরঞ্জনে রঞ্জিত হয় কিন্তু প্রতিবারেই ইহাতে ভাবের কত নূতন কথা শুনিতে পাই।

আমাদের কাছে মহান্ অট্টালিকা পুরাতন হইতে পারে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সূক্ষ্মতম শিল্প কার্য্যও পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু পুষ্পের সুগন্ধ, মলয় বায়ুর স্নিগ্ধতা, সাধু হৃদয়ের পবিত্র ভাব, এই সকল ঈশ্বরের সৃষ্টি কখনো পুরাতন হয় না—ঈশ্বরের রচনা চিরনূতনভাবে চিরবর্ত্তমান।

ঈশ্বরের এই সকল সৃষ্টি দেখিয়া কেবল মানব কেন, লোক-লোকান্তরবাসী দেবতারাও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই—সেই দেবদেব আদিদেবকেই—উপাসনা করিয়া থাকেন।

যস্মাদর্ব্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ু-র্হোপাসতেঽমৃতং।

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিয়া থাকেন।

যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন,তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমাদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে।

মর্ত্ত্য জীব এবং দেবলোকের অমর দেবগণ যাঁহা হইতে উৎ-পন্ন হইয়াছেন, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত রহিয়াছেন এবং যাঁহাকে নিয়ত উপাসনা করিতেছেন, তিনি অমৃত, তিনি আয়ুর কারণ। বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎ-পত্তি হইতে পারে না। এখন, সমুদ্রের অন্তস্তলে নিম্নতম স্তরে উপস্থিত হও, সেখানেও দেখিবে প্রাণ বিচিত্ররূপে ক্রীড়া করিতেছে; পর্ব্বতের উপরিভাগে তুষারমণ্ডিত শিখরাগ্রে যাও, সেখানেও দেখিবে প্রাণ সমস্ত ছাইয়া রহিয়াছে; বায়ুসমুদ্রের প্রত্যেক বিন্দু

পরীক্ষা কর, তাহাও প্রাণপরিপূর্ণ; পৃথিবীতে এমন স্থান কি আছে,যেখানে প্রাণের বিচিত্র লীলা দেখা যায় না? "প্রাণস্য প্রাণং" সেই মহাপ্রাণ ব্যতীত আর কে এই মরণশীল সংসারকে জীবনের আধার করিতে পারেন? তাঁহার ব্যতীত আর কাহার ইচ্ছায় এই প্রাণ সকল বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র ভাবে জগতের প্রতি রেণুতে নৃত্য করিতেছে?

সেই আদিকারণ মহাপ্রাণ কেবল দেহের প্রাণহেতু নহে, তিনি আমাদের হৃদয়েরও প্রাণহেতু এবং আমাদের আত্মারও প্রাণহেতু। আমরা যে অপরের নিকট হইতে কত প্রীতিলাভ করিতেছি, অপরে যে আমাদের নিকট কত প্রীতিলাভ করিতেছে; পিতা মাতা যে স্বীয় প্রাণ দিয়াও সন্তানকে রক্ষা করিতেছেন, সন্তান যে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করিতেছে, এই সকল দেবস্পৃহনীয় ভাব যদি সেই প্রীতির মূল উৎস, যিনি আনন্দরূপমমৃতং' তাঁহা হইতে না পাই, তবে আর কে ইহা হৃদয়ে প্রেরণ করিতে পারে? আমরা যে এলোকে থাকিয়া দ্যুলোকের কত সংবাদ রাখিতেছি; কোথায় কোন্ গ্রহ রচিত হইতেছে, কোন্ গ্রহ কোন্ সময়ে কোথায় আসিবে; আলোক প্রতিমুহূর্ত্তে কত লক্ষ যোজন পরিভ্রমণ করিয়া আমাদের নয়নগোচর হইতেছে; কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্র কি কি উপাদানে নির্ম্মিত, এই সকল বিষয়ে এখানে বসিয়াই জানিতেছি। কি আশ্চর্য্য সেই আদিজ্ঞান মহাজ্ঞান, যিনি এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে একবিন্দু আত্মা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে এত আশ্চর্য্য জ্ঞানের অধিকারী, এত বলশালী করিয়া দিয়াছেন।

এই কারণের কারণ আদিকারণ, এই প্রাণের প্রাণ আদিপ্রাণ

পরমেশ্বর, এই প্রেমের মঙ্গলভাবের অনন্ত উৎস, এই জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, অমৃতস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, এই অমৃতপুরুষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন—ইহা কেবল কথার কথা নহে, ইহা আত্মাতে অনুভব করিবার জিনিষ—আজ এই আনন্দোৎসবের মধ্যে ইহা কেমন সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। যখন এই অমৃতদাতা পরমপুরুষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই অছেন তখন আমাদের কিসের ভয়—রোগে ভয় নাই, শোকে ভয় নাই, মৃত্যুতেও কিছুমাত্র ভয় নাই—অমৃতপুরুষের সহবাস যদি একটী বারও লাভ করি, তবে ভীষণ মৃত্যুও আমাদের কাছে অমৃত-সোপান। তাঁহাতেই যখন সকলই প্রতিষ্ঠিত, তিনি যখন আমা-দের পিতা মাতা ও সুহৃৎ, আবার তিনিই যখন অমৃতের সেতু, তখন আমাদের কাছে মৃত্যুর বিভীষিকা কোথায়?

"তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় হে তার;
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে নিত্য অমৃতরস
পায় হে।"

ঈশ্বর আমাদিগকে যত প্রীতি করেন, এত প্রেম যখন অন্য কেহ দিতে পারে না, তিনি আমাদের মঙ্গল যত বুঝেন, এত মঙ্গল যখন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, তখন আমরা কি সেই মঙ্গলময় পিতা স্নেহময়ী মাতার উপরে এতটুকু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না যে, ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, আমরা তাঁহারই মঙ্গল-ক্রোড়ের শীতল ছায়ায় বাস করিব? আমরা সকল সময় তাঁহার উপর নির্ভর করি না, তাই মৃত্যুকে ভীষণ বোধ করিয়া কাতর হইয়া পড়ি; ইহ-জীবনকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া সংসারের মোহে

এতদূর নিমগ্ন হই যে পরজীবনের কথা ভাবিতে গেলেই আকুল হইয়া পড়ি।

আজ বৎসরের প্রথম দিবস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যদি না-ও করিয়া থাকি, অন্ততঃ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য আজ আইস, ঈশ্বরের চরণে এই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করি। এস, আমরা চেষ্টা করি, যাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারই কার্য্যে জীবন ক্ষেপণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর, ইনি অমৃতের সেতু।

ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্য করিবে না, সম্যকরূপে ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে; তবে পাপ তাপ মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতুস্বরূপ।

আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। আজ আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে গতকল্য পর্য্যন্ত আমরা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছি এবং আজ হইতে কতদূর উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি অতি সামান্য; কিন্তু সম্মুখে উন্নতির রাজ্য অসীম অনন্ত—এ পৃথিবী তাহার সীমা দেখাইতে পারে না, কোটী কোটী লোক তাহার সীমা দেখাইতে পারিবে না। আমাদিগকে এই অনন্ত উন্নতির স্রোতে ভাসিতে হইবে--ইহাতেই আমাদের জীবন, ইহাতেই আমাদের আনন্দ।

এস, এতদিন যদি এই অনন্ত উন্নতির পথে আপনাকে না চালাইয়া থাকি, তবে আজ হইতেই চালাইতে প্রবৃত্ত হই। আর যেন দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিয়া কাল হরণ না করি যে, আগামী বৎসর হইতে কি আগামী মাস হইতে, কি আগামী কল্য হইতে আপনাকে উন্নত করিব। সংসারের পথে স্থিরভাবে দাঁড়াইবার উপায় নাই —হয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, অথবা অবনতির পথে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। হৃদয়ে এইটী স্থির জানিয়া, সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়, ঈশ্বরের জয় জানিয়া, এস অবিলম্বে উন্নতির পথ অবলম্বন করি, অবনতি পশ্চাতে পড়িয়া থাকৃ। উন্নতিই জীবন, অবনতিই মৃত্যু; এস জীবনকেই অবলম্বন করি, মৃত্যুকে দূরে পরিত্যাগ করি। অমৃতপুরুষের অমৃতধামে মৃত্যুতে ভয় নাই—মৃত্যুতে ভয় নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে অমৃতসেতু বিষয়ক ষোড়শ
বিবৃতি সমাপ্ত।

সপ্তদশ বিবৃতি—ব্রহ্মতীর্থ।*

এই শান্তিনিকেতন যথার্থই শান্তির আবাসভূমি। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই প্রকৃতির গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি। এখানে সংসারের কোলাহল নাই, কর্ম্মের উন্মত্ততা নাই, শোকের আর্ত্তস্বর নাই, রোগের কাতর ধ্বনি নাই। এখানে কেবল শান্তি—শান্তি। এই শান্তিনিকেতনে বাস করিলে অধিবাসী মাত্রেরই চক্ষু সেই শান্তিসমুদ্র পরব্রহ্মের দিকে ধাবিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এখানে যখন মস্তকের উপরে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র স্থিরনেত্রে আমাদিগের প্রতি চাহিয়া আমাদিগের চক্ষুকে সেই জীবনের ধ্রুবতারা পরমেশ্বরের দিকে লইয়া যায়; যখন এই দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর হৃদয়কে সেই অনন্তস্বরূপ মহান্ পুরুষের প্রতি লইয়া যায়, তখন আর কি মৃত্যুময় সংসারের কোন কথা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে? সেই সকল কথা এখানে মনে করিতেও যেন সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয় কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্মধ্যানে আপনাকে পূর্ণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। এইরূপ শান্তিময় স্থানে আসিলেই আমরা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারি যে—"যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে; ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।"

ব্রাহ্মেরা যাহাতে এইরূপ তপঃক্ষেত্র নির্জ্জন পবিত্র আশ্রমে

---

* বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের মঠপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮১৩ শক, ৭ই পৌষ দিবসে প্রাতঃকালে বিবৃত।

থাকিয়া ধ্যানধারণার দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি আপনাদিগের আত্মাকে স্থির রাখিতে অভ্যাস করেন, যাহাতেতাঁহারা সংসার-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারি জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই আশ্রম এখন অবধি ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মোপাসক সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই তীর্থস্থান হইতে চলিল।

যে স্থানেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানই আমাদিগের তীর্থস্থান বটে, কিন্তু এই শান্তিনিকেতন আমাদিগের বিশেষরূপ তীর্থ—ইহা আমাদিগের প্রত্যেককে, সংসারাতীত পরব্রহ্মে আনিবার, ব্রহ্মসাধন করাইবার এক উপযুক্ত সুন্দর আশ্রম। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করিবার স্থান; শান্তিনিকেতন আমাদিগের ব্রহ্মসাধন করিবার স্থান।

ইহা আরও এক কারণে আমাদিগের তীর্থস্থান। ইহা পূজ্যপাদ মহর্ষির তপঃক্ষেত্র ছিল। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না; আমাদের দেশে, এই ধর্ম্মপ্রধান ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সাধু পুরুষগণ ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, সেই স্থানই তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ এই শান্তিনিকেতনের নির্জ্জনতার মধ্যে কত বৎসর বাস করিয়া আমার পিতামহদেব ব্রহ্মসাধন করিয়াছিলেন, তাই ইহা ব্রহ্মোপাসকদিগের তীর্থস্থান হইবে, আশা হয়। হরিদ্বার, কাশী, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান এখন আর আমাদিগের তীর্থস্থান বলিয়া মনে হয় না—সেই সকল স্থান মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি নানা পৌত্তলিক ভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমাদিগের বাহ্যাড়ম্বররহিত ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য, নির্জ্জনে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ-

সাধন করিবার জন্য একটী ব্রহ্মতীর্থ স্থানের অভাব ছিল; এখন হইতে সেই অভাব ঘুচিয়া গেল।

এই ব্রহ্মতীর্থ সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য আছে। তাহা কি, না ইহার অসাম্প্রদায়িকতা। এই যে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করা হইল, এই প্রতিষ্ঠাপত্র হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে উদারতা, অসাম্প্রদায়িকভাব যত দূর পারা যায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে জাতি, বর্ণ, অবস্থানির্ব্বিশেষে সকল লোকেই এখানে আসিয়া ব্রহ্মসাধন করিতে পারিবেন। এই ব্রহ্মতীর্থ সম্বন্ধে কোন জাতির অথবা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আপত্তি করিবার কথা নাই। ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা কর দেখিবে যে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মকে ভগবান্, সকলের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া পরে সাম্প্রদায়িক দেবতার পূজা করে। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্ম আছে, সেই জাতি ঈশ্বরকে সকল দেবতার অধিদেবতা স্বীকার করিয়া পরিমিত দেবতার পূজা করে। সুতরাং ব্রহ্মতীর্থে আসিবার বিরুদ্ধে আপত্তি কোন জাতিবিশেষ বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষেই সম্ভবে না। ব্রহ্মই আমাদিগের একই পিতা; আমরা সকলেই সন্তান। তাঁহার চক্ষে বিজাতীয় স্বজাতীয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেই সমান; তিনি সকলের প্রতি সমান স্নেহদৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই ব্রহ্মতীর্থেও সকল জাতির, সকল বর্ণের, সকল অবস্থার লোকেরই সমান অধিকার। এখন আমাদিগের উচিত যে, আমরা মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে আসিয়া তীর্থদর্শনের ফল লাভ করিয়া সংসারে প্রতিগমন করি। শাস্ত্রকারগণ তীর্থদর্শনের ফল অতি মহান্ অতি উচ্চ বলিয়া বলিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে আমরা এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমেশ্বরের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন, তিনি সুপ্রসন্ন থাকুন।

হংসা শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সদেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মতীর্থ বিষয়ক সপ্তদশ বিবৃতি সমাপ্ত।

অষ্টাদশ বিবৃতি—তদুনাত্যেতি কশ্চন।*

[প্রাতঃকালে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। তখন আমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া "অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি" এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। সুপ্রশস্ত মাঠ, সিন্দুররাগরক্ত সূর্য্য, নির্ম্মল সুশীতল বায়ু, মন্দিরের সম্মুখস্থ এক একটী অঞ্জলিপ্রমাণ সুগন্ধি গোলাপ পুষ্প, উদ্যানস্থিত পক্ষীদিগের কোলাহল, সমস্ত মিলিয়া মন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। অনন্তর—]

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড যখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এই শোভনসুন্দর জগতের চিহ্নমাত্র যখন ছিল না, তখন সেই বিশ্বাধিপতি জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত পুরুষেরই ইচ্ছাতে কোটী কোটী সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বভুবনকে আলোকিত করিয়া

* বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসবে ১৮১৮ শক, ৬৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭ই পৌষ প্রাতঃকালে বিবৃত।

তুলিয়াছিল। "নাছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি; ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।" আজ সেই জাগ্রত দেবতা এই প্রান্তরমধ্যস্থিত ব্রহ্ম-মন্দিরে সমবেত ভক্তজনগণের সম্মুখে আমাদের সকলের হৃদয়োত্থিত প্রীতিকুসুম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধমপাপবিদ্ধং জ্যোতির্ম্ময়-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া শুভ কামনা সমূহ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনিই প্রত্যেক ঘটনাকে জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতে স্রোতস্বতী নদী সকল নগর গ্রাম সমূহকে উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল করিয়া, সাগরোত্থিত মেঘরাশি দেশদেশান্তরকে সিক্ত করিয়া, ফলপুষ্পভারে অবনত বৃক্ষলতা সকল ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত জনগ-ণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া যেমন পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে নিরত রহি-য়াছে, সেইরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প ইহারা সকলেও সেই মহান্ সত্যসুন্দর পুরুষের মঙ্গলশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের মঙ্গলসাধনই করিতেছে। দুর্ভিক্ষ,মহামারী প্রভৃতি আপাতত আমাদের চক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলপ্রসূ বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত মঙ্গলভাব সচরাচর আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় না বলিয়া আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাতে সন্দি-হান হইতে পারি না। মহামারী প্রভৃতি যখন আমরা অমঙ্গল বলিয়া জানিতেছি, তখন তাহা দূর করিবার জন্য নানা উপায় অব-লম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণ চেষ্টা করিব; কিন্তু যাহা দূর করিতে পারি-লাম না, তাহার জন্য মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গল ইচ্ছাতে সন্দিহান হইতে পারি না। যাঁহার প্রসাদে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি-লাম, জন্মগ্রহণ করিয়া এতদিন বাঁচিয়া রহিলাম; যাঁহার মঙ্গল

ইচ্ছাতে শৈশবে মাতৃস্নেহ দুগ্ধধারারূপে বিগলিত হইয়া আমাদি-গকে রক্ষা করিয়াছিল এবং যাঁহার করুণায় আমরা পৃথিবীর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সকল দেখিয়া শুনিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম, আপনাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারিলাম, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলমূর্ত্তি কি এতদিনেও দেখিতে পাইলাম না? এত করুণার আস্বাদ পাইয়া যদি আমা-দের জীবনে ঈশ্বরের হস্ত জানিতে না পারি, তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আর কবে তাহা বুঝিব?

বিপদে সম্পদে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রতি যে অটল নির্ভর রাখিতে হয় এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় যে কোন না কোন মঙ্গলভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন দেশের এক সংশয়বাদী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার এক ঈশ্বরপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। একদিন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রি! তুমি যে বল, ঈশ্বর যাহা কিছু প্রেরণ করেন, তাহাই আমাদিগের মঙ্গ-লের জন্য; আচ্ছা, এই যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আসিয়া সময়ে সময়ে রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেয়, ইহাও কি ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান?" মন্ত্রী বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ, সকলই তাঁহার মঙ্গলবিধান; তবে, অনেক ঘটনার কারণ অথবা ফলাফল যেমন আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না, সেইরূপ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপাতত আমা-দের চক্ষে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে মঙ্গল আছে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এবং এ সকলই যে ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল নিয়মের ফল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইব না।" এইরূপে কিছুদিন যায়,

একদিন রাজার অঙ্গুলিতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইল। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কহিলেন যে তাঁহার সেই ক্ষত মঙ্গলের জন্য ঘটিল কি না। মন্ত্রী বলিলেন যে "ইহাতে নিশ্চয়ই মঙ্গল নিহিত আছে।" তখন রাজা ভাবিলেন যে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিলেও যখন মন্ত্রী বলেন তাহা মঙ্গলেরই জন্য, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্রী তাঁহার অমঙ্গল কামনা করেন। এইরূপ ভাবিয়া রাজা মন্ত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজার জিজ্ঞাসায় মন্ত্রী তখনও বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার এই কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। রাজার ক্ষত ক্রমে ভাল হইয়া আসিল কিন্তু তাহার চিহ্ন থাকিয়া গেল। এই অবস্থায় রাজা একদিন সঙ্গীদিগকে লইয়া শীকারে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সঙ্গীহীন হইয়া এক বনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। তথায় কতকগুলি দস্যু তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিতে না পারিয়া তাহাদের দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া চলিল। কিন্তু দেবতার নিকট অক্ষত জীব বলি দেওয়া আবশ্যক, ইহা স্মরণ করিয়া একজন দস্যু রাজার দেহে কোন প্রকার ক্ষত আছে কি না দেখিতে বলিল। তখন সকলে সেই অঙ্গুলিতে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রাজা এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই মন্ত্রীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন যে তাঁহার অঙ্গুলিক্ষতের মধ্যেও প্রকৃতই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত ছিল কারণ সেই ক্ষতটুকু না থাকিলেই তাঁহাকে দস্যুহস্তে নিহত হইতে হইত। মন্ত্রীও রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই করুণা প্রকাশ পাইতেছে। কারণ তাঁহার

দেহে কোন প্রকার ক্ষত ছিল না, এ অবস্থায় তিনি রাজার সঙ্গে শীকারে থাকিলে নিশ্চয়ই দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতেন।

পূর্ব্বতন ঋষিরা অতি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের করুণা আমাদের রক্ষাকবচ স্বরূপে সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে এবং সেই করুণাসূত্রে সমুদায় লোকলোকান্তর গ্রথিত হইয়া আছে; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ একপদও নিক্ষেপ করিতে পারে না। আমরাও আজ তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সহিত একস্বরে বলিতেছি—

> যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
> তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু-
> নাত্যেতি কশ্চন॥

যখন তাবৎপ্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তিনিই পূর্ণ পুরুষ, তাঁহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা পায়, এত-বড় স্পর্দ্ধা কাহার? "তদু নাত্যেতি কশ্চন।" কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই যে চরাচর লোক সকল ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দ বিতরণ করে ইহাদের মধ্যে একটী বালুকণাও অনিয়মিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। একটী বালুকণাও যদি নিয়মের অতীত হইয়া ধীরে ধীরে কোথাও সরিয়া পড়ে, তবে দেখিতে দেখিতে এই শোভনদৃশ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অণু-রাশিতে পরিণত হইবে। এমন সকল আশ্চর্য্য নিয়মে প্রেমসূত্রে

যিনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহার আছে?

এই পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত দেবতা যখন আমাদের প্রাণের প্রাণরূপে বিরাজমান, তখন দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি শত সহস্র বিভীষিকা আসিলেও আমাদের কিসের ভয়? আমরা যদি বন্ধু বান্ধবের নিকট অপ্রেম লাভ করি, যদি আত্মীয় স্বজনের নিকট অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহাতেই বা কি, যখন সেই মঙ্গলবিধাতা আমাদের নিত্য সখারূপে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত কাল রহিয়াছেন? আমরা যদি পবিত্র থাকি, আমাদের হৃদয় যদি নির্দ্দোষ এবং আত্মা নির্ম্মল থাকে, তবে আমরা মৃত্যুকেও অমৃত বোধে আলিঙ্গন করিতে পারিব।

হে করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে এই শুভবুদ্ধি দাও, যাহাতে আমরা পবিত্র থাকিয়া সমুদয় কর্ম্ম তোমাতেই সমর্পণ করিয়া নির্ভয় থাকিতে পারি এবং চিরদিন তোমারই মহিমাগীত গাহিয়া অন্তকালে তোমাকেই লাভ করিতে পারি। আজিকার মত প্রতিদিন যেন প্রাতঃসূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই নামোচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করি এবং জীবনের শেষ দিনেও যেন তোমারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তোমারই ক্রোড়ের সুশীতল আশ্রয় লাভ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে তদ্নাত্যেতি কথন বিষয়ক অষ্টাদশ বিবৃতি সমাপ্ত।

ঊনবিংশ বিবৃতি—প্রিয়তম পরমেশ্বর।

গত বৎসরের শেষ দিবসে আমরা জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমেশ্বরের কল্যাণকর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়াছিলাম। আজ আবার সেই পরমদেবের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিবার জন্য আমরা সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের আত্মা আজ ঈশ্বরের সংস্পর্শ কেমন সুন্দররূপে অনুভব করিতেছে।

ঈশ্বরের প্রসাদ কখন কাহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু যিনি তাহা একবার অনুভব করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তিনি যাহা কিছু করেন, সে সমস্তই তাঁহার হৃদয়দেবতার প্রিয়কার্য্য সাধনোদ্দেশেই করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করেন যে "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ো হন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমং যদয়মাত্মা" সেই পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য সকল অপেক্ষা তিনি অন্তরতম ও প্রিয়তম। তাঁহা হইতেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ হইতেছে; সুখসম্পদ দান করিয়া তিনিই পরীক্ষা করেন এবং বিপদে পড়িয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকি।

সেই অন্তরতম, প্রিয়তম পরমেশ্বর যদি না থাকিতেন, তবে আমাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? আমরা ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না যে এই জগতের অস্তিত্ব সেই মহান পুরুষকে ছাড়িয়া আছে। সকলই সেই অসীম মঙ্গলময় পুরুষের অস্তিত্বের

উপর নির্ভর করিয়া আছে। যাঁহা হইতে আমরা সকলই পাই-তেছি, যিনি আমাদের নিয়তই মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনি আমাদের প্রিয়তম যদি না হইবেন তবে আর কে হইবে? আত্মার নিভৃততম প্রদেশে যে এক মহান্ অতৃপ্তি—শান্তিলাভের আশা নিহিত রহিয়াছে, তাহা কি মণিমাণিক্যে দূর হয়? সাংসারিক সুখ-সম্পদ লাভেই কি সেই অতৃপ্তির নিরাকরণ হয়? সমস্ত জগৎ এক বাক্যে সায় দিতেছে যে তাহা হয় না। একমাত্র মুক্তিদাতা সেই দেবাধিদেব পরমেশ্বর ব্যতীত সে অতৃপ্তি আর কে মিটাইবে? সেই পরম দেবতাই একমাত্র বিত্ত হইতেও প্রিয়তর, পুত্রকলত্র হইতেও প্রিয়তর এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম।

মণিমাণিক্য হারাইলে বিষয়ীদিগের চক্ষু যাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; পিতা পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যু যখন একে একে সংসারের পরপারে লইয়া যায়, তখন সংসারী ব্যক্তির হৃদয় যন্ত্রনাতে অধীর হইয়া শান্তিবারির আশায় যাঁহার কৃপার অপেক্ষা করে, সেই অখিলমাতা বিশ্বপিতা ব্যতীত আর কে আমাদের প্রিয়তম হইবে? এই হৃদয়েশ্বরের চরণে আমাদের সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না, হৃদয় কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

যে পুণ্যশ্লোক ভারতবর্ষে এক সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা সকলের আত্মার একমাত্র শান্তিবারি হইয়াছিল; যে ব্রহ্মের অন্বেষণে কত শত সাধু ব্যক্তি সংসারের সমুদয় সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে দিন-যাপন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই এই ভারতবর্ষে সেই ব্রহ্মের উপাসনা যুক্তিতর্ক অবলম্বনে সমর্থন করিতে হয়, ইহা কি কম দুঃখের কথা! গৃহের যে কোন কর্ম্ম সম্পাদিত

কর, ব্রহ্মোপাসনা করিয়া তাহা সম্পাদিত করিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কিন্তু সেই দেবতাদিগেরও দেবতা পরমদেবতার একটী জ্যোতিকণামাত্র অগ্নিকে পূজা করিয়া তাহা সম্পন্ন করিলে সুসিদ্ধ হইল, এই প্রকার ভাব কি বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মভাবের অবনতির পরিচায়ক নহে?

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য যাহা কিছু প্রিয়তর ভাবিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে, তাহা কখনই চিরকালের জন্য স্থায়ী হইবে না, তাহা সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই। ব্রহ্মবাদী ঋষি তাই আমাদিগকে বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয় সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে এবং বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।" অন্য কোন্ বস্তু বিনাশ পায় না, পরিবর্ত্তিত হয় না? শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাধবলিত পৌর্ণমাসী রজনীর বিমল আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে সেই সুধাময় চন্দ্রমা সহস্র সুখ প্রদান করিলেও ক্রমে অস্তমিত হইবেই— কিন্তু এই আকাশ যাঁহার সত্তায় পরিপূর্ণ তিনি কি এক অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যরূপে বিদ্যমান নাই?

মনকে পবিত্র করিলে, আত্মাকে উন্নত করিলে, এই মহান্ আকাশ যাঁহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পুরুষের সত্তা কেমন সহজে উপলব্ধি করি; কেমন সুন্দর অনুভব করি যে ঈশ্বর আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন? রাত্রিকালে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে দেখ, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের তীব্র তেজঃপরিপ্লুত আকাশের দিকে দেখ, অথবা বর্ষার জলদাবৃত আকাশের দিকে দেখ, দেখিবে যে সকলই পরি-

বর্ত্তিত হইতেছে—শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও,সহস্র বিনাশের মধ্যেও, কেবল এক নিত্য মহান্ পুরুষ মহান্ আকাশকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।

আত্মার নিভৃততম প্রদেশেও যখন অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি যে আত্মা নিত্য কত নূতন জ্ঞানলাভ করিতেছে, পাপতাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া কত জয়পরাজয় সহ্য করিতেছে। কিন্তু সেই নিত্য সংগ্রামের মধ্যেও এক মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মহাযোগী পরমপুরুষ বিদ্যমান। আশ্চর্য্য এই যে, যে মহান পুরুষের একমাত্র ইঙ্গিতে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যে মহান্ পুরুষের একমাত্র ইঙ্গিতে সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস হইতে পারে, তিনিই আবার আমার এই ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন ; সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর আমার এই পাপমলিন আত্মাতে রহিয়াছেন এবং আত্মাতে থাকিয়া সুখদুঃখের মধ্য দিয়া নিয়তই তাহাকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন। একথা আলোচনা করিলে কৃতজ্ঞতা স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং সেই পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন না করিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারি না।

আমরা আমাদের অন্তরের ধন প্রিয়তম পরমাত্মাকে ছাড়িতে পারিব না। অপর কাহারও ভয়ে বা সংসারের প্রলোভনে আমরা ব্রহ্মোপাসনা করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। ঈশ্বর যখন সহায়, তখন অন্য কাহার নিকটে ভয় প্রাপ্ত হইব ? শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি সবল বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। আমরা কেবল তাঁহারই দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কর্ম্ম করিব, আমরা কেবল তাঁহারই

প্রসন্নতা প্রার্থনা করিব। সমস্ত জগত যদি একত্র হইয়া তাহাতে বাধা দেয়, তবে আমরা দেখিব যে সেই বজ্রধারী দেবদেব আমাদিগের আত্মার বলকে সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিয়া সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

হে রুদ্রদেব! তুমি সমুদয় বাধা বিঘ্ন, সমুদয় অসৎ বস্তু তোমার বজ্র দ্বারা বিচূর্ণ করিয়া দাও। হে প্রেমময়! তোমার প্রেমরূপ আমার আত্মার সম্মুখে সর্ব্বদা প্রকাশ কর, যাহাতে আত্মা তোমার সহিত প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়া তোমা হইতে দূরে না যায়। হে মঙ্গল্যদেব! আমাদের মস্তকে তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে প্রিয়তম পরমেশ্বর বিষয়ক ঊনবিংশ বিবৃতি সমাপ্ত।

———

বিংশ বিবৃতি—ব্রহ্মচক্র ।*

দেবস্যৈষ মহিমাতু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।

[রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল। বিচিত্র বর্ণের কাচনির্ম্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সকলে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বেদীতে আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলে—]

আজ প্রভাত হইতে এই শান্তিনিকেতনে কি অনুপম আনন্দের স্রোত চলিয়াছে। এই আনন্দস্রোতের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়া পড়িতেছেন, তাঁহারাই আপনার আপনার উপযুক্তমত আনন্দ-কণা গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, বিষয়কামনাজনিত হর্ষবিষাদ এখান হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। আমাদের এই গভীর আনন্দ কিসের জন্য? ঈশ্বরের মধুময় নাম যে এই সুদূর পল্লী-গ্রামেও প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা যে এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহাতেই আমাদের এত আনন্দ। এই যে এতগুলি সাধুসজ্জন এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আনন্দ-আহ্বানে দূরদূরান্তর হইতে সমাগত হইয়াছেন। আমরা কেবল আমোদ উল্লাসে প্রমত্ত হইতে আসি নাই—অনুসন্ধান করিলে আমাদের সকলেরই অন্তরে এই প্রকার এক অন্তর্নিগূঢ় জিজ্ঞাসাভাবেরই পরিচয় পাইব যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন; ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিতে পারি?

---

* বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ১৮১৭ শক, ৬৬ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭ পৌষ সায়ংকালে বিবৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে পুরাতন অথচ চিরনূতন এই সত্য শিক্ষা দিতেছেন যে সেই পরব্রহ্মেই এই ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি সকলই অধিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।

সকলই তাঁহারই নিয়মে চলিতেছে, তাঁহারই আদেশে সংঘটিত হইতেছে। তাঁহার অনিমেষ আঁখির অতীত হইয়া একটী নিমেষেও চলিতে পারে না। এই ভূলোকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যেমন কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ সুদূর লোক-লোকান্তরেও সেই একমাত্র ভূমা পুরুষেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সকল কার্য্য করিতেছে। এই ভূলোকের একপ্রান্তে যেমন তাঁহারই আদেশে লোকযাত্রা নিয়মিত হইতেছে, তেমনি ইহার অপর প্রান্তেও তাঁহারই আদেশে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এই সকল নিয়মের নিয়ন্তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং অনন্ত পুরুষ বলিয়াই যে শক্তি এই পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র বালুকণাকে পরিচালিত করিতেছে; সেই শক্তিই মনেরও অগম্য অগণ্য সূর্য্যচন্দ্রকে পরিচালিত করিতেছে। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা এমন যে সূক্ষ্ম বস্তু বায়ু, তাহাও পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই শক্তি দ্বারাই পৃথিবী সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে; চন্দ্র সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যও চন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে; দূরতম নক্ষত্রেরও কেন্দ্রগত পরমাণু এই পৃথিবীর কেন্দ্রগত পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহা কর্তৃক আকৃষ্টও হইতেছে। এই একই শক্তির বিভিন্নরূপ পরিচালনায় নদী সকল সমুদ্রে পড়িতেছে, পৃথিবীতে দিবানিশির উদয় হইতেছে এবং এই সৌর জগতের ন্যায়ও ইহা

অপেক্ষা বৃহত্তর কত শত জগত কত ভয়ানক বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই ঋষিরা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—

দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।

ইহা সেই পরম দেবতারই মহিমা, যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মচক্র পরিচালিত হইতেছে।

সেই ভূমা পুরুষ যেমন এই বহির্জগতের রাজা, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যেরও নেতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা। যাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মে পরিচালিত হইয়া আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি, তাঁহারই ধর্ম্ম-নিয়মে শতশত জাতি ব্যাকুল-হৃদয় হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে৷ দেশভেদে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে সেই একই দেবতাকে আহ্বান করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের সকলেরই গন্তব্য স্থান সেই ব্রহ্মধাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সমুদ্রই একমাত্র যেমন নদী সকলের গম্যস্থান, সেইরূপ তিনি একমাত্র মানবের চরম গম্যস্থান। এই সত্যের কি আশ্চর্য্য পরিচয় পাইতেছি—এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করিয়া সমুদয় ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইহা ইংলণ্ডবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিতেছে এবং তেমনি ইহা আমেরিকাবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিতেছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন আজ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিদিগকেও তেমনি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন স্বীয় ক্রোড়ে ধনী মানী ও অশেষশাস্ত্রজ্ঞ লোকদিগকে গ্রহণ করিতেছে, সেইরূপ ইহা কবীর প্রভৃতি দরিদ্র ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকদিগকেও গ্রহণ করিয়াছে। একটী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য যেমন ঈশ্বরের ত্যজ্যপুত্র নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মও পাপীতাপী, সাধু

অসাধু, বিদ্বান্ মূর্খ, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই জন্য আপনার শীতল মঙ্গলচ্ছায়া সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

যে দেবদেবের ইঙ্গিতমাত্রে এই মহান্ ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইয়া মনুষ্যকে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, মুক্তির বিমল প্রভান্বিত পথ দেখাইয়া দিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন। সেই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মের কেমন আশ্চর্য্য মহিমা, আশ্চর্য্য করুণা। "নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব।" আমরা যখন নিদ্রাতে অভিভূত থাকি, তখন সেই পূর্ণপুরুষ জাগ্রত থাকিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। তাঁহার সেই অনিমেষ আঁখির অনুকরণে গ্রহনক্ষত্ররাজিও প্রহরী হইয়া অনিমেষ আঁখিতে ঐ সুদূর গগনপ্রান্তে দণ্ডায়মান আছে। কিসে আমাদের মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, তিনি কেবলই এই চিন্তা করিতেছেন। সেই অমৃত পুরুষ আমাদের অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন বলিয়াই আমাদের অমৃতত্ব লাভের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের সেই দেবতা কি মঙ্গলময়! প্রাণী সৃজন করিবার পূর্ব্বে প্রাণের উপকরণও প্রস্তুত রাখিয়াছেন এবং অবিনশ্বর আত্মার অমৃতত্ব লাভের স্পৃহা উদ্রেক করিবার জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া আত্মাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

এই মঙ্গলময় আনন্দময় পরমদেবতাকে ছাড়িয়া আমরা আর কোন্ দেবতার নিকটে হৃদয়ের প্রীতি উপহার দিতে উপস্থিত হইব? তিনিই যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি আমাদিগকে এত আনন্দ

দিতেছেন, আর আমরা যেন তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত না হই।

হে পরমাত্মন্! আমরা অত্যন্ত অবোধ মনুষ্য; আমরা জানি না তোমাকে কিরূপে ডাকিতে হয়; কেমন করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে, তোমার মধুময় নাম কেমন করিয়া উচ্চারণ করিলে যে আমাদের সকলের তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে, মলিন আত্মা পবিত্র হইবে, তাহা জানি না। তুমিই তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। "শিষ্যস্তেহহংশাধি মাংপ্রপন্নং।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্রহ্মচক্র বিষয়ক বিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

একবিংশ বিবৃতি—ব্রহ্মলোক।*

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন। মনুষ্যের হৃদয়ে অমর হইবার, অমৃতত্ব লাভ করিবার একটা চিরনিহিত আকাঙ্ক্ষা আছে। মানব জানে যে তাহার জীবনে যদি কোন ঘটনাকে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, তবে তাহা

* ১৮১৮ শক, কার্ত্তিক সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

এই যে, তাহার মৃত্যু হইবেই। কিন্তু মনুষ্য কি সেই মৃত্যুর কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া থাকে? সে চায় যে, যত দিন সে বাঁচিয়া আছে, তদপেক্ষা এক দিন হউক, এক ঘণ্টা হউক, এক মুহূর্ত্তও অধিক কাল কি প্রকারে বাঁচিতে পারে। এই জীবনমৃত্যুর ভীষণ সংগ্রাম-ক্ষেত্র সংসারে আমরা দেখি যে, লোকে বাঁচিতে পারিলে মরিতে চাহে না। ইহাতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে লোকে মৃত্যু প্রার্থনা করে না, অমরত্ব প্রার্থনা করে। এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার মূলে আত্মার অমরত্ব-প্রার্থনা বিদ্যমান আছে। লোকে জানে যে এই শরীর একদিন ধরাশায়ী হইবেই কিন্তু তথাপি তাহাদের হৃদয় হইতে যে অমরত্ব লাভের জন্য গভীরনিহিত প্রার্থনা উত্থিত হয়, তাহার কারণ এই যে, সকলেরই হৃদয়ে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব-জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে অমৃতের প্রস্রবণ ও আত্মার আন্তরাত্মা পরমাত্মারও অস্তিত্বজ্ঞান গভীররূপে নিহিত আছে।

এই আকাঙ্ক্ষার শান্তি হইবে কোথায়; কোন্ পথে গেলে অমৃত-ভাণ্ডার আমার নিকটে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে; এমন কোন্ লোক আছে, "জরা নাহি, শোক নাহি, মরণ নাহি যে লোকে?" তৃষ্ণা দিয়া যিনি তাহার শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়া যিনি ক্ষুধাশান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; প্রাণীসৃজনের পূর্ব্বেই যিনি প্রাণের উপকরণ সজ্জিত রাখিয়াছেন, তিনি কি আত্মাতে এক গম্ভীর আকাঙ্ক্ষা নিহিত করিয়া দিয়া তাহার শান্তির উপায় করিবেন না—আমরা যে তাহা হইলে বাঁচিতেই পারিব না। তাঁহার উদার সদাব্রতের কথা কি ব্যক্ত করিব—তিনি ইতিপূর্ব্বেই শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; সরল পথে তাঁহার কাছে যাও, দেখিবে যে তাঁহার অমৃতভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত; তিনি

স্বয়ং আপনাকে দিয়াও ভক্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করেন। সেই স্বর্গলোকে গেলেই আমাদিগকে আর ক্ষুধাতৃষ্ণার ভয়ে ভীত হইতে হইবে না; সেই একমাত্র লোক আছে যেখানে জরা শোক নাই, পাপতাপ নাই এবং যে লোকে মৃত্যুরও পরাক্রম ব্যর্থ হইয়া যায়।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥

স্বর্গলোকে ভয়ের কারণ কিছুই নাই; মৃত্যু নাই; জরাকেও কেহ ভয় করে না; বিগতশোক ব্যক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দিত হয়েন।

এই স্বর্গলোক আমাদের দূরে নহে; তাহা আমাদের অতি নিকটে—আত্মারই অন্তরে তাহা বর্ত্তমান। এই স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যখন আমাদের আত্মাতেও দেখিতে পাই, তখনই আমাদের আত্মাই স্বর্গলোক হইয়া উঠে, তাহাই তখন ব্রহ্মধাম হয়। সেই মহান্ পুরুষ অসীম আকাশেও যেমন ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছেন, তেমনি মানবাত্মাতেও আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া সর্ব্বদাই সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" কিন্তু মানবাত্মাই তাঁহার প্রিয়তম আসন "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" মানবাত্মার ন্যায় প্রিয় আসন তিনি আর কোথায় পাইবেন? জড়পদার্থ আপনাকেই আপনি জানে না, ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে? মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেইবা আপনাকে আপনি জানে এবং কেইবা জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-কে জানে? মনুষ্য যেমন তাঁহার নিকট হইতে স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্যই তাঁহাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমভক্তি উপহার

প্রদান করিতে পারে, তাই মানবাত্মাই ঈশ্বরের প্রিয়তম বস্তু ; ঈশ্বর মানবাত্মাতেই অধিষ্ঠান করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন।

এই পরমাত্মা অসীম আকাশেও ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, মানবাত্মাতেও চির-অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ; তিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া পরম কৃতার্থ হয়েন? যাঁহারা ইহাঁতে নিঃসংশয় হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ইহাঁকে দেখিতে চাহেন, তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করিয়া অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হয়েন, কারণ এই আত্মার অন্তরাত্মা হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। "হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তঃ।" সেই দেবদেব তর্কের অগম্য। তর্ক তাঁহার নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তর্ক সেখানে দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

হে ভ্রাতৃগণ! ভ্রমক্রমে আমরা যেন তর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রহ্মানুসন্ধানে না যাই। সে পথে যাইলে কেবল কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। সেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ঈশ্বর স্বয়ং যে পথ আমাদিগের অন্তরে থাকিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিলেই অতি সহজেই সংসার উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জ্বল ব্রহ্মধামে গমন করিতে পারিব। আমাদের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে, তাহাকেই জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইব ; এবং এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব এবং অমর হইব। তখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে। তখনই

জানিতে পারিব যে ঋষিরা যে আশাবাণী আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কি রূপ পরম সত্য—কেবল আশাবাণী মাত্র নহে।

হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা তোমার কিছুই জানিতে পারি না। তুমি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, তুমি আমাদের শিক্ষাগুরু হইয়া আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিয়া দাও, প্রীতিকে উজ্জ্বল করিয়া দাও। আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব—এই প্রার্থনা সফল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মলোক বিষয়ক একবিংশ বিবৃতি সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ বিবৃতি—ধর্ম্মপথ।*

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; উত্থান কর, জাগ্রত হও। আর কত দিন আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিব? আর কত কাল মহানিদ্রা আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে? আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অজ্ঞানান্ধকারের কারাগারে এত দিন পড়িয়া আছি যে, সেই কারাগার হইতে মুক্তির পথ কেহ স্পষ্ট রূপ দেখাইয়া দিলেও আমরা সে পথ অনুসরণ

* ১৮১৩ শক, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ, ৩০ কার্ত্তিক সায়ংকালে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত।

করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ আহ্লাদের এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, মহানের দিকে আমাদের চক্ষু ফিরিতে চাহে না। কোথায় আমাদের পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণ বিত্তৈষণা, স্ত্রী-ঐষণা, পুত্রৈষণা—সমুদয় সংসারকে একদিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের কঠোর সাধনার বলে পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন; আর আমরা কোথায় পরব্রহ্মকে এক দিকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ভয়কে, পদমর্য্যাদা নষ্ট হইবার ভয়কে হৃদয়ে অধিকতর স্থান প্রদান করিয়া থাকি। আমাদিগকে শত ধিক। আমরা মনে করি না যে সেই পরমেশ্বর ভয়ানকেরও ভয়ানক "ভীষণং ভীষণানাং। যখন তাঁহার রুদ্রমুখ দেখি, তখন কি আর কোন প্রকার ভয় হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে? আবার যখন তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, তখন সহস্র বাধা বিপত্তি, সহস্র দুঃখ ক্লেশ উৎপীড়ন করিতে থাকিলেও আর কিছুতেই ভয় হয় না।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

আজ আমরা সুহৃদ্বর্গে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সম্মিলিত হইয়াছি। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না স্বীয় রজতকান্তিতে সমুদয় আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়েও কেমন এক পবিত্র ভাব আনয়ন করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই এমন সুন্দর স্থানে আসিয়া কি আমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইব? ইহাও কি কখন হইতে পারে যে, যে দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে

অযাচিতভাবে সকল প্রকার সুখসম্পদ মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন; আর আজ আমরা এই ভক্ত-সমাগম-ক্ষেত্রে তাঁহাকে "হৃদয় থালভার ভক্তি পুষ্পহার" উপহার প্রদান করিতেছি, তখন তিনি কি আমাদিগকে অমৃত দান করিবেন না? তিনি অবিরলধারে আমাদের আত্মায় অমৃত বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমরা পাপতাপে মলিন হইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছি না। হৃদয়কে প্রশস্ত করিলে, আত্মার দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেই দেখিতে পাইব যে, পরমাত্মা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে অমৃতের স্রোত নিয়তই প্রবাহিত রাখিয়াছেন। সমাজভয়েই হউক, লোকভয়েই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক অনেকে সকল সময়ে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ পান না; কিন্তু আজ যখন আমরা সেই ব্রহ্মের নামে এখানে সমাগত হইয়াছি, তখন যেন আর আমাদিগকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে না হয়; আমরা যেন আজ অমৃতের উৎস হইতে অমৃত না লইয়া বাটীতে ফিরিয়া না যাই। আজ আমরা সকলেই উপযুক্ত মত অমৃত লইয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিব; সেই অমৃত আমাদিগকে সমাজভয়, লোকভয় প্রভৃতি নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের উৎসের পথে লইয়া যাইবে।

এই অমৃত লাভ করিবার পথকে পণ্ডিতগণ দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" তিনটী বিভিন্ন মার্গ মিলিত হইয়া, এই সূক্ষ্মতম পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই তিনটী মার্গ (১) জ্ঞানমার্গ (২) প্রীতিমার্গ এবং (৩) কর্ম্মমার্গ;—এই তিনটী পথের সঙ্গমস্থান হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পথ এবং তাহা "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এখন উক্ত

তিনটী মার্গের প্রত্যেকটীর বিষয় কিছু বিশেষ রূপে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম জ্ঞানমার্গ। যে কোন ব্যক্তিতে আমরা প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি স্থাপন করিব, তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য; যদি তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র হন, প্রীতির উপযুক্ত পাত্র না হন, তবে আমার হৃদয়কে তাঁহাতে ন্যস্ত করিব না; আর যদি শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত পাত্র হয়েন তবে আরও উৎসাহ সহকারে তাঁহার বিষয় জানিয়া তাঁহাতে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিয়া চরিতার্থ হইব। ইহারই জন্য প্রথমে প্রীতির পাত্রের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। যদি ব্রহ্মকে প্রীতি করিতে যাই, যদি ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে প্রস্তুত হই, তবে সর্ব্ব প্রথমেই ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই বুঝিতে পারিব যে কিরূপ কার্য্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের হৃদয়ে তাঁহাকে জানিবার এক স্পৃহা দিয়াছেন। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্তের মুনিঋষিগণ স্ত্রীপুত্র, বিষয় বিভব সকল প্রকার সাংসারিক সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া কত শত বৎসরের কঠোর সাধনাবলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে দুই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—এক অভাবপক্ষীয়, দ্বিতীয় ভাবপক্ষীয়। ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে জগতে যে কিছু বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, তাহার মধ্যে কোনটীই ব্রহ্ম নহে। তাঁহারা বলিলেন—

অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং।

ইহা নহেন, ইহা নহেন, এইরূপই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ; ইহা নহেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার অন্য উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশ নাই।

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে।

ইহা নহেন, ইহা নহেন, এই প্রকার সেই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না।

ইহা হইল ঋষিদিগের অভাবপক্ষীয় জ্ঞান। বর্ত্তমান কালে প্রতীচ্য ভূমির পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের এইরূপ কতকটা অভাবপক্ষীয় * জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, কিন্তু পিতামহ ঋষিগণ কেবল তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অন্বেষণ করিতে করিতে, চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মের ভাবপক্ষীয় জ্ঞানও যথেষ্ট লাভ করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন এই সেই পরমাত্মা

সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং।

তিনি সত্যের সত্য, প্রাণ প্রভৃতি সত্য বটে কিন্তু তাহার মধ্যে এই পরমাত্মাই সত্যের সত্য।

তাঁহারা ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

---

* ইংরাজিতে যাহাকে negative knowledge বলে।

রসোবৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্‌ধ্বানন্দী ভবতি।

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা আনন্দঘন ব্রহ্মেতেই আপনাদিগের সকল কামনার পরিসমাপ্তি করিলেন।

ক্রমে তাঁহারা জ্ঞানমার্গে চলিতে চলিতে জ্ঞান ও প্রীতির সঙ্গমস্থানে আসিয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা ভাবপক্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে আমাদের এই পরমেশ্বর সখার সখা পরমসখা, মাতার মাতা পরমমাতা, পিতার পিতা পরমপিতা, তখনই তাঁহারা হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁহারই চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মপ্রীতি না আসিয়া থাকিতে পারে না। যখন দেখি যে, প্রচণ্ড নিদাঘের নিশাকালে সেই করুণাময় পরমেশ্বর মলয় বায়ু প্রেরণ করিয়া, পূর্ণচন্দ্রের সুশীতল সুধারসে জগত সিক্ত করিতে থাকেন; যখন দেখি যে, তিনি বর্ষাকালে প্রচুর জলবর্ষণ করিয়া কৃষকদিগের ব্যাকুলতা দুর করেন; আবার সেই তিনি আমাদিগের আত্মার ব্যাকুলতা আপনাকে দিয়াও নিরাকরণ করেন, তখন হৃদয় কি স্বতই সেই মহান্ অনন্ত পুরুষের প্রতি ধাবিত হয় না? আত্মা হইতে কি ব্রহ্ম-যশোগান স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না? ব্রহ্মপ্রীতি নিয়তই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুগামী।

ক্রমে যখন সাধক জ্ঞানমার্গ ও প্রীতি মার্গের সন্ধিস্থল হইতে আরও উন্নত হইতে থাকেন, তখন তিনি কর্ম্মমার্গের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যাঁহাকে আমি প্রীতি করি, যাঁহার প্রতি আমার

আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁহার যাহা প্রিয়কার্য্য, তাহা সম্পাদন না করিয়া আমি কি থাকিতে পারি? শুধু কি মুখে বলিলেই হয় যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, আমি ব্রহ্মেতে প্রীতি স্থাপন করিয়াছি? প্রীতির নিদর্শন কোথায়? ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে আসিলেই আমরা দুইটী কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারিব না—প্রথম তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য পরিত্যাগ, দ্বিতীয় তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন। যদি তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য সকল পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিলাম যে এখনও হৃদয়ে ব্রহ্মপ্রীতি আসিতেই পারে নাই। আবার যদি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করি, তাহা হইলেও বুঝিলাম যে তাঁহার প্রতি প্রীতির উপযুক্ত কার্য্য করিলাম না, অতএব সর্ব্বাঙ্গীন প্রীতি এখনও হৃদয়কে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। পরম স্নেহময় পিতার অনিমেষ নয়ন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া সন্তানগণের মঙ্গল-সাধন করিতেছেন। আমাদেরও কর্ত্তব্য যে আমরা নিরলস হইয়া তাঁহারই সংসারের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশে শুভ কর্ম্মে রত থাকি। আমাদিগের অলসভাবে কালযাপন করিলে চলিবে না।

জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্মের ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে এক সরল ধর্ম্মপথ চলিয়াছে। এই ধর্ম্মপথের নেতা স্বয়ং ঈশ্বর।

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এই সরল ধর্ম্মপথ হইতে বহুদূরে পড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু তিনি স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজ-

মান থাকিয়া আমাদিগকে বারম্বার তাঁহারি পথে ফিরাইয়া আনিতেছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার এই ধর্ম্মপথ ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। এই ধর্ম্মপথ আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্মের উপযুক্ত সমাবেশ। এই জ্ঞান প্রীতি ও কর্ম্মের উপযুক্ত সমাবেশবিশিষ্ট ধর্ম্মকে, চাই কেবল ধর্ম্ম নামেই অভিহিত কর, কিম্বা ভাগবৎধর্ম্ম নামেই অভিহিত কর কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াই বল, তাহাতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। যে ধর্ম্মের নেতা স্বয়ং ঈশ্বর, সে ধর্ম্ম চিরকালই সত্যধর্ম্ম থাকিবে—তাহার বিনাশ নাই। দেখ, সেই অতি পুরাকালে যে ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহার আস্বাদ পাইয়া আমরা কত-না আনন্দ উপভোগ করিতেছি। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের ন্যায়, আমরাও শরীর ও মনকে সংযত করিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করি। যতই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব, ততই ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার যখন ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মা উন্নত হইবে, ব্রহ্মপ্রীতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, তখন তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা অতি সহজ হইয়া যাইবে—ব্রহ্মপ্রদর্শিত ধর্ম্মপথে চলা অনায়াস-সাধ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মপ্রীতি যদি একবার আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা নির্ভীক-চিত্তে বজ্রদৃঢ় স্বরে ঘোষণা করিতে পারি যে, যদি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হই; যদি লোকসমাজ কর্ত্তৃক তাড়িত, লাঞ্ছিত, বহিষ্কৃত হই; এমন কি, যদি শরীর হইতে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ উৎকীর্ণ করিয়া লওয়া হয়, তথাপি সেই প্রিয়তম প্রাণসখা পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তখন আমা-

দিগের হৃদয়ে এমন বল আসিবে যে সংসারের সকল প্রকার ভয়কে তুচ্ছ করিয়া আমরা আমাদিগের কি গৃহ্য অনুষ্ঠানে, কি সামাজিক অনুষ্ঠানে, কি অন্তরে কি বাহিরে সকল স্থানে, সকল কার্য্যে সেই অমূর্ত্তমজমব্যয়ং, মূর্ত্তিবিহীন, জন্মবিহীন, অবিনাশী পরব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব; সকল কার্য্য তাঁহারি হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্তান যেমন মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া নির্ভয় হয়, সেইরূপ নির্ভয় হইব এবং তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। এক সময়ে যখন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায় সবেমাত্র দেখা দিয়াছে, তখন রোমান ক্যাথলিকগণ তাহাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। প্রটেষ্টাণ্টগণ রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মগুরু পোপের অধীনতা স্বীকার করিত না বলিয়া এই প্রকার অত্যাচার। অত্যাচারের পরিমাণ একটি উদাহরণেই প্রকাশ পাইবে। পোপ-নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী এক প্রটেষ্টাণ্টকে পোপের অধীনতা স্বীকার করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেও যখন সে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিল না, তখন, বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, মনুষ্য-হৃদয় মনুষ্যহৃদয়ের পাষাণভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেই অসহায় প্রটেষ্টাণ্টের চক্ষু অল্পে অল্পে অস্ত্রবিদ্ধ করা হইতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মের বল এমন অসাধারণ বল যে এমন পাশব অত্যাচারেও প্রটেষ্টাণ্ট কিছুতেই পোপের অধীনতা স্বীকার করিল না। সেই প্রটেষ্টাণ্ট অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়াও এক ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে দেবহৃদয় মনুষ্যবিশেষকে অনুসরণ করিয়া কি আশ্চর্য্য বীরত্বই প্রদর্শন করিল; আর আমরা সত্যস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, প্রেমময়, করুণাময়, জীবন্ত জাগ্রত দেবতা পরমেশ্বরকে আমাদিগের অতি নিকটস্থ একমাত্র পরম আশ্রয় জানিয়াও, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য আত্ম-

বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইব, নানা প্রকার ভয়ে অস্থির হইব? যাঁহার ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, তিনি স্বয়ং যখন আমাদের হৃদয়দেবতা, প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, তখন আমাদের আর কিসের ভয়? অভয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া হৃদয়কে ভয়জর্জ্জরিত করিতে কি আমাদিগের লজ্জা হয় না, ঘৃণা হয় না? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা থাকিতে চাহি না – তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকাই আমাদিগের মৃত্যু, তাহাই আমাদিগের নরক; আর তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলে আমাদিগের সমুদয় ভয় দূর হইয়া যাইবে।

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

হে পরমাত্মন্, হে প্রাণনাথ হৃদয়েশ্বর, তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব? তুমি আমাদিগের সকল শুভ কামনাই পূর্ণ করিতেছ। তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে বিপথ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছ। তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? তোমার নিকট আজ এই সমাজমন্দিরে, এই সুহৃদ্বর্গের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন নিতান্তই রিক্তহস্তে ফিরিয়া না যাই; তোমার বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, যেন তাহার উপর আরো অধিকতর জ্ঞান লাভ হয়; হৃদয়ে যতটুকু তোমার প্রতি প্রীতি ছিল, এখন যেন তাহা বর্দ্ধিত হইয়া

সমুদয় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে। কবে আবার সেই পুরাকালের ন্যায় ভারতের প্রতি গৃহে তোমারি মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে-ওঙ্কারের পুণ্যনাম বিঘোষিত হইতে থাকিবে? কবে আবার ভারতের উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিতে পাইব?

হে অনাথের আশ্রয়! আমাদের এই বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একমাত্র ধর্ম্মের বলই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ভাবিলে আকুল হইতে হয় যে, ধর্ম্ম-পিপাসা, ধর্ম্মবল যেন ক্রমে এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এখন তুমিই ইহার জননী হইয়া ইহাকে রক্ষা কর, যেন এদেশে ধর্ম্মের নামে বিন্দুপরিমাণেও মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। হে বুদ্ধিদাতা, বলদাতা তুমি আমাদিগের হৃদয়ে এমন বুদ্ধি ও শক্তি প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা যথার্থই ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হইয়া উঠি। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই; তুমি আমাদিগের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর যেন আমরাও তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ধর্ম্মপথ বিষয়ক দ্বাবিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ বিবৃতি—শান্তিনিকেতন।*

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।

আশ্রমে বসিয়া আছি। হাত কয়েক মাত্র পুষ্পফলে অবনত বৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহার পরে দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর। কোন দিকে বা গ্রামের শ্যামল প্রান্তরেখা দেখা যাইতেছে, কোন দিকে বা তাহাও দেখা যাইতেছে না। এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আমি একাকী বসিয়া আছি। প্রভাতের মলয়-বায়ুর মৃদু হিল্লোল আমাকে চামর ব্যজন করেতেছে। সূর্য্যকিরণ বিপুলচ্ছায় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া আমার শীতাপনয়ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সংসারের বিষময় কোলাহল প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না; বিহগকুল মধুধারা বর্ষণ করিয়া হৃদয়নিহিত দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে। আশ্চর্য্য! এই প্রান্তরের মধ্যে আমি কি ক্ষুদ্র, কিন্তু সকলেই যেন আমারই সেবা করিতে ব্যস্ত। যখন সংসারের কোলাহলময় নগরে থাকি, তখন আমি আপনাকেই কত বড় ভাবি। সকলেই চীৎকার করিতেছে; আমি মনে করি যে আমার সুকণ্ঠ হইতে একটি চীৎকারধ্বনি বহির্গত না হইলে, চীৎকারগুলি ঠিক সুস্বর হইতেছে না। সকলেই কার্য্য করিতেছে; আমি মনে করি যে সেই সকল কার্য্যে আমার হস্ত থাকিলে তাহা আরও অধিক সুসম্পন্ন হইত। কোলাহলের সংসারে আমি আপনাকে খুব বড়লোক ভাবিয়া সকলের সঙ্গে আমিও চীৎকার করিয়া কোলাহলই বাড়াইতে থাকি, কমা-

---

*দাসী, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইতে পারি না। কিন্তু এই আশ্রমের নির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়া আমিও মগ্ন হইয়া গিয়াছি; আমার ক্ষুদ্রতা বুঝিয়াছি; কোলাহল করিবার ক্ষমতাই হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই নির্জ্জনবাসে আমি আমার ক্ষুদ্রতাও বুঝিয়াছি, আমার মহত্বও বুঝিয়াছি।

হে দেবদেব! এই বিশ্বমন্দিরে আসীন তোমাকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছে, "মধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" আর তোমারি সেই অনন্ত জ্যোতির বিস্ফুলিঙ্গমাত্র এই মানবাত্মার সেবার জন্য তোমারি আদেশে বিশ্বজগত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে। আমি যতটুকু জড়, ততটুকু ক্ষুদ্র; জড়শক্তি সকল অন্ধভাবে আমার সেই জড়দেহের উপর দ্বন্দ্ব লাগাইতেছে; আমার বলিবার ক্ষমতা নাই, আমার করিবার ক্ষমতা নাই; জড়শক্তির অধীন হইয়াই এই জড়দেহকে চলিতে হইবে। আমি যতটুকু আত্মা, ততটুকু মহান্; এখানে জড়শক্তির কোন ক্ষমতাই খাটিবে না; আত্মা সেই জীবনের উৎস, শক্তির উৎস, প্রেমের উৎস পরমাত্মার নিকট হইতে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। জড়-দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্; আত্মা গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় বিশ্বজননীর গর্ভে বাস করিয়া অমৃতপানে পরিপুষ্ট হয়।

সংঘর্ষণ না হইলে কোন পদার্থেরই অনুভব হয় না, ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। এই যে আলোক অনুভব করিতেছি, যদি না ধূলি প্রভৃতি পদার্থরাশির সহিত ইহার সংঘর্ষণ হইত, তবে ইহা অনুভব করিতে পারিতাম না। আমার বাহুতে যে বল আছে, অপর কোন পদার্থের সংঘর্ষণে বাধা না পাইলে সে বল অনুভব করিতে অক্ষম হই। তেমনি কোলাহলময় সংসারে জড়পদার্থের সহিত অধিক সংঘর্ষণ হয় বলিয়া সেখানে জড় দেহপিণ্ডেরই অধিক

অনুভব হয়, দেহপিণ্ডেরই কথা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়—সেখানে তাই দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত আত্ম-তত্ত্ব উপহাসের কথা। কিন্তু এই নির্জ্জন আশ্রমে জড় পদার্থের সহিত জড় দেহের তত সংঘর্ষণ হয় না, যত পরমাত্মার সহিত আত্মার। এখানে কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিতে হয় না; পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে আত্মা যতটা পারে জড় দেহের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার অতুল ঐশ্বর্য্যে আপনাকে দিবানিশি মগ্ন রহিতে চাহে। এখানে তাই জড়তত্ত্ব কেহ শুনিতে চাহে না, আত্মতত্ত্বই হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত সংঘর্ষণে আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়।

ভবকোলাহল দূরে ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন আশ্রমে ধ্যানচক্ষে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া কত না সুখশান্তি ভোগ করিতেছি। এই-টুকু সুখশান্তি দিবার জন্য প্রকৃতি আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। মানবাত্মাকে সুখে স্বচ্ছন্দে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ভগবান এই জগতের মহান্ আশ্রম খুলিয়াছেন। প্রকৃতি তথায় সেবিকা; এই মহান্ আকাশ তাহার জ্বলন্ত চুল্লী; সূর্য্য চন্দ্র তাহার ইন্ধন; পৃথিবী ও পৃথিবীর ন্যায় জীবজন্তুর আবাসভূমি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহ। এই আশ্রমে যেমন জড় দেহের পুষ্টির জন্য নানাবিধ ফুলফল দিবানিশি প্রস্তুত রহিয়াছে, তেমনি আত্মারও পুষ্টির জন্য প্রেম দয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ দিবানিশি সজ্জিত রহিয়াছে। হে দেব! তোমার কি করুণা! আমরা পাপী তাপী দীন দরিদ্র হইলেও তুমি আমাদিগকে সুখ-শান্তি দিবার কত চেষ্টা করিতেছ। আমরা সকলেই অনাথ আতুর

জন, অনাথ-নাথ তুমি, তুমিই দীনদয়াল। প্রেম, দয়া প্রভৃতি সুমিষ্ট উপকরণ পাওয়া যায় বলিয়াই এত কষ্টের সংসারও সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতন বলিয়া বুঝিতে পারি। এই মহান্ আশ্রম প্রকৃতই শান্তিনিকেতন; এখানে দেখ, সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তোমারই সেবা করিতেছে। তবে আমরা যে অনেক সময়ে এই সংসারকে শান্তিনিকেতন বলিয়া দেখি না, তাহা আমাদেরই চক্ষের দোষ। আমাদের চক্ষু হইতে কুটা সরাইতে পারি না, আর এই জগৎসংসারকে শান্তিহীন, অশান্তিপূর্ণ মরুভূমি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি। যতদিন সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র উদিত হইতে থাকিবে, যতদিন পুষ্পরাশি সুগন্ধ বিস্তার করিবে, যতদিন ঔষধি বনস্পতি সকল ফলভরে অবনত হইতে থাকিবে, যতদিন নদী সকল সুমিষ্ট জল প্রবাহিত করিবে, এবং যতদিন প্রেম, ভক্তি, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি স্বর্গীয় বস্তু ইহজগতে বিরাজ করিবে, ততদিন ইহা শান্তিনিকেতন থাকিবেই। যে জড়দেহের প্রতিবন্ধকতায় এই শান্তিনিকেতনের শান্ত ভাব অনেক সময়ে ধরিতে পারি না, না জানি সেই জড়দেহ হইতে মুক্ত হইলে কত শান্তি লাভ করিব। হে প্রাণময়! তুমি এই জড় শরীর বিচূর্ণ করিয়া দাও। আত্মা তোমার শান্ত-স্বরূপ নিত্যকাল দেখিয়া শান্তি লাভ করুক।

মানব! তুমিও যদি এই পৃথিবীকে শান্তি-নিকেতন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই পরমাত্মাকে তোমার আদর্শ কর; তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছা সম্মিলিত কর। ঈশ্বর এই জগতে সুখশান্তি দিবার জন্য এক মহান্ আশ্রম খুলিয়াছেন, তুমিও সেই আদর্শে তোমার উপযুক্ত আশ্রম খোল, তোমার সাধ্যমত অনাথ

আতুর জনকে আশ্রয় দাও। মহান্ আকাশ ঈশ্বরের; আমরা তাহাকে আমাদের উপযুক্ত করিয়া বলি ঘটাকাশ, পটাকাশ। মহান্ আশ্রম ঈশ্বরের এই জগৎ; আমরা আবার তাহারই মধ্যে এক একটী সীমা কল্পনা করিয়া বলি, এই আশ্রম এই দেশের, অমুক আশ্রম অমুক গ্রামের, আর তৃতীয় আশ্রম অমুক নগরের। কিন্তু সকল আশ্রমেই সেই মহান আশ্রমেরই আংশিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। মানব! তুমি উৎসাহ পাওনা বলিয়া, প্রশংসা পাওনা বলিয়া আশ্রম খুলিতে পরাঙ্মুখ হইও না। যখন দেখিব গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, সকলেই অনাথ আতুরদিগকে, দীন-দরিদ্রদিগেকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া লাগিয়াছে; যখন দেখিব মনুষ্যদিগের মধ্যে দ্বেষ হিংসা লোভ চলিয়া গিয়া সাধুবৃত্তি সকলই কেবল রাজত্ব করিতেছে, তখনই জানিব জগতে আশ্রমের প্রভাব পূর্ণ-বিস্তৃত; তখনই জানিব ধরণীতে শান্তি-নিকেতন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে শান্তিনিকেতন বিষয়ক ত্রয়োবিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! দয়া করিয়া আমার অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর। তুমি আমাকে ত্যাগ কর নাই, আমিও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি। আমার স্বর্গীয় পিতা যেরূপ তোমার আশ্রয়ে অনুক্ষণ রহিয়াছেন, আমিও যেন সেইরূপ অনুক্ষণ তোমারই আশ্রয়ে থাকি। অধর্ম্ম করিবার সময় যেন আমার মস্তকের নিকট তোমার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং সর্ব্বদা দেখিতে পাই। পুণ্য কর্ম্ম করিবার সময় আমার সম্মুখে তোমার প্রসন্ন মুখ যেন সর্ব্বদা দেখিতে পাই। আমি যাহাতে শুভাশুভ বিবেচনা করিতে বিশেষরূপে সক্ষম হই, এরূপ বুদ্ধিশক্তি প্রেরণ কর। চিরকাল যেন তোমারই স্বরূপ ধ্যান করি। তুমিই জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতা। তুমিই আনন্দ স্বরূপ; তোমা হইতেই এই বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে তোমাতেই প্রবেশ করিবে। তুমিই রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু; তোমাকে পাইয়াই জীব আনন্দ লাভ করে। তোমাকে পাইয়াই আমিও যেন চিরকাল আনন্দিত থাকি। হে পরম মাতা. এই আশীর্ব্বাদ আমার মস্তকে বর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

চতুর্বিংশ বিবৃতি—ব্যাকুলতা। *

[অর্চ্চনানন্তর—]

আজ আমাদিগের ব্রহ্মোৎসবের দিন। আজ আমাদিগের মহা আনন্দের দিন। এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং ব্রহ্ম; তিনি আজ এখানে, আমাদের সম্মুখেই উপস্থিত আছেন, তাই আজ এখানে এত আনন্দ, এত উৎসব-কোলাহল; তাই আজ দেখিতেছি যে সকলেরই মুখে আনন্দের বিমল প্রভা প্রকাশ পাইতেছে; নিরানন্দ এস্থান হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। আজ বাহিরেও যেমন পত্রপুষ্পাদির দ্বারা সমস্ত সুসজ্জিত করা হইয়াছে, আমরা আমাদের আত্মাকেও সেইরূপ পবিত্রতা ও প্রীতিপুষ্পের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ দুঃখশোক, পাপতাপ সকলই ভুলিয়া গিয়া, আজ নিরানন্দরূপ ধূলিরাশি গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্তত ক্ষণকালের জন্যও আনন্দসাগরে অবগাহন করিতে এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

আমরা যখন চাহিয়া দেখি যে, এই এতগুলি বন্ধুজনে ব্রহ্মোৎসব উপভোগ করিবার জন্য, ব্রহ্মের উপাসনায় যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তখন হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। এই শুভ ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। বোধ হয় উপস্থিত সভ্যদিগের কাহারই অবিদিত নাই

---

* ১৮১৩ শক, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে দ্বিষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে জোড়াশাঁকোস্থ দ্বারকানাথ ভবনে বিবৃত।

যে নানা গুরুতর বিপদ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও তাহার বিপদের অবসান হয় নাই। তখনও কেহ জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। সেই এক দিন গিয়াছে; আর আজ দেখি যে, শত শত লোক ব্রহ্মোৎসব দেখিবার জন্য আকুল। ঈশ্বরের কেমন করুণা প্রকাশ পাইতেছে!

যে ঈশ্বরের কৃপাবলে এতটা পরিবর্ত্তন হইতে পারিয়াছে, তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে! পারমার্থিক সত্য যাহা কিছু, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম; অতএব সত্যের জয় হইবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে না তো জয় হইবে মিথ্যার? "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। আমরা যখন মিথ্যার প্রশ্রয় দান করিয়া জয় লাভের আশা করি, তখন ইহা মনে থাকে না যে সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ন্যায়রাজ্য হইতে মিথ্যাকে দূর করিয়া সকল দুরাশাই নির্ম্মূল করিবেন। তবে তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে আমরা নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্যের পথ অবলম্বন করি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ পরব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান আছে; ইহার বিস্তার প্রীতির উপর। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। কোন ধর্ম্ম মনুষ্যপূজা করিতে বলে, কোন ধর্ম্ম বা ভূতপূজা, আর কোন ধর্ম্ম বা মূর্ত্তিপূজার আদেশ করে। এই সকল ধর্ম্ম পুস্তকাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে, প্রকৃত সত্য সকল মনুষ্যপূজা প্রভৃতি কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের

বিরোধ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক ঈশ্বরের রচিত এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও মানবাত্মা। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া যতই জ্ঞানলাভ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই আদরের সহিত স্বীকার করিবেন। অনন্তজ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানকে যে ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ করিতে যায়, সে ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মও উন্নত আকার ধারণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমাদের সকলেরই অন্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে; জ্ঞানের কার্য্য সেই সকল ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপিত করা। ইহারি জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মও উন্নত আকার ধারণ করিবে। জ্ঞান ও প্রীতির পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর, এই জন্য জ্ঞান ও প্রীতির উন্নতিও অনন্তকালব্যাপী। ব্রাহ্মধর্ম্মও যখন এই জ্ঞান ও প্রীতির উপরেই দণ্ডায়মান, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি অনন্তকালব্যাপি। এই উন্নতির অর্থ ইহা নহে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল পরিবর্ত্তিত হইবে— কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের আত্মার অন্তরস্থিত ধর্ম্মভাব সকল একে একে জাগ্রত হইয়া উঠিবে; আমাদের আত্মা যতই ধর্ম্মভাবে পরিপুষ্ট হইবে, ততই আমাদের জীবজন্তুতে দয়া ও মনুষ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে; ততই আমরা মানবের ভ্রাতৃভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব এবং ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর প্রীতিই এই সকলেরই অবলম্বন। ইহারি জন্য আমি পুনরায় বলিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত, সত্য ভাবের স্রোত কি চিরকালের জন্য কেহ প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? কখনই নহে। এই স্রোত একদিন সমস্ত জগতের মরুভূমিকে ডুবাইয়া দিয়া শস্যশ্যামলা করিয়া

তুলিবে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, চীন, জাপান, জর্ম্মানি, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—নানা স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। এই সকল উৎস হইতে এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়া এক মহাস্রোতে পরিণত হইবে এবং সসাগরা পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিবে। এই দিনের কথা স্মরণ করিলেই আমাদের আত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; এই দিন দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে আমাদের কত-না স্পৃহা জন্মে।

কিন্তু বন্ধুগণ, বর্ত্তমানকালের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের কি মনে হয় না যে এইদিন আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে? তবে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, করুণাময় পরমেশ্বর এই শুভ দিন অতিশীঘ্র আনয়ন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমরা সকলেই যদি এই অধিকার ও ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করি, সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বরেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে চলি, তবেই আমরা আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে তাঁহারই প্রসাদে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সক্ষম হইব; তাঁহার প্রসাদের নির্ঝর আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে। বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মের প্রতি কেমন এক অশ্রদ্ধার ভাব আসিয়া সমাজের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা সকলেই দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া হৃদয় হইতে এই অশ্রদ্ধার ভাবকে দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বিমল ভাব গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সত্তাতে আত্মাকে পূর্ণ রাখি। যে দিন জগতের লোক ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র উপাস্য দেবতা করিবে, সেই দিনে, সেই শুভদিনে এই জগত হইতে দণ্ড-

ভয় তিরোহিত হইবে ; প্রীতিশাসনের প্রভাবে মর্ত্ত্যলোক স্বর্গলোক হইয়া যাইবে।

ঈশ্বরের প্রসাদে জীবনকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার প্রকাশ—তাঁহার প্রশান্ত আবির্ভাব আত্মাতে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগের নিচেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা যত্ন করিব না, নিশ্চেষ্ট ভাবে অলসভাবে কাল যাপন করিব আর ঈশ্বরের প্রসাদ যাচ্ঞা করিব—ইহা করিলে চলিবে না। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে বিশেষরূপ সাধনা করিতে হইবে। অশ্রুবারিতে হৃদয়ের পাপতাপ ধৌত করিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে হইবে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না ; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

কেবল বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না ; তখন বাক্যই বা কি প্রকারে তাঁহাকে বলিতে পারিবে? বাক্যও তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। আমরা হয়তো ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে পঠিত বা শ্রুত অনেক কথা শুকপক্ষীর ন্যায় আওড়াইয়া যাইতে পারি ; আমরা হয়তো ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা বলিয়া, বক্তৃতা করিয়া, সকলের সমক্ষে আমাদের ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিতে পারি, কিন্তু যদি ঈশ্বরকে বাস্তবিক হৃদয়ে একটীবার অনুভব করিতে চেষ্টা না করি ; যদি তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধন না করিয়া তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ প্রেমস্বরূপ অবগত না হই; ব্রহ্মজ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম না করি, ব্রহ্মতত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ অনুভব না করি, তবে সহস্র বক্তৃতা দ্বারা আমরা নিজেও ব্রহ্মের পথে যাইতে পারিব না, সুতরাং অপর কাহাকেও ব্রহ্মপথের পথিক করিতে পারিব না। "যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত অনুরাগ ও যত্ন না থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশবাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।"

ঈশ্বর সকলেরই আত্মারূপ উজ্জ্বল পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; কিন্তু আমরা যখন বিষয়-কোলাহলে মত্ত থাকিয়া ধনমানের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া তাঁহার ধীর সুমন্দ্র আহ্বানের প্রতি মনোযোগ প্রদান না করি, তখন তাঁহার আবির্ভাব আমাদিগের নিকটে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। যে সাধকের প্রাণ সেই স্নেহময়ী জননীকে না দেখিয়া আকুল হইয়া উঠে; যে সাধকের প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না; পরমেশ্বরের জন্য যাঁহার প্রাণের টান হইয়াছে, তাঁহারই নিকট সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমপুরুষ আপনার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। যখন আমরা প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব যে "ঐহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে, হায়রে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার," তখনই, আমরা জানিবার পূর্ব্বেই, তিনি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া শূন্যকে পূর্ণ করিবেন। আহা তাঁহার কি করুণা! আমরা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্ব হইতেই সেই দেবদেব আমাদের অভাব বুঝিয়া পৃথিবীকে

ধনধান্যে পূর্ণ রাখিয়াছেন, নদী সমুদ্রকে অগাধ জলের আধার করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে বায়ুর সাগরে বেষ্টিত রাখিয়াছেন। আবার যখন আমাদের আত্মাতে তাঁহাকে লাভ করিবার প্রকৃত অভাব উপস্থিত হইবে, তখন সেই ভক্তবৎসল পিতা কি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবেন? আমাদের তর্কের কি প্রয়োজন? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারি যে, তাঁহাকে হৃদয়ের সঙ্গে ডাকিলে তিনি স্বয়ং আপনাকে দিয়াও শূন্য হৃদয় পূর্ণ করেন কি না।

ব্রহ্মসাধন যদিও অত্যন্ত কঠিন, তথাপি আমাদিগের নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমাদিগের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মসাধন করিতে হইবে। যখন অন্যান্য বিদ্যা-শিক্ষা করিতে আমাদিগের কত পরিশ্রম, কত অধ্যবসায়, কত আত্মচেষ্টা আবশ্যক হয়, তখন যে বিদ্যা সকল বিদ্যার ভিত্তিভূমি, যে বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে আমা-দিগের কত-না পরিশ্রম, কত না অধ্যবসায় আবশ্যক। আমাদিগের চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বরের করুণা আমাদিগের সহায় হইবে। আমরা যদি ধর্ম্মপথে থাকিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি, তবে ধর্ম্মই আমা-দিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবেন। আমরা যদি ঈশ্বরের পথে আত্মচেষ্টায় একপদও অগ্রসর হই, তবে তিনি স্বয়ং আমাদিগের হস্তধারণ করিয়া সহস্রপদ অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাঁহার এমনই করুণা, আমাদিগের উন্নতির জন্য তিনি এমনই সচেষ্ট।

আমাদিগের এই ব্রহ্মোৎসব তাঁহার করুণার বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এমনও সময় গিয়াছে, যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে জাতিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ ভয়

ছিল—সময়ে সময়ে বিরোধী পক্ষের হস্তে প্রাণনাশের পর্য্যন্ত ভয় হইত। রামমোহন রায় তখন পণ্ডিত্‌দিগকে ব্রহ্মবিদ্যা কেবলমাত্র শ্রবণ করাইবার উদ্দেশে, ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত থাকিলেই তাঁহা-দিগকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। কিন্তু আজ আর এক কাল আসিয়াছে। আর সেই সঙ্কোচ ভাব নাই। এখন সকলেই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আকুল। ইহাতে সেই দেবাধিদেবেরই মহিমা. তাঁহারই করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার এই করুণার উপরে নির্ভর করিয়াই আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। আমাদের সমকালেই হউক, কি পরেই হউক, ইহার জয় হইবেই—ইহার অগ্নিস্রোতকে কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না। এখন যদি আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাদরে গ্রহণ করি, এবং জীবনে পরিণত করি, তবে আমরাই ইহার শুভফল প্রত্যক্ষ করিব ; যাঁহার প্রসাদে আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই পাইয়াছি, তাঁহার আদিষ্ট পথে চলিয়া আমরা আপনারাই কৃতার্থ হইব এবং ভবি-ষ্যদ্বংশের অনন্ত উন্নতিলাভের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া আনন্দচিত্তে ঈশ্বরকে অহরহ ধন্যবাদ করিতে থাকিব।

তাঁহার করুণা আমরা আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে কত-না প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদিগকে তিনি যে আত্মা দিয়াছেন এবং এই আত্মাকে যে তাঁহার সহবাসের অধিকারী করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার অল্প দয়া ? এই যে আকাশে আমাদিগের এই সৌর জগতের ন্যায় কত শত জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগের ক্ষুদ্রতা কেমন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়—তখন আমরা যেন কোথায় লুক্কায়িত হইয়া পড়ি। কিন্তু সকলের প্রভু সেই ঈশ্বরের

কৃপা লাভ করিলে "পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং" পঙ্গু যে, সেও উন্নতশৃঙ্গ পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিতে পারে। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্ হইয়াছি; তাঁহারি প্রসাদে তাঁহাকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি— ইহা অপেক্ষা আর কিসে আমরা মহান্ হইতে পারি? "তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমাদিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্যসুন্দর মঙ্গল পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?" তাঁহাকে যদি না জানিলাম, তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমাদের কি হইল? অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? আমাদিগের যতটুকু শক্তি আছে, সেই অনুসারেই যদি আমরা কঠোর অধ্যবসায় সহকারে সেই পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি, তাঁহাতেই প্রীতি স্থাপন করিতে শিক্ষা করি এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যত্নবান হই, তবে তাহাতেই আমাদিগের উন্নতি—অনন্তকালেও আমরা এই উন্নতির পথ হইতে বিচ্যুত হইব না। যে আত্মা তাঁহার কণামাত্র কৃপাবারি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহারই অনন্ত উন্নতি— সেই আত্মা সুন্দর হইতে সুন্দরতর বেশ ধারণ করিবে।

আমাদের সম্মুখে বসন্তকাল উপস্থিত। যাঁহার ইচ্ছাতে প্রভাতের উদীয়মান সূর্য্য আপনার কিরণচ্ছটায় পূর্ব্বগগনকে রঞ্জিত করে; প্রভাতের সুগন্ধবাহী সুশীতল সমীরণ যাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া ভূলোকের সহিত দ্যুলোকের

মিলনসাধন করে, তাঁহারই ইচ্ছাতে এই বসন্তকালে বৃক্ষ সকল পুরাতন জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্রপুষ্পে শোভমান হয়। এই জন্য বসন্তকালকে প্রকৃতির উৎসবকাল বলা যায়। আজ আমাদিগেরও উৎসব—ব্রহ্মোৎসব আসিয়াছে; এই ব্রহ্মোৎসব আমাদের সকলেরই হৃদয়ে আনন্দবিধান করিতেছে। আমরা এখন কি করিব? আমরা কি কেবল উৎসবপ্রাঙ্গনকে সুসজ্জিত করিব? না, তাহা নহে। আমাদিগের এই উৎসব বিশেষভাবে আত্মার উৎসব; এই কারণে আমরা আত্মাকেও আজ নূতন সজ্জায় সুসজ্জিত করিব। আমরা আজ পুরাতন বৎসরের জড়তা ও মলিনতা অন্তর হইতে দূর করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে চির-নূতন উৎসাহ ও চির-নূতন উদ্যমের দ্বারা পূর্ণ করিব। এইরূপ আত্মাকে, শরীরকে ও মনকে পুরাতনের মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে নূতনের জীবন্ত অবস্থাতে আনয়ন করিতে পারিলে, তবেই ব্রহ্মোৎসবের সার্থকতা হইবে।

আমরা জানি যে, ব্রহ্মের নামে সকলেই আজ নবোৎসাহে উৎসাহী হইবেন, নববলে বলীয়ান্ হইবেন; কেবল যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপারে নিতান্তই মত্ত থাকিয়া আত্মাকে মৃতপ্রায় ও অসাড় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাই আজ আনন্দরাশির দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন না। যেমন শুষ্ক বৃক্ষ পত্রপুষ্প-শোভিত হয় না, সেইরূপ শুষ্ক হৃদয়ও অমৃতময়ের অমৃতবারিতে সিক্ত না হইলে আর বিকসিত হয় না।

হে পরমাত্মন্! আজ এই উৎসবের দিনে হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও, আত্মাকে উন্নত করিয়া দাও। হে আনন্দস্বরূপ! আজ আমাদের সকলেরই আত্মা যেন তোমার সহবাস-জনিত

বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় আমাদের শরীরে বল দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও যে, তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া সুবিশাল এই ভারতবর্ষে এক সুদৃঢ়ভিত্তি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হই। আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর।

চন্দ্রতপন যাঁহার অহরহ আরতি করিতেছে, ভূলোক ও দ্যুলোক যে দেবদেবের চরণবন্দনা করিতেছে, যে দিন ভারতের প্রতি গৃহ হইতে তাঁহার আরতিগীত সকল উত্থিত হইবে, সেদিন কি শুভদিন! হে দয়াময়! এই দরিদ্র ভারতবর্ষে সেই শুভদিন সত্বরেই প্রেরণ কর—সেই শুভদিন প্রেরণ কর। আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্যাকুলতা বিষয়ক চতুর্বিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ বিবৃতি—অধ্যাত্মধর্ম্ম।*

[নির্ম্মল প্রাতঃকাল। শীতল বায়ু বহিতেছে। সূর্য্যপ্রকাশে সমস্ত সুপ্রকাশিত। পক্ষী সকল মধুর স্বরে কলরব করিতেছে। আজ ব্রহ্মোৎসব। উপাসকেরা দলে দলে কৃত্রিম উদ্যানপথ দিয়া উপাসনামণ্ডপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরে যথা সময়ে বন্দনগাথা গীত হইলে—]

আজিকার এই আনন্দ-কোলাহল কিসের জন্য? আমাদিগকে আজ কে এখানে আনয়ন করিলেন? কিসের বলে আমরা আকৃষ্ট হইয়া দুরদুরান্তর হইতে এখানে আগমন করিলাম? সুমধুর ব্রহ্মনামের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়াই আমরা আজ এখানে আসিয়াছি। পবিত্র ওঁঙ্কারের স্নেহপূর্ণ সুগম্ভীর ধ্বনি দিবানিশি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে; এতদিন সংসারের মোহময় কোলাহলে মগ্ন থাকিয়া তাহা শুনিতে পাই নাই—আজ তাহা শুনিতে পাইয়া আমরা ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়া আসিয়াছি। ইহারই জন্য আজ এত আনন্দকোলাহল। আমরা পরমমাতা বিশ্বপিতা হইতে দূরে দূরে বিচরণ করিতেছিলাম; আজ সম্বৎসর পরে তাঁহার অতুল স্নেহ অনুভব করিবার জন্য সকল ভ্রাতা, সকল বন্ধু একত্র মিলিত হইয়াছি, ইহাতেই আমাদের এত উৎসব, এত আনন্দ। আজ তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি; সূর্য্যের অন্তরে, শুভ্র আকাশের মাঝে, ওষধির মধ্যে, বনস্পতির মধ্যে, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে আজ তাঁহাকে দেখিতেছি; আবার আমাদের প্রতিজনের স্বীয় আত্মাতে এবং

---

* ১৮১৬ শক, ৬৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে যোড়াসাঁকোস্থ দ্বারকানাথভবনে বিবৃত।

সমাগত সজ্জনদিগের প্রশান্ত মুখশ্রীতেও তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি ; তাঁহাকে আজ ঊর্দ্ধেতে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে এবং অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি। এক সময়ে ভারতের ঋষিরা গহন অরণ্যের নিভৃত নিলয়ে সমাগত হইয়া তারস্বরে ব্রহ্মমহিমা গান করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, আর আজ আমরা এই সজন লোকালয়ে সম্মিলিত হইয়া তাহাই করিতেছি—কি আনন্দ ! কি আনন্দ !

যে সত্যধর্ম্মের নামে আমরা সমাগত হইয়াছি, এই সত্যধর্ম্ম নূতন-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নহে ; ইহা প্রতি মানবের চিরন্তন ধর্ম্ম, সমগ্র ভারতের অতি পুরাতন ধর্ম্ম এবং সমগ্র জগতের সনাতন ধর্ম্ম। ভারতের ঋষিরাই সর্ব্ব প্রথমে এই ধর্ম্মকে দেবভাষায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আমাদের আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই একই পরমেশ্বর। "যশ্চাসাবাদিত্যে যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি স একঃ" ঐ যিনি আদিত্যে, যিনি এই আত্মাতে, তিনি একই পর-মেশ্বর। তাঁহারা আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া সুমার্জিত বুদ্ধি দ্বারা উজ্জ্বল সহজ জ্ঞানে ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় সত্য লাভ করিয়া আমা-দের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমরা তাহা দেখিয়া শুনিয়া কৃতজ্ঞতাভরে অবনতমস্তক হইতেছি এবং সমস্ত জগৎ অবাক্-দৃষ্টিতে ভারতের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু সেই আত্মজ্ঞানী ঋষিদিগের সময়ে ভারতে পার্থিব সভ্যতারও অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল ; ক্রমে ভারতবাসী আর্য্যসন্তানেরা বিষয়বিলাসে নিমগ্ন থাকিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন এবং সত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। এই অধর্ম্মের পথ হইতে

ভারতবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তিনিও ধর্ম্মের দিকে সমস্ত ভারতের গতিমতি ফিরাইতে পারিলেন না। বরঞ্চ তাঁহার ব্রহ্মনামবিহীন উপদেশে যখন লোকেরা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিল, তখন কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তি হিতেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ঘোর নাস্তিকতা অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতিবিম্বও ভাল, এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা মূর্ত্তিপূজার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই মূর্ত্তিসংখ্যা দু-একটী করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে ৩৩ কোটী সংখ্যায় পরিণত হইল। ইহাতে যে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুফল হইয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্তু পরে ইহা যথেষ্ট কুফল উৎপাদন করিয়াছে। উপধর্ম্মের উপলক্ষে, দেবদেবীর উদ্দেশে কত-না নরবলি পশুবলি, কত-না ভীষণ কাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানেও মূর্ত্তিপূজা এই ভারতে বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কৃতবিদ্যমণ্ডলীর অনেকে বাল্যকাল হইতে মূর্ত্তিপূজাতে অভ্যস্ত থাকাতে তাঁহাদের সহজজ্ঞান মোহ-আবরণে আবৃত থাকে —তাঁহারা মূর্ত্তিপূজার বাহিরে যাইতে চাহেন না। আবার অনেকে মূর্ত্তিপূজায় আপনাদের জ্ঞান প্রীতি ভক্তিকে চরিতার্থতা লাভ করিতে না দেখিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া উপনীত হয়েন—তাঁহাদের অন্তরে অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মের প্রতি অতি সাংঘাতিক এক উপেক্ষার ভাব আসিয়া পড়ে; তাঁহারা প্রকৃত সত্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ভ্রমবশতঃ স্থির করেন যে, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পরকাল বলিয়া কোন পদার্থই নাই—লোকেরা কুসংস্কারবশতঃ মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর আখ্যা দিয়া পূজা করে, ধর্ম্ম ও পরকাল বালকদিগকে ভয়

দেখাইবার জন্য কল্পনা মাত্র। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান। মূর্ত্তিপূজা যখন তাঁহাদের জ্ঞানে সায় পায় না; ইহাতে যখন তাঁহাদের প্রেমভক্তি চরিতার্থ হয় না, তখন তাঁহারা যে মূর্ত্তিপূজাকে সত্যধর্ম্ম নহে ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে যে প্রকৃত সত্যধর্ম্মেরও প্রতি বিমুখ হইতে পারেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিলে আমাদের সে ভয় নাই যে, ইঁহাতে জ্ঞান সায় পাইবে না অথবা প্রেমভক্তি চরিতার্থ হইবে না। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি উপেক্ষার ভাব আসিতেই পারে না। তাঁহাদের জ্ঞানপ্রেমভক্তি যতই বিস্তৃত ও উদার আকার ধারণ করিবে, ব্রহ্মজ্ঞানও ততই উজ্জ্বল হইবে; প্রেম-ভক্তির সহায়তায় জ্ঞান সুবিমল হইবে এবং জ্ঞানের সহায়তায় প্রেমভক্তি একনিষ্ঠ ও দীপ্তিমান হইবে।

আমরা যখন চক্ষু নিমীলিত করিয়া আত্মার দিকে চক্ষু ফিরাই, তখন দেখি যে, আত্মাতে গভীর নিহিত একটী শ্রদ্ধাভাব আছে; সেই শ্রদ্ধাভক্তির সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে আমরা আমাদের পরমপিতা, পরমমাতা, পরমসখা পরমাত্মাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা দেখি যে, এই শ্রদ্ধাভাব কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; ইহা অনন্তস্বরূপের চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে চাহে। এই শ্রদ্ধাভক্তি-যোগে আমরা যেমন সেই মহান্ পরমেশ্বরকে আমাদের দয়াময় পিতা বলিয়া জানিতে পারি, সেইরূপ

আমরা আপনাদিগকেও তাঁহার সন্তান বলিয়া জানি এবং এই শ্রদ্ধাভক্তিযোগেই আমরা তাঁহাকে ভক্তবৎসল ও মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারি ও জগতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি।

এই শ্রদ্ধাভক্তি মিথ্যা পদার্থ নহে—ইহা অতীব সত্য পদার্থ। যে শ্রদ্ধাভাবের প্রাবল্যে এককালে বৈদিক ধর্ম্ম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল; যাহার বলে ঋষিরা সংসারের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া উপনিষদের সত্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; এই সেদিন পর্য্যন্ত যে ভক্তিভাবের ও প্রেমের স্রোতে চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গভূমিকে উন্মত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে সেই শ্রদ্ধাভক্তি মিথ্যা নহে; তাহা অতি গুরুতর সত্য এবং সেই শ্রদ্ধাভক্তি যে অনন্তপুরুষের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিতেছে, তিনিও পরম সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, পরম মঙ্গল-স্বরূপ মহান্ আত্মা।

পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যেমন দয়াময় পিতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তেমনি তাঁহাকে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়াও জানি। সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের আত্মাতে নীতিজ্ঞান নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পুণ্যলাভে এত স্পৃহা, এত চেষ্টা এবং পাপের প্রতি এত ঘৃণা। আমাদের নিকটে "কর্ত্তব্য" কথাটী কথামাত্র নহে; এই কথার এক গভীর আধ্যাত্মিক বল আছে। যে বীরহৃদয় পুরুষ সন্তোষের সহিত আপনার সমুদয় সুখসম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াও কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হয়েন তাঁহার সে বীরোচিত উৎসাহ কি কর্ত্তব্য কথামাত্র হইতে আসিতে পারে? এরূপ মনে করা ভ্রমের একশেষ। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের

সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনুষ্যের উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানও পাইয়াছি। আবার ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্যরূপে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে আমরা সদনুষ্ঠান করিলে আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হই এবং অসদনুষ্ঠান করিলে আত্মগ্লানিতে মর্ম্মদগ্ধ হইয়া যাই। এই সকল জ্ঞান ও ভাবকে চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট করিতে পারে কিন্তু ইহাদের বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাদের বীজ পরমেশ্বরই আমাদের আত্মাতে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।

যেমন চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানে ঈশ্বরকে দয়াময় পিতা এবং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া জানিতে পারিলাম, সেইরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এই জগতের অন্তরালে দেখি—

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

তিনিই ইহার স্রষ্টা, তিনিই ইহার রচয়িতা, তিনিই ইহার আশ্রয়! তিনি যেমন এই ব্রহ্মচক্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারই ইচ্ছাতে এই ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে "যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।" বিজ্ঞান আমাদিগকে এই মূলসত্য শিক্ষা দিতে পারে না—"প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে।" একমাত্র আত্মার সহজ জ্ঞানেই ইহা প্রতিভাত হয়। আমরা জানিতেছি যে, জগতের সকল বস্তুই সাবলম্ব ও অপূর্ণ। জড়শক্তির সহিত প্রাণনশক্তি, প্রাণনশক্তির সহিত আত্মশক্তি, এইরূপে জগতের সকল শক্তিই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ- পরস্পরের উপর অনেক

পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। এই সকল হইতে আমরা ইহাও জানিতেছি যে এই অপূর্ণ জগতের কোন বস্তুই আপনাপনি উদ্ভূত হইতে পারে না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রাকৃতিক কারণই দেখাইতে পারে, তাহার অকৃত কারণ দেখাইতে পারে না। কিন্তু আমাদের আত্মা কারণ হইতে কারণান্তরে গিয়া সেই আদি কারণ পরমেশ্বরে না পৌছিয়া থাকিতে পারে না। আমি যেমন সহজজ্ঞানে জানিতেছি যে আমার কৃত কার্য্যের প্রকৃত কারণ আমার ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট আত্মা, সেইরূপ জগৎকেও যখন আমরা আত্মাতে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখি, তখনই সহজেই জানিতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ সেই ইচ্ছাময় মহান্ আত্মা। তিনিই অকৃত কারণ, তিনিই আদিকারণ: তিনি "অকৃত, অমৃত পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি।"

ঈশ্বরকে যেমন আমরা জগতের স্রষ্টা বলিয়া জানিতেছি, তেমনি আবার তাঁহাকে জগতের রক্ষয়িতা ও নিয়ন্তা বলিয়াও জানিতেছি। তিনি এই জগতের মধ্যে যেমন জড়শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন, তেমনি প্রাণীদিগের দেহে প্রাণনশক্তিও প্রেরণ করিয়াছেন; তিনিই আবার মানবদেহে কি অপূর্ব্ব কৌশলে ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে স্থাপন করিয়া তাহাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। সেই পূর্ণজ্ঞান এই জগতে কেমন সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন; তাঁহারই অখণ্ড নিয়মে চরাচর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে বলিয়াই জ্যোতির্ব্বেত্তা গ্রহউপগ্রহের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন; উদ্ভিদতত্ত্ববেত্তা উদ্ভিদ সকলের জন্মজরার, জীবতত্ত্ববিদেরা জীবগণের প্রাণনকার্য্যের, এবং আত্মজ্ঞেরা আত্মতত্ত্বের নিয়ম সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন।

প্রাকৃতিক ঘটনা সকল আকস্মিক ভাবে ঘটিলে তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারিত না।

এস, ঈশ্বরকে এই প্রকারে আত্মার মধ্য দিয়া—আত্মার জ্ঞানের সকল অঙ্গের মধ্য দিয়াই দেখিতে চেষ্টা করি, তবেই সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া আপ্তকাম হইব এবং তাঁহাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত দেখিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে বাস করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হইব। এস বিস্ফারিতনেত্রে প্রভাতের সূর্য্যকিরণরঞ্জিত অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করি; মুদিতনেত্রে আত্মার অন্তরে দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ শুদ্ধস্বরূপ অবগত হই এবং উভয় হইতেই তাঁহার পরিপূর্ণ অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করি।

আজ এই উৎসবের মধ্যে অনেকে ভাবাবেশে তাঁহার আভাস পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে জ্ঞানের দ্বার দিয়া তাঁহাকে আত্মার মধ্যে স্থিরতর রাখিতে হইবে, ভাবাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে হইবে না; মহাবিনাশপ্রাপ্ত হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলে তাঁহাকে ভাবের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সুখের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, উৎসবের আনন্দকোলাহলে, বিপদের কশাঘাতে, সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে; মৃত্যুমাঝে তাঁহাকে অমৃতসোপান জানিতে হইবে—তবেই আমাদের অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ সার্থক হইবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি কৃপাদৃষ্টিতে যখন এই বঙ্গদেশের প্রতি চাহিয়াছ, তখন ইহার প্রতি আর বিমুখ হইও না। আমরা জানি যে আমরাই সংসারমোহে ও স্বকৃত পাপে মুগ্ধ হইয়া তোমা হইতে দূরে থাকিতে চাহি; কিন্তু হে সত্যস্বরূপ, ধ্রুবজ্যোতি সনাতন

ব্রহ্ম! তুমি আমাদের সেই মোহ সেই পাপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তোমার সহবাস লাভ করিতে দাও। "লয়ে যাও জননী মৃত্যু হতে অমৃতে"; তোমার প্রসন্নমুখ একবার আমাদের সম্মুখে প্রকাশ কর। তোমাকে ছাড়িয়া এ সংসারে পরিত্রাণ নাই, মুক্তি নাই। হে স্বপ্রকাশ! আমাদের নিকটে তুমি স্বীয় মহিমাতে প্রকাশিত হও—ইহাই অমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে অধ্যাত্মধর্ম্ম বিষয়ক পঞ্চবিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ বিবৃতি—অসতোমাসদ্গময়।*

অসতোমা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

হে সৎস্বরূপ, আমাকে অসৎ হইতে সৎস্বরূপে লইয়া যাও। চারি দিকে দেখিতেছি সকলই অসৎ। সকলই পরিবর্ত্তনশীল—কিছুরই স্থিরতা নাই। একটী গাছ কাটিয়া ফেলিলাম, কিছুদিন পরে দেখিলাম যে তাহা মাটী হইয়া গিয়াছে। এখন সেই গাছ কোথায় গেল? সকলেই বলিবেন যে গাছ নাই বটে, কিন্তু গাছের পরমাণু পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তাহা হউক, কিন্তু গাছ তো আর নাই; গাছের কিছুই স্থিরতা রহিল না। এই অস্থির গাছের মত এই পৃথিবীর সকলই অস্থির। একটী বাটী নির্ম্মাণ কর—দেখিতে হইবে যেন তাহা অচলের ন্যায় চির-

* ১৮১৩ শক, ৬২ ব্রাহ্মসম্বৎ, আশ্বিন মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজে সন্ধ্যাকালে বিবৃত।

স্থায়ী ; তাহা দেখিলে মনেই হইবে না যে এই বাটীও একদিন ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এমন বাটীও পড়িয়া গিয়া, যে সকল বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, অবশেষে তাহাতেই পরিণত হয় ; কেবল তাহাই নহে, সেই বালি চুণ কিছুই থাকে না, সমস্তই মাটী হইয়া যায়। এই সকল দেখিয়া কেমন বুঝা যাইতেছে যে জগতের কিছুরই স্থিরতা না। এই যে এমন সুন্দর অট্টালিকাবিশিষ্ট মহানগরী আছে, হঠাৎ যদি সেই লিস-বনের ভূমিকম্প উপস্থিত হয়—তখন এই সকল গর্ব্বময় ধূলিরাশি কোথায় থাকিবে ? বাহির হইতে শত সহস্র দুঃখ ক্লেশ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিয়াও যে রাজপ্রাসাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, হয়তো আজ সেই গর্ব্বিত রাজপ্রাসাদ সহসা হ্রদে পরিণত হইল। যেখানে পুষ্করিণী ছিল, তাহা হয়তো পর্ব্বতে পরিণত হইল। এইরূপ চিরপরিবর্ত্তন সম্মুখে দেখিয়াও কি আমাদের অন্তরে ভয় হয় না ? এমন কি মনে হয় না যে, আজ আমি আপনার সৌন্দর্য্য মদে, আপনার ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া আছি, কিন্তু আর কিছুদিন পরে সে সমস্তই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে, কাহারো কোন চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। এইরূপ ভয়সংকুল অনিত্য সংসা-রের মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য হে সৎস্বরূপ, হে ধ্রুব সত্য সনাতন পরব্রহ্ম, আজ তোমাকে সকাতরে ডাকিতেছি. তুমি এই অসৎ পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবী হইতে আমাকে তোমারি পথে লইয়া যাও।

কেবলি যে জড়জগতেই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহা নহে ; আমদের মনের ভিতরেও কি ঘোরতর পরিবর্ত্তনের কার্য্য চলি-য়াছে। সেই শৈশব কাল অবধি এই আজ পর্য্যন্ত, পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া বিন্দুপরিমিত মন কত সহস্র চিন্তার গুরুভার বহন

না করিয়াছে! আবার ভাবিয়া দেখিলে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয় যে, এইরূপ সহস্র সহস্র প্রকারের চিন্তা কেবল আমারই মনের বিশেষ ধর্ম্ম নহে কিন্তু এই জগতে যে কোটী কোটী লোক বাস করিতেছে, সকলেরই ইহা সাধারণ ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কেমন আশ্চর্য্য! কিন্তু এই চিরপরিবর্ত্তনের মধ্যে, এই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি অপরিবর্ত্তনীয় একমাত্র কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না? এই শুধুই পরিবর্ত্তনের সম্মুখে দাঁড়াইতে হৃদয় কি কম্পিত হয় না এবং কম্পিত হইয়া কি এক "অতি ধীর গম্ভীর আপনে আপনি স্থির" মহান্ পুরুষের প্রতি ধাবিত হয় না?

বাস্তবিক কি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের পশ্চাতে অপরিবর্ত্তনীয় কেহ নাই? এই দেখিতেছি আমার শরীর—ইহার না জানি কতই পরিবর্ত্তন হইতেছে! আজ এখানে ক্ষত, কাল ওখানে ক্ষত, আজ এই অসুখ, কাল ওই অসুখ; প্রতি পলে পলে, প্রতি মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে এই আমাদের ক্ষণভঙ্গুর শরীরে যে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে? কিন্তু এই শরীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে "আমি"রও কি পরিবর্ত্তন হইতেছে? এই "আমি" টুকু স্থির রহিয়াছে বলিয়াই আমার শরীর এত বিঘ্নবিপত্তি, এত পরিবর্ত্তনের মাঝখানেও "আমার" শরীররূপে বিদ্যমান এবং এই "আমার"শরীর আছে বলিয়াই তাহাতে হিরণ্ময় কোষ আত্মা বিশুদ্ধ পবিত্র সেই পরব্রহ্মের আসনরূপে অবস্থান করিতে পারিয়াছে। যদি শরীরের ন্যায় "আমি"ও পরিবর্ত্তশীল হইত, তাহা হইলে কোথায় এই সৌষ্ঠবসম্পন্ন মনুষ্যদেহ থাকিত, আর কিরূপেই বা জগতে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইত? তখন এক মুহুর্ত্ত পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম,পরমুহূর্ত্তে আর সে আমি থাকিতাম না—তখন কোন্

আমি বাস্তবিক আমি, ইহা লইয়াই অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইত ; ইহার মীমাংসা হইত না—উন্নতির কিছুমাত্র পথ থাকিত না।

সেইরূপ এই যে অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র লইয়া বিশ্বচরাচর অবিশ্রাম ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, কত শত পরিবর্ত্তন এই জগতের উপর দিয়া নিয়তই চলিয়া যাইতেছে ; যদি এই সমস্ত বিশ্ব সেই ধ্রুব সত্য মহান্ পুরুষের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে আমরা সৃষ্টি-স্থিতির শোভন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মহাপ্রলয়ের এক ভীষণ করাল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। যদি সমস্ত জগৎ সেই মহান্ পুরুষের সত্য-নিয়মের একসূত্রে না গ্রথিত হইত, তাহা হইলে আমরাই কোথায় থাকিতাম ? সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুসারে চলিত। হয়তো এগ্রহ ওগ্রহে পড়িতেছে, পৃথিবীতে হয়তো চন্দ্র পড়িতেছে ; পৃথিবী হয়তো চন্দ্রকে লইয়াই সূর্য্যের ভিতরে পড়িতেছে। একটী নিয়মেরও বন্ধন থাকিত না—কেনই বা থাকিবে ? তাই বলি যে এই সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এক অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য রহিয়াছেন।

আরও বলি। কোন স্থানে যদি কতকগুলি পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষিত দেখিতে পাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিব যে, এই-গুলি কোন সজ্ঞান মনুষ্য কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে রক্ষিত। আবার যদি সেই পুস্তকগুলি খুলিয়া দেখি যে, তাহার মধ্যে ভাষা ভাব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ঐক্য আছে, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিয়া লই যে, সেই সকল পুস্তক একই জ্ঞানের দ্বারা লিখিত। এখন এক বার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে এই জগতের পশ্চাতে কোন সত্য পুরুষ নিয়ন্তা আছেন কিনা। প্রকৃতির কোন্ দিকে দেখাইব ? যে দিকে দেখাইতে যাই, সেই দিকেই

আমার দেবতার হস্ত দেখিতে পাই। এই যে সন্ধ্যাকাল, এই সন্ধ্যা কাল কি প্রতিদিনই ফিরিয়া আসে না? প্রতিদিনই কি সন্ধ্যা প্রশান্তির নব নব বেশ ধারণ করে না? প্রতিদিন সন্ধ্যা সেই গভীর প্রশান্ত ভাব সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার এই প্রশান্ত ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করেন। প্রতিদিন প্রভাতে দেখ সূর্য্য উদয় হইবেই হইবে; প্রতি গ্রীষ্মে উত্তাপ হইবেই; প্রতি শীতকালে শীত হই-বেই; এবং প্রতি বৎসর শীত গ্রীষ্ম ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া যাইবেই। এই জগতের বিচিত্রতার মধ্যে, পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এমন অপরিবর্ত্তনীয় সুনিয়ম সংস্থাপিত দেখিতেছি, ইহা দেখিয়াও কি প্রকারে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এই সকল নিয়মের স্রষ্টা এক জ্ঞানস্বরূপ সত্য সনাতন পুরুষ নাই? এক সামান্য কৌশল দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যাই, আর হে বিশ্ববিধাতা, তোমার এই অনন্ত কৌশল ময় সৃষ্টি দেখিয়াও আমাদের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়? হে সত্য-স্বরূপ, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে আমাকে তুমি অসৎ হইতে ডাকিয়া লও; আমার চক্ষু এই পরিবর্ত্তনশীল জগতেই পড়িয়া থাকে—তুমি সেই চক্ষু, সৎস্বরূপ তোমার দিকে ফিরাইয়া দাও; আমার আত্মায় জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমি তোমাকে জানিতে পারি।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, আমাকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও। এখন জানিয়াছি যে তুমি আছ, এবং সকলেই তোমারি নিয়মে চলিতেছে। এখন তোমার অভয়পদ লাভ করি-য়াছি, তাই হে দয়াময়, তোমাকে আকুলপ্রাণে ডাকিতেছি যে তুমি আমাকে অজ্ঞানের মোহ-অন্ধকার হইতে শুভ্র বিমল জ্যোতির

নিকটে লইয়া যাও। বাহিরের অন্ধকার হইতে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি, আমি আপনার অন্তরের অন্ধকার হইতে বড়ই ভীত হইতেছি। বাহিরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য তুমি চন্দ্রসূর্য্য দিয়াছ; এমন কি, ঘোর অমানিশারও অন্ধকার, অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহনক্ষত্র তোমারি আদেশে দূর করিতে থাকে। কিন্তু অন্তরের অন্ধকার দূর করিবার সামর্থ্য গ্রহনক্ষত্রের নাই, চন্দ্রেরও নাই, সূর্য্যেরও নাই; একমাত্র জ্যোতির জ্যোতি, তুমি ভিন্ন সে অন্ধকার আর কেহই দূর করিতে পারিবে না। তুমি আমাদের চিরন্তন ব্রহ্ম, তুমি আমাদের গৃহদেবতা, তুমি আমাদের অন্তরের দেবতা; তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার অনন্তজ্ঞানের পূর্ণ-জ্যোতির কণামাত্র দিয়া আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। আমরা প্রতি মুহুর্ত্তেই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি; প্রতি মুহুর্ত্তেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হইতেছে; কিন্তু তুমি জগতের মঙ্গলময়ী চিরঅধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছ জানিয়া আর এই শরীরের মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করি না। আমি যেমন অজ্ঞান হইতে ভীত হই, সেইরূপ আত্মার মৃত্যু হইতে অতিমাত্র ভীত হই। যখন দেখি যে তুমি আমাদিগের আত্মাতে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছ এবং যখন দেখি যে তুমি আমাদিগকে তোমার পবিত্র স্বরূপের নিকট যাইবার অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ, তখনই ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া পড়ি, তখনই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে যে কি গুরুতর ভারই আমাদের মস্তকের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে। কতবার হৃদয় এই স্বাধীনতার ভাব হারাইয়া ফেলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুস্বরূপ রিপুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরাস্ত হইয়া মৃত্যুর ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। আজ

যখন সেই কথা ভাবি, আজ যখন দেখি যে, আমরা অমৃতের পুত্র হইয়াও, অমৃতের দ্বার মুক্ত দেখিয়াও, না বুঝিয়া মৃত্যুর সহিত ক্রীড়া করিয়া কত সময় বৃথায়ই অতিবাহিত করিয়াছি, তখন হৃদয় আর থাকিতে পারে না—প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

হে অমৃতস্বরূপ! এখন আর কাহার নিকটে যাইব? তোমারি চরণে আসিয়াছি; তুমি সঞ্জীবনী সুধা দ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত কর। আমার হৃদয়ে এমন বল প্রেরণ কর যে, আর কখনও যেন মৃত্যুর প্রলোভনে না পড়ি, সর্ব্বদাই তোমাকে চক্ষের সমক্ষে রাখিতে পারি, এবং তোমার নাম জগতে প্রচার করিয়া যাহাতে আমার ন্যায় অন্যান্য সকলকেও মৃত্যুপাশের বন্ধন-ক্লেশ দেখাইয়া দিয়া মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা প্রদান কর। আমার শরীর মন ও আত্মাকে নির্ব্যাধি কর। আমার প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে অসতোমাসদ্গময় বিষয়ক ষড়বিংশ বিবৃতি সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ বিবৃতি—বিবেক ও বৈরাগ্য।*

আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে?
হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার?
ঐহিকের সুখ যত জানি তার কাজ নাই সে সুখে সে ধনে;
হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার?

আমি সেই হৃদয়ের প্রিয়তমকে কোথায় ছাড়িয়া আসিয়াছি। আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। কে তাঁহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতে পারে? হে প্রিয়তম, তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দূরে রহিয়াছ? আকাশ, তুমি আমার প্রিয়তমকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, ফিরাইয়া দাও। চন্দ্রসূর্য্য তোমরা আমার তমোনাশক হৃদয়ের চন্দ্রকে কোথায় লইয়া গিয়াছ, ফিরাইয়া দাও; তারকাগণ, তোমরাই বা সেই নয়নতারাকে কোথায় রাখিয়াছ, একবার দেখাইয়া দাও। আমি তাঁহাকে কেবল একটীবার মাত্র দেখিতে চাই। জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরকে হারাইয়া আমার এই ছার জীবন রাখিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতেও চাই না। যদি এই জীবন সেই প্রাণনাথের পবিত্র চরণে সমর্পণ কবিতে না পারিলাম, তবে আমার এই তুচ্ছ অতিতুচ্ছ জীবনে কি প্রয়োজন? তাঁহাকে যদি এই জীবনে না দেখিতে পাইলাম, তবে আর এ জীবন রাখিতে চাই না—আমার মৃত্যু হউক।

---

* বলুহাটী ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৩ শক ৯ই পৌষ সায়ংকালে বিবৃত।

এই মর্ত্ত্যধামের যত কিছু সুখ, সকলই জানি, আমার সে সুখে প্রয়োজন নাই। এখানে সুখ কোথায়? সকলেই সুখের প্রত্যাশায় এই সংসার-মরুভূমির মধ্যে অনবরত দিশাহারা লক্ষ্যশূন্য হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে যে তাহারা সুখের অন্বেষণে বাল্যকাল হইতে ব্যস্ত এবং এখন তাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তথাপি এখনও সুখ খুঁজিয়া পায় নাই। এই মর্ত্ত্যধামের মধ্যে কি কেবল ভোগবিলাসেই সুখ হয়? তাহাই যদি হইবে তবে প্রচুর সম্পত্তিশালী লোকে ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকিয়াও আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয় কেন? জানি এই মরণশীল জগতের যে সকল বস্তু, তাহাতে সুখ নাই—সুখ নাই। সুখের উৎসের নিকটে, অমৃতের প্রস্রবণের নিকটে যাইলে তবে সুখ পাইব—তবে বিন্দুপরিমিত অমৃত পাইয়াও অমর হইতে সক্ষম হইব। "ঐহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে।"

আমি এখন চাই কেবল সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরকে; আত্মা অন্য কিছুতেই তৃপ্তি মানিতেছে না। আমি আমার অন্তরসখা প্রাণনাথ পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি কোথায়? কোন্ স্থানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন? কোথায় যাইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত বিশ্বচরাচর সুমন্দ্র গম্ভীর ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর দিতেছে—

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

আত্মাই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ আসন। চন্দ্রসূর্য্য বলিতেছে "আমাদিগের নিকটে অতি অল্পই জানিতে পারিবে, তুমি আপনার আত্মার অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, তবেই সফলকাম

হইবে।" অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রগণ সেই দেবাধি-দেবের মহৎ যশ ঘোষণা করিয়াও বলিতেছে "আমাদিগের নিকট অতি অল্পই জানিতে পারিবে; তুমি আপনার আত্মার আসনে নিস্তব্ধ সমাসীন সেই পরমদেবকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবেই সফলকাম হইবে।" আত্মাই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ আসন।

কিন্তু সেই আত্মার আত্মাকে, আত্মাতে সমাসীন দেখিবার জন্য দুইটী উপায় আবশ্যক। সেই দুইটী উপায় বৈরাগ্য ও বিবেক। এই দুইটী উপায়ের সাধন না করিলে আত্মজ্ঞান কিছুতেই উজ্জ্বল হইতে পারে না। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বৈরাগ্য ও বিবেক এই দুইটী উপায়ই বা কি প্রকার এবং ইহাদিগের সাধ-নই বা কি উপায় অবলম্বন করিলে হইতে পারিবে।

প্রথম বৈরাগ্য—বৈরাগ্য কি? বৈরাগ্যের অর্থ রাগরাহিত্য অর্থাৎ আসক্তিরাহিত্য। স্ত্রীপুত্র, বিষয়বিভব প্রভৃতি কোন ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি, তদ্গতচিত্ততা না থাকাই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য দুই প্রকারে দেখা দিতে পারে—(১) সংসারত্যাগ, (২) সংসারে স্থিতি। ইহাদিগের মধ্যে অনাসক্ত হইয়া সংসারে স্থিতিই অধিকতর প্রার্থনীয়। হৃদয়ের মধ্যে যদি প্রকৃত বৈরাগ্য আসিয়া থাকে, তবে সংসারে থাকিলেও অনাসক্তি থাকিতে পারে; আর যদি হৃদয়ে বৈরাগ্য না আসিয়া থাকে, তবে সংসারেই থাকি আর অরণ্যেই থাকি, আমার পক্ষে উভয় স্থানই প্রলোভনসঙ্কুল। উভয়ের মধ্যে গৃহে থাকিয়া গার্হস্থ্য প্রতিপালন করাই শ্রেয়স্কর। কারণ গৃহস্থ হইয়া পরোপকার প্রভৃতি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইহারি জন্য সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন—

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।

কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অতএব আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর; কারণ পুরুষ আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

এতক্ষণে বুঝিলাম যে বৈরাগ্য কি, না হৃদয়ের অনাসক্তভাব। এখন দেখা যাউক যে বিবেক কি প্রকার। আত্মার অন্তরে এমন একটী আলোক আছে, যাহা শত সহস্র কুটিলতা ভেদ করিয়াও বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ইহা সত্যের জ্যোতি। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহার আত্মাতে এই সত্যের জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরবিরাজিত। সকল বিষয়েরই দুইটী দিক আছে— এক ভাব, দ্বিতীয় অভাব। আত্মার ঈশ্বরস্পৃহারও দুইটী দিক আছে। বৈরাগ্য ইহার অভাবের দিক এবং বিবেক ইহার ভাবের দিক। বৈরাগ্য আসিয়া বলিয়া দিল যে সংসার অনিত্য; মৃত্যুর পরে সংসার আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না, অতএব সংসারে আসক্ত হওয়া মনুষ্যের উপযুক্ত নহে। আত্মা যখন বৈরাগ্যের এই বাক্যে সংসারের অনিত্যভাব উপলব্ধি করিল, সংসার যখন আর আত্মার তৃপ্তিস্থান হইতে পারিল না, তখন আত্মার এক মহা অভাব আসিয়া পড়িল। এতদিন সংসারই তাহার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, কিন্তু এখন বৈরাগ্য আসিয়া এই অবলম্বন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দেওয়াতে আত্মার অত্যন্ত ব্যাকুলতা আসিয়া পড়িল;—সে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয় লইবে, কাহার নিকটে যাইলে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, এই সকল চিন্তায় আত্মা আকুল হইয়া পড়িল। তখন বিবেক আসিয়া তাহাকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে,

"এত আকুল হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; মনুষ্যের, সংসারের মঙ্গলময়ী জননীকে ছাড়িয়া, কেবল সংসারে পরিতৃপ্তি হইতে পারে না ; মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর সুতরাং ইহা নশ্বর ধূলিরাশিতে চির-কাল তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাহার তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত সেই আনন্দধাম 'জরা নাহি, শোক নাহি, মরণ নাহি যে লোকে'। এখন হইতে আর সংসারে আসক্ত থাকিও না ; সংসারে নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থান করিয়া সেই শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর পরমপুরুষের প্রেমমুখ দেখিতে থাক—তোমার শোকতাপ হৃদয়-ভার সমস্ত দূর হইয়া যাইবে।" বৈরাগ্য অভাব আনয়ন করে, বিবেক সত্যের বিমল জ্যোতি দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়।

সেই বৈদিক কালে, যখন আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ নূতন নূতন স্থান অধিকার করিয়া, নূতন নূতন জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া সংসার-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে কতকগুলি উন্নতমনা ঋষি সংসারে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অরণ্যে যাইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং সাধারণের মধ্যে সং-সারাসক্তি প্রবল দেখিয়া ও তাহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করানো অসাধ্যসাধন বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, যাঁহারা সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমুদয় মানমর্য্যাদা বিষয়বিভব প্রভৃতি নানা ভোগসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে বাস করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার, উপনিষদে অধিকার ; তাঁহারা আদেশ করিলেন যে, "অরণ্যে তদধীয়ীত" উপনিষদে নিহিত ব্রহ্মোপদেশ অরণ্যেই পড়িতে হইবেক। কিন্তু সেই বৈদিক কালের অনেক পরে, যখন জ্ঞানের অধিকতর চর্চ্চা হইল,

যখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মবাদীগণ ঈশ্বরের সহিত সংসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক। তাঁহাতেই যোজিতচিত্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎ-কালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের এক অতি মহান্ আশা আছে এই যে, এমন দিন আসিবে, যখন এই মর্ত্ত্যধামবাসী লোকেরা দণ্ডভয়ে নহে, কিন্তু আপনাদিগের হৃদয়ের প্রীতিতে ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া এখানেই স্বর্গ আনয়ন করিবে। এই আশা কিসের উপরে স্থাপিত? ইহা একটী সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা

প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। ব্রহ্ম-বিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ, কি কালবিশেষ কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই।” এক কথায় এই, সকলেরই অন্তরে বৈরাগ্য ও বিবেকের মূল নিহিত আছে—তাহাতে জলসিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে বৃক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ জলসিঞ্চন করা ব্রাহ্মসমাজের এক প্রধান কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজের ইহা কর্ত্তব্য বটে ; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কি এই কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজ যদি এই কর্ত্তব্য সাধনে হৃদয়ের সমুদয় শক্তি অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার আজ কত না উন্নতি দেখিতাম। ব্রাহ্মসমাজের জন্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমেই নেতৃত্বপদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হয়—নহিলে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসাধনের প্রথম উপায় বৈরাগ্য হইতে বহুদূরে পড়িতে হইবে ; এবং বৈরাগ্য না আসিলে প্রকৃত বিবেকের পরিবর্ত্তে মায়াবিবেক আসিয়া এই নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষাকে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করে। নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক প্রভৃতি সাং-সারিক বিষয়ে তত অনিষ্টকর না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের, কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে, সকল ধর্ম্মসমাজেরই ইহা গুরুতর অনিষ্ট সাধন করে। সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে সুসংযত করিয়া না রাখিলে নেতৃত্বের তুষ্ট আশা প্রভৃতি সাংসারিক ধূলিরাশি সেই দৃষ্টিকে মলিন করিয়া দিবে এবং পারমার্থিক বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিবে না। ব্রহ্মের প্রতি হৃদয়ের প্রীতিকে উন্নত করিব এবং ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য বলিয়াই ধর্ম্ম কার্য্য করিব। কর্ম্ম-ফলের প্রতি আমাদিগের উৎকণ্ঠা যেন না থাকে। আমরা ভাল কাজ ভাল বলিয়াই করিব, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের সম্পৎ

হইবে কি বিপদ্ হইবে, সেদিকে যেন আমাদের আদৌ লক্ষ্য না থাকে—কর্ম্ম করিব আমরা, ফল দিবেন ফলদাতা সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর। তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা—তিনি এমন ফল দিবেন, যাহা অনন্তকালের জন্য আমাদের মঙ্গলজনক হইবে; অতএব মাতৃক্রোড়ে শিশুসন্তানের ন্যায় আমরা যেন সেই প্রেমময়ী জননীর প্রেমমুখ দেখিতে থাকি এবং নির্ভয়ে তাঁহার প্রিয়কার্য্য শুভকর্ম্ম সম্পাদনে রত থাকি। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণ ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল সাধন করিতে থাকিলেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এবং তাহা না করিয়া সাংসারিক ফলকামনায় হৃদয়কে পূর্ণ করিলেই ব্রাহ্মসমাজের অবনতি।

হে পরমাত্মন্, তুমি যেমন আমাদিগের হৃদয়ের দেবতা, তেমনি তুমি ব্রাহ্মসমাজেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি আমাদিগের পাষাণ হৃদয় বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ প্রীতি ঢালিয়া কোমল কর। তুমিই একমাত্র সকলের নিয়ন্তা, তুমি আমাদিগের সকলেরই হৃদয়ে এমন ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রকাশ করাইয়া দাও যে, আমরা সকলেই যেন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতিসাধন করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজ হইতে তোমাকে জানিতে পারিয়া যে দৈবঋণ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের জীবনকে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনে পরিণত করিয়া সেই ঋণের অন্ততঃ বিন্দুমাত্রও যেন পরিশোধ করিতে পারি; আমরা যেন কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্রাহ্মসমাজকৃত প্রভূত উপকার স্মরণ করিয়া তাহার পর্ব্বতের তুল্য গুরুভার বহন করিতে যত্নবান হই। আমরা অতি দুর্ব্বল; তুমি দুর্ব্বলের সহায়—তুমি আমাদিগের এই শুভসংকল্পে বল প্রেরণ কর

এবং আমাদিগের শরীর, মন ও আত্মাতে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে বিবেক ও বৈরাগ্য বিষয়ক সপ্তবিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ বিবৃতি—প্রায়শ্চিত্ত।*

আজ বৎসরের শেষ দিবস। আজ পুরাতন বৎসর অতীতের শ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে; নূতন বৎসরের জন্মদান করিয়া আজ পুরাতন বৎসর আপনার সুখ দুঃখের সহিত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাই আজ আমরা পুরাতন বৎসরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমরা এখানে নূতন বৎসরের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে আসি নাই, কিন্তু পুরাতন বৎসরের মৃত্যুর জন্য রোদন করিতে আসিয়াছি। মনুষ্যের জীবন সুখ ও দুঃখে গঠিত, হর্ষ ও শোকের বিচিত্র উপাদানে বিরচিত, সম্পদ ও বিপদে লালিত পালিত। কিন্তু আজ এই পুরাতন বৎসরের সমাধিমন্দিরে দাঁড়াইয়া সুখ, হর্ষ, সম্পদ্ সকলই ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল দুঃখশোক হৃদয়ে অবিরল ক্রন্দনধ্বনি জাগাইতেছে। এই শ্মশানক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া,

*১৮১২ শক ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ, ৩০ চৈত্র সায়ংকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে বিবৃত।

শ্মশানের ভীষণতম সর্ব্বসংহারক চিতাগ্নি দেখিয়া কে আর হাস্যরসে মগ্ন থাকিতে পারে? কাহার হৃদয় না বিবেক ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া আসে? কাহার অন্তরে না পরকালের ভীষণ রহস্যময় ভাব সবেগে আঘাত করিতে থাকে? একবার এই সম্বৎসরের সন্ধ্যাকালে দাঁড়াইয়া দেখ যে, আমাদিগের চারিপার্শ্বে মৃত্যুর পাশ কত প্রকারে জড়াইয়া আসিতেছে! একটী সুদীর্ঘ বৎসর কি বৃথায়ই কাটাইলাম! বৎসরের প্রারম্ভে কোথায় ভাবিয়াছিলাম যে সংসার-মরুভূমিকে জীবন প্রদান করিয়া উর্ব্বর করিব; প্রেমবারি প্রদান করিয়া সরস করিব; শান্তিবীজ রোপণ করিয়া শস্যশ্যামল করিব, কিন্তু পারিলাম কৈ? একটী একটী করিয়া ৩৬৫ দিনই চলিয়া গেল, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম কৈ? আজ দেখি জীবনের পরিবর্ত্তে শ্মশানের চিতাভস্ম আনিয়াছি; প্রেমাশ্রুর পরিবর্ত্তে শোকাশ্রু আনিয়াছি। জীবন ও প্রেম কোথায় ফেলিয়া দিয়াছি, তাহার কি কিছু ঠিক আছে? কি লইয়া সংসার মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করিব? স্বয়ং জরা মৃত্যু ব্যধি দ্বারা অভিভূত হইয়া পরকে ভাল করিতে পারিব কি প্রকারে? সম্বৎসরের প্রারম্ভে যিনি আমাদিগের নিকট প্রেম ও জীবন জগতে বণ্টন করিয়া দিবার নিমিত্ত গচ্ছিত রূপে রাখিয়াছিলেন, আজ সম্বৎসরের শেষে সেই প্রেমদাতা পিতার নিকটে যাইয়া বলিতে হইবে যে "পিতা, তুমি যে আমাদিগকে অমৃত দিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তে মৃত্যু আনিয়াছি; তুমি যে জ্যোতি দিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধকার আনিয়াছি; তুমি যে পুণ্য দিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তে পাপ আনিয়াছি।" ধিক্ আমাদিগকে। হায় আমরা সমুদয় হারাইলাম, তবুও আমাদিগের চেতনা হইল না?

আমাদিগকে দারুণ পাপযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তথাপি আমরা কি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব না? ঔষধ প্রস্তুত থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিব না? আমাদিগের যিনি পিতা, আমাদিগের যিনি মাতা, যিনি সখা, যিনি তপ্ত হৃদয়ের শান্তিবারি — তিনি যেমন শত শত শারীরিক ব্যাধির জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ এই গুরুতর মানসিক পাপব্যাধির জন্যও ঔষধ রাখিয়াছেন। যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর, চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না; যিনি সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, সূর্য্য যাঁহার শরীর, সূর্য্য যাঁহাকে জানে না; আর যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া আত্মাতে নিয়তই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, আত্মা যাঁহার হিরণ্ময় কোষ, আত্মা যাঁহাকে জানে, তিনি যদি বিশ্বচরাচরকে নিয়মিত করিতে পারিলেন; তিনি যদি একটী কীট পর্য্যন্ত আহার প্রাপ্ত হইল কি না দেখিতে পারিলেন, তবে তিনি কি মনুষ্যের আত্মার মর্ম্মভেদী দাহযন্ত্রণা জানিতে পারিবেন না? এবং জানিয়া কি তাহার প্রতীকারক ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ইহা কল্পনাতেও স্থান পাইবার যোগ্য নহে। এই দারুণ মর্ম্মদাহের ঔষধ অনুতাপ— অনুতাপ—যথার্থ হৃদয়ের অনুতাপ। এই অনুতাপই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। আমরা যদি আমাদিগের পিতামাতাকে অন্তরের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তবে তাঁহাদের আদেশের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে কি আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না? সেইরূপ যে করুণাময়ের করুণায় আমরা জগতের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া এত আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি; যাঁহার প্রসাদে

পিতামাতাকে প্রাপ্ত হইলাম, তাঁহার আদেশের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, যদি তাঁর সুন্দর নিয়মের মধ্যে বিঘ্ন আনয়ন করি, তবে আমাদিগের হৃদয়ে আরও কত না গুরুতর আঘাত লাগিবে! তাহা যদি না লাগিবে—তবে আমরা কৃতঘ্ন সন্তান---আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য নহি; আমাদিগের নিস্তার নাই—কৃতঘ্নস্য নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।

যিনি আমাদিগের দয়াময় পিতা, যিনি আমাদিগের করুণাময়ী জননী, তাঁর কাছে যদি পাপতাপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া আমরা উপস্থিত হই এবং যদি ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিয়া বলি যে "জননি, আমাকে মার্জনা কর; আমি শতবার তোমার আদেশের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া পাপ করিয়াছি কিন্তু আর করিব না, তুমি আমাকে ক্রোড়ে লও; তুমি আমার হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর;" যদি সেই অখিলমাতার নিকট এইরূপ কাতরভাবে একটীবারও প্রার্থনা করি, তথন প্রত্যক্ষ দেখিব যে তিনি আমাকে সহস্র মলিনতায় আবৃত থাকিলেও ক্রোড়ে না লইয়া থাকিতে পারিবেন না। এই কঠোর সংসার অরণ্যে যদি তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়া আমার লালন পালনের জন্য, আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রতিনিধি পিতামাতার হৃদয়ে এত স্নেহ, এত মমতা, এত ভালবাসা প্রেরণ করিলেন, তবে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা হইয়াও কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? সাধক যদি বাস্তবিক ব্রহ্মপিপাসায় আকুল হয়েন, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং আপনাকে দিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

পাপী ব্যক্তির পক্ষে অনুতাপই সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মকে পাইবার

প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোপান। অনুতাপ ব্যতীত পাপের আর কি মহৌষধ হইতে পারে? ভারতের পুরাতন বহুদর্শী ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে পাপের পর অনুতাপ যেমন পবিত্রতার পথ খুলিয়া দিতে সক্ষম, এমন আর কিছুই নহে—শরীর-শোষক যাগযজ্ঞও নহে কিম্বা কোন পুণ্যবান্ মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিবিশেষও নহে। তাই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈতৎ কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ॥ মনু

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়; এমত কর্ম্ম আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

"মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ডভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন; দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।" ইহা দেখিয়াও কি ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিবেন না? মনুষ্য যদি আর পাপাচরণ না

করিয়া সাধুপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলেও কি তাহার আত্মাতে পুনরায় পবিত্রতা ও শান্তি বর্ষিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। আমরা আমাদের প্রতিজনের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি দশ বৎসর বয়সে একটী মিথ্যা কথা বলি এবং তজ্জন্য অনুশোচনা পূর্ব্বক ভবিষ্যতে আর কোন রূপ পাপাচরণ না করি, তবে যে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ সখার সখা, যে ঈশ্বরকে ভক্তমাত্রেই শরণাগতবৎসল বলিয়া জানে, তিনি কি সেই একটী পাপের জন্য শান্তিবারি আর একেবারে প্রদান করিবেন না? হৃদয় কি এই কথায় কখনও সায় দিতে পারে যে, যিনি অনন্ত প্রেমের আধার, সেই অমৃত স্বরূপকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলেও দৈবাৎ মৃত্যুপাশের একটী রজ্জুতে পদার্পণ করিয়াছি বলিয়া তিনি আর আমার দুর্দ্দশা দেখিবেন না? মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া অমৃত দুয়ারে লইয়া যাইবেন না? হে দেব, হে পিতা, আমরা "শতবার পড়ি ভুলে" তুমি "শতবার লও তুলে।" তাই যদি না হইবে তবে তোমাকে পিতা বলি কেন? তবে তোমাকে করুণাময়ী জননী বলিয়া ডাকি কেন? তবে তোমাকে প্রাণের প্রাণ, সখার সখা বুঝিয়া কি প্রয়োজন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হে এই অনুতাপ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশের বিপক্ষে কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া, তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পরিচালক নিয়মের বিঘ্ন করিয়াছি বলিয়া তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা—তাঁর নিকটে আত্মনিবেদন করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা—ইহাকেই পাপের শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিগণ উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে জলদগম্ভীরস্বরে ধ্বনি উঠিল—

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষাং অশেষাণাং ব্রহ্মানুস্মরণং পরম্॥ বিষ্ণুপুরাণ।

প্রায়শ্চিত্তবিধি অনেক প্রকারই আছে কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মানুস্মরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ধন্য সেই ঋষি, যিনি অনুতাপের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং যাঁহার মুখারবিন্দ হইতে এরূপ সুমধুর বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি আমাদের শাস্ত্রে অনুতাপই পাপের প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে আবার অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তবিধি আসিল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে এই মনে হয় যে, যতদিন ভারতবর্ষে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইত, যতদিন এখানে ব্রহ্মকৃপার মহিমা কীর্ত্তিত হইত, যতদিন এখানে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচিত হইত, এবং যতদিন এখানে উপনিষদের প্রখর সূর্য্যালোক আর্য্যসন্তানের মোহান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ হইত, ততদিন অনুতাপই পাপের মহৌষধ বলিয়া পরিচিত ছিল; ততদিন পাপের প্রতীকারে কেবলমাত্র অনুতাপেরই একাধিপত্য ছিল। কিন্তু যখন ক্রমে দেব উপদেব সেই দেবাধিদেব ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিল; যখন পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকার উপনিষদের সূর্য্যালোককে আবৃত করিল, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মকৃপায় নির্ভর কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে যাগযজ্ঞ, শরীরশোষণ প্রভৃতি নানা প্রকার বাহ্যাড়ম্বরই পাপক্ষয়ের মহৌষধ বলিয়া তদানীন্তন শাস্ত্রের সংবাদপত্রে ভূয়োভূয়ঃ বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল।

অজ্ঞাত-ইতিহাস ভারতবর্ষ বলিয়া আমি ইহা আনুমানিক কথা বলিতেছি না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের একটী গানে কোন ব্রহ্মবাদী বলিতেছেন যে "হে প্রভু, তুমি বলি প্রার্থনা কর না, নইলে আমি দিতাম; তুমি দগ্ধমাংসের আহুতি ইচ্ছা কর না। অনুতপ্ত হৃদয়ই ঈশ্বরের নিকটে বলি-স্বরূপ; হে ঈশ্বর তুমি অনুতপ্ত হৃদয়কে কখনই ঘৃণা করিবে না।"* অনুতপ্ত-হৃদয় ব্রহ্মবাদী কি সুন্দররূপেই অনুতাপের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ব্রহ্মবাদী ঈশাও বলিলেন যে "অনুতাপ কর;" (St. Matt. IV. 17.) তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আত্মগ্লানিই নরক এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ; তাই পাপী মনুষ্যকে অনুতাপ করিতে অনুশাসন করিলেন। কারণ তাহা হইলেই অনুতাপের অমৃতবারিতে আত্মগ্লানি ধৌত হইয়া আত্মপ্রসাদের পবিত্র বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে। তাহার শিষ্যগণও এই অনুতাপের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন (The Acts III. 19.) যতদিন ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল, যতদিন ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর ছিল, ততদিন অনুতাপ—যথার্থ হৃদয়ের অনুতাপই আদৃত হইত। কিন্তু যখনই কোন রূপ উপধর্ম্ম কোন উপায়ে মনুষ্যদিগের হৃদয়ে মালিন্য-স্তর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখনই হয় দগ্ধাহুতি কিম্বা মনুষ্যপূজা অথবা অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত ধর্ম্মযাজকদিগের দুএকটা বচনমাত্র পাপক্ষয়ের কারণ ও মুক্তির সোপান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

---

* Thou desirest not sacrifice, else would I give it, thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. (Ps LI. 16, 17.)

এখন দেখিলাম যে, যেখানেই ব্রহ্মনাম, সেইখানেই অনুতাপের মহিমাগান। এক দিকে যেমন প্রভাত সূর্য্যের উত্থানস্থান প্রাচ্যভূমি পাপক্ষয়ে অনুতাপের শক্তি কীর্ত্তন করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ অস্তমিত রবির পতনস্থান পাশ্চাত্যভূমিও অনুতাপকেই পাপ হইতে মুক্তির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে।

অনুতাপই পাপের শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিত্ত। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র যদি যাগযজ্ঞ বা শরীরশোষণকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া থাকেন, তাহা আমরা গ্রাহ্য করিব? যাগযজ্ঞ তো বহির্ব্বস্তু লইয়াই হয়; কিন্তু যেখানে আমাদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেখানে বহির্ব্বস্তু তো দূরের কথা—স্বীয় শরীরের প্রতিও কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। তবেই দেখিতেছি যে যাগযজ্ঞে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হয় না; কেবল মন্দ কর্ম্মে লিপ্ত না থাকিয়া খেলায় মন দেওয়া হয় মাত্র। শরীরশোষণও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে। যাঁহারা উপবাসাদির প্রতি অধিক আদর প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এইভাবে করিয়াছেন যে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল; অতএব যদি পলে পলে শরীরের বিনাশ সাধন করিয়াও পাপপ্রবৃত্তি সকলের ধ্বংস হয়—তাহাও ভাল। তবে কি সেই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বুঝিতেন না যে শরীরনাশের সঙ্গে যেমন অসৎপ্রবৃত্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ সৎকার্য্য করিতেও অক্ষমতা জন্মে? ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা বলিতেছেন—

> বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
> সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমন উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

বিষয়সুখ উপভোগ করিলেই অন্যায় কর্ম্ম হয় না। "চক্ষু কর্ণ

প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও হস্তপদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোকলোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর দুইপ্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে বিষয়সুখ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ বিষয়সুখের উপভোগেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।"

আবার যাঁহারা বলেন যে পাপী মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে এক পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলে পাপীর পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, আমি যদি পাপ করি, অপরে তাহার শাস্তি গ্রহণ করিবে কেন? ইহাই কি ন্যায় বিচার? তাই যদি হইত, তবে শতসহস্র ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী মানিলেও পাপ করিলে আমরাই স্বয়ং তাহার জন্য আত্ম-গ্লানি ভোগ করি কেন? পুণ্যের সময়ে আমরাই যেমন আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি, পাপের সময়েও আমরাই তেমনি আত্মগ্লানি ভোগ করি। তবে আর অপর ব্যক্তি আমাদের পাপ গ্রহণ করিবেন কিরূপে?

এতক্ষণ প্রায়শ্চিত্তের একটী অঙ্গ অনুতাপের বিষয় বলিয়া আসি-লাম। প্রায়শ্চিত্তের অপর অঙ্গ পাপ হইতে বিরত হইয়া পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। মনুষ্য কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; হয় সে পুণ্যের পথে যাবে, নতুবা অপুণ্যের পথে যাবে; পুণ্যেও যাবে না, অপুণ্যেও যাবে না—একথা একেবারেই অসম্ভব। মনুষ্য

কখনই নির্ব্বিকারচিত্তে, সংসারের সহিত একেবারেই নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে পারে না। এই জন্য যখনই অনুতাপাগ্নি পাপরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, তখনই মনুষ্যের পুণ্যপথে গমনই শ্রেয়ঃ। প্রায়শ্চিত্তের দুইটি অঙ্গের মধ্যে "অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক।" আমরা যে ঈশ্বরের প্রসাদে স্বাধীন ইচ্ছা পাইয়াছি, সেই স্বাধীন ইচ্ছার যেন অপব্যবহার না করি। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা আপন ইচ্ছায় মঙ্গলের দিকে যাই এবং মঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলকে পৃথিবী হইতে দুর করিয়া দিই। আমাদিগের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ অধিকার যে আমরা পশুদিগের ন্যায় প্রবৃত্তি মাত্রেরই বশবর্ত্তী না হইয়া, ভালমন্দ উভয়েরই পথ অনুসরণ না করিয়া ইচ্ছা করিলেই ভালর পথে যেতে পারি; ইচ্ছা করিলেই পাপের দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে পুণ্যের সুগন্ধ আনয়ন করিতে পারি। "পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে। পূণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করে, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহকালে পবিত্র কীর্ত্তিলাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন।"

আজ যখন এখানে আসিয়াছি—আজ যখন এই বৎসরের শেষ দিনে একত্র মিলিত হইয়াছি, তখন ঈশ্বরের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা না করিয়া যেন গৃহে প্রত্যাগমন না করি। তিনি যখন তাঁহার বিদ্রোহী সন্তানেরও বেদনা নিবারণ করেন, তখন এই যে তাঁহার ভক্তসমাজ—ইহাঁদের হৃদয়ের ক্রন্দন শুনিবেন না?

হে দয়াময় পিতা, অন্তর্যামী ভগবান, তোমার চরণপ্রান্তে আজ আমরা পাপ-তাপে উত্তপ্ত হৃদয়-উপহার আনিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। তুমিই জান সেই বৎসরের প্রারম্ভে তোমার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমার আদেশের বিরুদ্ধে একপদও অগ্রসর হইব না, পাপের দিক দিয়াও যাইব না; কিন্তু হায়! আজ যে এই বৎসরের শেষ দিনে আসিয়াছি—আজ কি সেই বিশুদ্ধ হৃদয় আনিতে পারিয়াছি? না। কতবার পাপে নিমগ্ন হইয়াছিলাম—কতবার তোমার আদেশের বিপক্ষে একপদের পরিবর্ত্তে দশপদ অগ্রসর হইয়াছিলাম। হে করুণাময়ি জননি, তোমার নিকটে আজ পাপদগ্ধ হৃদয় আনিয়াছি; তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিয়া তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লও; তুমি সর্ব্বদাই আমার সম্মুখে প্রকাশিত থেকো। তোমার নিকট বারম্বার এই প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর; পাপের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে দেখা দিলে বজ্রের আঘাতে তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিও। তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া আমার সমুদয় বিঘ্ন দূর হইয়া যাউক; আমার হৃদয় পবিত্র হউক। আমার হৃদয়ে তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর—তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক অষ্টাবিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

উনত্রিংশ বিবৃতি—গৃহবিবাদ।*

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥

হে কেশব, আমি আর অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছি না; আমার মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং আমি অমঙ্গলসূচক চিহ্ন সকল দর্শন করিতেছি।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। একবার মহাভারতের সেই দুরন্ত সময় ভাবিয়া দেখ। চারিদিকে মহাকোলাহল, মহাত্রাস লাগিয়াছে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে; অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম সংগ্রাম করিবে। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ নানা অসৎ উপায়ে নিরপরাধী যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে যখন পাণ্ডবগণ তাহাদিগের কূট কৌশল হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাদিগের ন্যায্য অধিকার সকল পরিত্যাগ করিয়াও বাসোপযোগী পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন, তখন দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বলিল যে, যুদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে সূচ্যগ্র পরিমিতও ভূমিখণ্ড দেওয়া হইবে না, পঞ্চগ্রাম তো দূরের কথা। তখন উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা হইল। একদল অধর্ম্মের উপর, পাশব বলের উপর রাজ্যের ভিত্তি দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতেছে; অপর দল ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট।

যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে—এখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, এই অব-

---

*আদ্মুল আত্মোন্নতি সভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৩ শক, ১২ পৌষ সায়ংকালে বিবৃত।

সয়ে কৌরবগণ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অর্থ প্রভৃতি দ্বারা বশী-ভূত করিয়া স্বদলে আনয়ন করিয়াছেন, পাণ্ডুপুত্রগণও আপনাদি-গের প্রকৃত বন্ধুদিগকে স্বদলে সংগ্রহ করিয়াছেন—তন্মধ্যে কৃষ্ণই সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ক্রমে মহাযুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু হস্তে করিয়া রথে আরোহণ করিলেন—কৃষ্ণ তাঁহার সারথি হইলেন। কিছু দূরে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে। কৌরব-সেনাগণ ভীষ্মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে এবং পাণ্ডব-সেনাগণ ভীমের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন "আমাকে ঐ সেনাদলের মধ্যে লইয়া যাও—আমি দেখিতে ইচ্ছা করি যে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।"

কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। অর্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইয়াই অবাক্—দেখিলেন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরাই যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তখন তাঁহার মনে নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইল; ভাবিতে লাগিলেন যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? আত্মীয় স্বজনের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া কি সুখী হইতে পারিবেন? কখনই না। তখন তিনি কৃষ্ণকে কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমি অবসন্ন হইতেছি, আমি অবস্থান করিতেই পারিতেছি না; আর আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া কোনও মঙ্গল দেখিতেছি না; যাঁহাদিগের সুখের জন্য আমরা রাজ্য প্রভৃতি প্রার্থনা করি, সেই আচার্য্য, পিতৃপিতামহ

প্রভৃতি স্বজনেরাই এই যুদ্ধে যখন প্রাণ দিতে উপস্থিত, তখন আর আমাদিগের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেই বা কি হইবে?" তিনি অতি কাতর ভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" স্বজনকে বধ করিয়া হে কৃষ্ণ, আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব?

তিনি আরও বলিলেন যে, "যদি কৌরবগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কুলক্ষয়জনিত সংগ্রাম-দোষ জানিতে পারিতেছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ-সকল জানিয়াও কেন এই মহাপাপ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত না হইব?"†

কুলক্ষয় জনিত দোষ কি? কুলক্ষয় হইতে ধর্ম্মনাশ হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ‡

---

* দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥

† যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥

‡ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥

উপসংহারে তিনি তাঁহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন—"আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপেরই অনুষ্ঠান করিতেছি। যদি অশস্ত্র আমাকে এই কৌরবগণ শস্ত্রের দ্বারা বধও করে, তাহাও আমি মঙ্গলজনক বিবেচনা করি।" * এইরূপ কাতর বাক্য সকল বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় গীতাকার গৃহবিবাদের ফল কেমন সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের শত শত হিন্দু আছেন, যাঁহারা গীতাপাঠকে একটী নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিগণিত করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রধান কারণ হইল গৃহবিবাদ। আমরা গৃহবিবাদের ফল এমন প্রত্যক্ষ করিয়াও যে তাহা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা জানিয়া শুনিয়াও যে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছি, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? কি কুক্ষণে যে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই অবধি যেন গৃহবিবাদ ভারতভূমিকে ছাড়িতে চাহে না। ভারতের পুরাকালীন উন্নত অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের দারুণ অধঃপতিত অবস্থা তুলনা করিলে কি অশ্রু সম্বরণ করা যায়?

মহাভারতের বর্ণিত জ্ঞাতিবিবাদের ন্যায় আজকাল যদিও জ্ঞাতি বিবাদকে ভারতের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে দেখিতে

* অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥

পাই না বটে, কিন্তু বিরোধ, বিদ্বেষ, বিবাদের ভাব সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে। আমাদিগের পরস্পরের প্রতি কিছুমাত্র মমতা নাই; আমরা সকলেই নিজেদের শত শত দোষ থাকিলেও অপরের একটী মাত্র দোষ দেখিলেই একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। এমন কি, সামাজিক রাজনৈতিক, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে হউক, পরস্পরের মতভেদ হইলেই বিদ্বেষের বিষবৎ পঙ্কিল ভাব আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। এইরূপ বিদ্বেষভাব থাকাতেই আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে একতা ঘুচিয়া গিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে এই বিদ্বেষভাব এই গৃহবিবাদ থাকাতেই আমরা এত মলিন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।

এখন যে আমরা কথায় কথায় রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নতি করিতে ছুটিয়া যাই—সে উন্নতির আশা কোথায়? তাহা সুদূরপরাহত। রাজনৈতিক বিষয়ে আমি বলিতে চাহি না; কারণ রাজনৈতিক উন্নতি জাতীয় সংহতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, ইহা একেবারে জানা কথা। সামাজিক বিষয়ে দুএকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সামাজিক উন্নতি অর্থে এই বুঝি যে সমাজের অন্তর্গত জনসমষ্টির উন্নতি। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। কিন্তু যখন কেহ অপর কাহারও বিষয়ে কোন রূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিতেই শিখে নাই, তখন কে কাহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইবে? আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতি করিতে শিক্ষা করিতে হইবে, তবে যদি সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারি। আমাদিগের অন্তর গৃহবিবাদের গুপ্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; আমরা সমাজ সমাজ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেছি কেন?

বাহিরের মলিন হাসি কিছুতেই দগ্ধ হৃদয়কে লুক্কায়িত করিতে পারিতেছে না। আমরা বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজের যে দিকেই চাহিয়া দেখি, সেরূপ বিশেষ কোন উন্নতিরই চিহ্ন দেখিতে পাইতছি না; উন্নতির মূল যে একতা, তাহাই যে নাই।

তবে কি এই অবনতি-স্রোতের প্রতিরোধক কিছুই নাই? অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে কি এমন কিছুই নাই, যাহাকে অবলম্বন করিলে আমরা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারি; উন্নতির পথে পুনরায় আরোহণ করিতে পারি? আছে—তিনি আমাদিগকে নিঃসহায় ছাড়িয়া দেন নাই। যাহাতে আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া উন্নত হইতে পারি, এমন উপায় তিনি আমাদিগের অধিকারে দিয়াছেন। আমরা যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে আনন্দ হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হইব; আর যদি তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করি, তবে "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং" দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ হইতেও ক্লেশ এবং ভয় হইতেও ভয় প্রাপ্ত হইব। সেই উপায় একমাত্র সত্য। এই সত্য জানিবার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে দিয়াছেন। এই সত্যকে জানিয়া আমাদিগের সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। সত্যকে অবলম্বন করিলে, সত্যের পথে চলিলে আমাদিগের অন্য কাহা হইতেও ভয় হইবে না।

হে ভ্রাতৃগণ! এখনও কি আমরা গৃহ-বিবাদে উন্মত্ত থাকিব? আইস, আমরা গৃহবিবাদরূপ বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সত্যের অমৃতবৃক্ষ রোপণ করি। সেই অমৃতবৃক্ষের অমৃতরসে আমাদের দগ্ধ হৃদয় নববল প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের সমাজ পুনর্জ্জীবিত হইয়া, বসন্তকালে প্রকৃতি যেমন সুন্দর শোভা

ধারণ করে, সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। সত্যই ধর্ম্ম; সত্যকে অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মকে লাভ করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ আমাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

সত্যই ধর্ম্ম; সত্যই শান্তির হেতু; অসত্যই বিবাদের কারণ। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই সত্য, তাহা সর্ব্বস্থানেই সত্য—এই জন্য তাহা সকলেই, একবার বুঝিতে পারিলেই গ্রহণ করিবে। কিন্তু অসত্য যাহা, তাহা একস্থানে একরূপ প্রতিভাত হয়, অপর স্থানে অপররূপ প্রতিভাত হয়; সুতরাং তাহা লইয়াই মহাবিবাদ চলিতে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ একটী সত্য—ইহা ক্রমে সকলেই বুঝিয়াছে। এখন জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ এই মাধ্যাকর্ষণকে তাঁহাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করিবেন, বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরস্পরের মধ্যে কোনই আকর্ষণ নাই—এইরূপ মতকে ভিত্তিভূমি করিবেন? যে মত সত্যের উপর যতটুকু দণ্ডায়মান থাকিবে, সেইমত ততটুকু চির-স্থায়ী হইবে।

সেইরূপ মানবসমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে গেলে পারমার্থিক সত্যের উপরে, ধর্ম্মের উপরে স্থাপন করা আব-শ্যক। অসত্যের উপরে যতটুকু করা হইবে, ততটুকু পদ্মপত্রগত জলের ন্যায় অস্থির হইবে। তাই বলি, সত্যের অনুসন্ধানে বাহির হও। আমাদিগকে সত্যের অন্বেষণে যাইতে হইবে; সত্যকে অসত্যের মায়া-জাল হইতে বাছিয়া লইতে হইবে।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে সত্য চিরস্থায়ী ও সর্ব্বত্রব্যাপী। এই সকল সত্যের মধ্যে আমি আছি, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এইরূপ কতকগুলি সত্য ঈশ্বর আমাদিগের সকলেরই হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধরূপে নিহিত করিয়া দিয়া-

ছেন। এই কারণে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অন্তরেই এই সকল সত্য বিরাজ করে। প্রথমতঃ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সাধারণ এবং যাহা আমাদিগের আত্মাতে বিশেষ সায় পায়, এইরূপ মূলসত্যগুলি আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেই সত্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া অপক্ষপাতে অন্যান্য সত্যের অন্বেষণে যাইতে হইবে। এই প্রথা অবলম্বন করিলেই আমরা সত্যের সন্ধান পাইব। এবং যতটুকু সত্যলাভ করিব, যে কোন বিষয় হউক, সেই সত্যের উপর দাঁড় করাইলেই তাহা অটলভাবে দাঁড়াইতে পারিবে।

দুঃখের বিষয় যে আজকাল অনেকেই এমন কি হিন্দুদিগের মধ্যেই অনেকে নিরপেক্ষভাবে সত্যানুসন্ধান না করিয়া বলেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতকে উদ্ধার করিতে পারিবে। আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিন্দা করিতে চাহি না। তবে সম্প্রতি ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বাইবেল গ্রন্থের অভ্রান্ততা লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহাই উল্লেখ করিব। এই জ্ঞানোজ্জ্বল উনবিংশ শতাব্দীতেও সেখানে এমন অনেক উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক আছেন, যাঁহারা বাই-বেলের উল্লিখিত প্রতি কথা, প্রতি ঘটনা অভ্রান্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার সেখানে এমনও মহামনা লোক সকল আছেন যাঁহারা বাইবেলের অমূল্য সত্য উপদেশ গুলি সাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু তাহার অভ্রান্ততা অস্বীকার করেন। তাঁহারা এই অভ্রান্ততা অস্বীকার করিবার হেতুস্বরূপ কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।*

*তন্মধ্যে একটী এই—বাইবেলের দশ আজ্ঞা (Ten Commandments) সকল সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানদিগের পালনীয়। বাইবেলের এক অধ্যায়ে (Exodus) চতুর্থ আজ্ঞা (রবিবারে কাজকর্ম্ম না করা) সম্বন্ধে লেখা আছে যে ঈশ্বর ছয়

এই যেমন বর্ত্তমান আন্দোলন আলোচনার একটা দিক্ দেখিলাম, এইবারে আর একটা দিক দেখা যাউক। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরান্দোলন দেখা দিতেছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা এক দিকে প্রমাণ করিতে চাহেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক ধর্ম্ম নহে—জড়বাদ নহে। তাঁহারা অপরদিকে বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের মতে আমরা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেও মুক্তিলাভ করিতে পারি। যাহাই হউক, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীতও যে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা অপূর্ণ জীব; আমাদের পদে পদে ভ্রম; তখন আমরা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম ব্যতীত কোথায় মুক্তি লাভ করিব? কৃষকেরা প্রভূত পরিশ্রম করিলেও আকাশ হইতে জলবর্ষণ না হইলে তাহাদিগের সকল পরিশ্রমই নিষ্ফল হইয়া যায়; সেইরূপ আমরা সহস্র আত্মচেষ্টা করিলেও আমাদের মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের সুবিমল প্রসাদ আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের মতে বাসনা-নিবৃত্তিই মুক্তি; আমাদিগের মতে তাহা সঙ্গত নহে। বাসনা নিবৃত্তি করিয়া আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা মুক্তির শ্রেষ্ঠ সোপান হইতে পারে কিন্তু যখন সেই শূন্য আত্মা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তাতে

দিনে বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া রবিবারকে পবিত্র দিবস করিয়াছেন। আবার আর এক অধ্যায়ে (Deuteronomy) লেখা আছে যে ঈশ্বর ইস্রেল বাসীদিগকে মিসরদেশের কারাবাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রবিবারে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং শেষোক্ত অধ্যায়স্থ দশ আজ্ঞার নিম্নে লেখা আছে যে ঈশ্বর ইহার অতিরিক্ত কোন কথাই বলেন নাই (He added no more)। এখন কোন্ অধ্যায়ের কথা বিশ্বাসযোগ্য? একটা সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবেই।

পূর্ণ হইবে, তখনই আমাদের মুক্তি। আমরা যাহা জানিতেছি, তাহার অতিরিক্ত জানিবার পিপাসা আছে; আমরা যাহা দেখি-তেছি, তাহার অতিরিক্ত দেখিবার পিপসা আছে। এই পিপাসা কোনও সীমাবদ্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত হয় না। তবে এই পিপা-সার তৃপ্তিস্থল সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই ঋষিরা সুন্দর বলিয়াছেন যে—

যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ॥

যিনি ভূমা মহান্ পুরুষ, তিনিই সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।

ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥

ভূমা ঈশ্বরই সুখস্বরূপ; অতএব তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥

তাঁহার সহবাসই আমাদের মুক্তি। আমরা ক্রমিকই উন্নতি লাভ করিব; ক্রমিকই তাঁহার অধিকতর সহবাস লাভ করিব। এখানে বিদ্যুতের ন্যায় সেই বিদ্যুৎ পুরুষ দেখা দেন—এই আইসেন, এই অদৃশ্য হ'ন; কিন্তু আমরা উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে গিয়া অবশেষে এমন লোকে যাইব যেখানে গিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মদর্শন লাভ করিব। সেই অবস্থাই আমাদের মুক্তি এবং সেই লোক আমাদের ব্রহ্মলোক। আমরা ব্রহ্মলোকে থাকিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব—ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর মুক্তি হইতে পারে? বৌদ্ধেরা বলেন যে হিন্দুদের মতে ব্রহ্মলোকে যাইলেও কোটি কোটি কল্পের পর আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমি জানি না; এবং কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা ইহা বলিতে পারি যে আমাদিগের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "সকৃদ্বিভাতোহেষ

ব্রহ্মলোকঃ” ব্রহ্মলোক একেবারেই প্রকাশ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যিনি গিয়াছেন, তিনি চিরকালই ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ পান করিবেন, সে আনন্দের আর বিরাম নাই। ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের মুক্তি নাই। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমাদের তৃপ্তির স্থল, আমাদের পবিত্র শান্তিনিকেতন।

এই মুক্তিলাভের পথ সত্যের পথ, ধর্ম্মের পথ। সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর; ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ কর—মুক্তির প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে যেন কেহ একটা অপূর্ব্ব নূতন ধর্ম্ম না বুঝেন; হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার, যাহা উৎকৃষ্ট অংশ, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্র যিনিই মন্থন করিবেন, তাঁহা-কেই একেশ্বরবাদে আসিতেই হইবে। অসাম্প্রদায়িক সত্য গ্রহণ কর—সত্যকে সাম্প্রদায়িক ভাবে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া ফেলিও না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যেরই আশ্রয় লইতে উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা সেই সত্যং—জ্ঞানং—অনন্তং ব্রহ্ম।

হে বন্ধুগণ, এখন যেরূপ সময় আসিয়াছে, তাহাতে আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমাদের নিশ্চিন্ত ভাবের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রায় শুনিতে পাই—দু একটী করিয়া কৃতবিদ্য হিন্দু সন্তানও স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন—তাঁহারা দেখেন না যে স্বজাতীয় ধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা ব্যতীত আরও উৎকৃষ্ট কথা আছে। তাঁহারা এক কুসংস্কারের হস্ত এড়াইতে গিয়া অপর প্রকার কুসংস্কারে গিয়া পড়িয়াছেন। তাই বলি যে আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আইস, সকলেই সত্যের অন্বেষণে প্রাণপণ যত্ন করি এবং সত্যকে হৃদয়ের সহিত ধারণ করিয়া রাখি। তাহা হইলেই দেখিব যে আর

আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ থাকিবে না—শান্তির কমনীয় মূর্ত্তি প্রতি-গৃহে বিরাজ করিবে। গৃহবিবাদ আর করিও না; গৃহবিবাদ পরিত্যাগ কর। কোমলভাবে, সদয়ভাবে পরস্পরের দোষ দেখা-ইয়া সংশোধন করিতে যত্নবান্ হও। গৃহবিবাদ বাধাইয়া আমরা কথনই সুখী হইতে পারিব না, উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। গৃহবিবাদে ধর্ম্মের ক্ষতিই হয় এবং "ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মো-ঽভিভবত্যুত" ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

হে পরমাত্মন্. তুমি আমাদিগের মধ্যে এমন বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ কর, যাহাতে প্রকৃত সত্যকে দেখিতে পাই এবং আত্মাতে এমন বল দাও যে, শত সহস্র বিপদের মধ্যেও সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি এবং জীবনে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে গৃহবিবাদ বিষয়ক ঊনত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

ত্রিংশ বিবৃতি—অধ্যাত্মধর্ম্মের ভিত্তি। *

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

অধ্যাত্মধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত সার। যেহেতু এই অধ্যাত্ম ধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে অনেক হিন্দু ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে হিন্দুশাস্ত্রই অধ্যাত্মধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা বুঝিয়া দেখা উচিত যে, যখন অধ্যাত্মধর্ম্মের যাহা কিছু, সকলই আত্মাকে লইয়া এবং আত্মার আত্মা সেই পরমাত্মাকে লইয়া, তখন তাহার ভিত্তি কোনরূপ শাস্ত্রই হইতে পারে না—না হিন্দুশাস্ত্র, না কোরাণ শাস্ত্র, না অন্য কোন প্রকার শাস্ত্র। আত্মা তো আর কেবলই যে হিন্দুদিগের আছে, অন্যদিগের নাই, এমন নহে; এবং পরমাত্মা যে কেবল হিন্দুদিগেরই পিতামাতা, অন্যদিগের নহে এমনও কোন কথা নাই। যেহেতু আত্মা প্রত্যেক মানবেরই আছে এবং পরমাত্মাও প্রতি আত্মাতে আত্মার আত্মারূপে অবস্থিত আছেন, এই হেতু কোন জাতিবিশেষের, বা সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের প্রণীত কোন প্রকার গ্রন্থাদি, তাহাকে শাস্ত্রই বল আর নীতিগ্রন্থই বল, অধ্যাত্ম ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না।

অধ্যাত্মধর্ম্মের ভিত্তি মর্ত্ত্যমানবের কপোলকল্পিত শাস্ত্রাদি অপেক্ষা সুদৃঢ়—ঈশ্বরের রচিত কোটী কোটী লোকপরিপূর্ণ

---

* ১২৯৯ সাল শ্রাবণ সংখ্যায় নব্যভারতে প্রকাশিত।

মস্তকের উপরে উন্মুক্ত অসীম আকাশ এবং দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ অনন্ত উন্নতিশীল অবিনশ্বর মানবাত্মা। "আকাশে আমরা তাঁহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই।" চক্ষু উন্মীলন করিয়া যখন বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি; তখন সেই মহান্ পুরুষের মহান্ শক্তি দেখিয়া অবাক হই, স্তম্ভিত হইয়া যাই। চক্ষু নিমীলন করিয়া যখন অন্তর্জগতের প্রতি, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন সেই দেবদেবের মহান্ শক্তিও দেখিতে পাই এ বং তাহার সঙ্গে তাঁহার মহান্ প্রেম, অপার করুণা দেখিয়া বিস্মিত হই, মুগ্ধ হইয়া যাই।

প্রেমময় পরমেশ্বর আমাদের উপর প্রেম বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি আমাদের আত্মাতে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, আমরা তাঁহাকে প্রতিপ্রেম করিতে পারি। আমরা কি ক্ষুদ্র —এই একটী পৃথিবীর সঙ্গেও তুলনা করিলে কোথায় তলাইয়া যাই; সেই আমরা এত ক্ষুদ্র হইয়াও রাজাধিরাজ দেবদেবকে প্রীতি করিতে পারিতেছি! কি আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সকলই তাঁহার প্রেমেই জীবিত রহিয়াছে, তাঁহার প্রেমেই অন্নরস গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা কেহই সেই প্রেমের প্রতিদান করিতে পারে না। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমরাই কেবল আমাদের প্রতি তাঁহার অপার প্রেম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি— আমাদের কেমন উন্নত অধিকার!

এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রীতি সম্ভব কি না? জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রীতি একেবারেই অসম্ভব। প্রীতির পাত্রকে না জানিলে প্রীতি করিব কাহাকে? আমি জানিলাম না ফুল কাহাকে

বলে, আমি কি প্রকারে বলিব যে আমার অমুক ফুল ভাল লাগে? আমি জানিলাম না সঙ্গীত কাহাকে বলে, আমি কি প্রকারে বলিব যে আমার অমুক রাগিণী ভাল লাগে? আমি যদি না জানি যে রামমোহন রায় ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া কত গুরুতর বিপদ সকল অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, তখন আমি ইহা বলিতে পারি না যে, আমি রামমোহন রায়ের ন্যায় ধর্ম্মকেই সম্বল করিব। জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রীতি একেবারেই অসম্ভব। আমাকে জানিতেই হইবে যে, যিনি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র, তিনি কি প্রকার, কি রূপ কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য, কোন্ কার্য্যই বা তাঁহার অপ্রিয়, কিরূপ ভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে আহ্বান করিবেন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, প্রকৃত প্রীতি সচেতন সজ্ঞান পুরুষেই সম্ভবে; জড়বস্তু প্রভৃতির উপর যে মায়ামমতা হয়, তাহা প্রেমের অপভ্রংশ মাত্র—তাহা বিষয়াসক্তি।

যখন দেখিতেছি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অর্পণ করিতেছে, তখন কি ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, এই এতগুলি সজ্ঞান মনুষ্য ঈশ্বরকে না জানিয়াই প্রীতি করিতেছে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সভ্যজাতির কথা ছাড়িয়া দাও। অসভ্য জাতিদিগের নিকটে যাইয়া দেখ যে, তাহারাও ঈশ্বরকে জানিয়াই তাঁহার চরণে প্রীতিপুষ্প উপহার দিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীর নিকটে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিবে যে, তাহাদের দেবতা ঐ আকাশে আছেন। ভারতের সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও বলিবে যে, তাহাদের দেবতা সেই এক ভগবান্।

তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহাদের বনদেবতা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা আছে কি না, তাহার উত্তরে তাহারা এই বলে যে, সেই সকল দেবতা সেই ভগবানেরই অধীন থাকিয়া কার্য্য করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক স্বদেশ হইতে অচিরাগত কোন সাঁওতালকে এই সকল বিষয়ে দু-একটী প্রশ্ন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে, তাহাদের দেবতা কে? তদুত্তরে সে হাত চোখ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল "কেন সেই ছাড়া আর কে?" তাহার সহিত এই সম্বন্ধে আরও কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ইতি মধ্যে সে বলিয়া উঠিল যে "সে (অর্থাৎ ঈশ্বর) না থাকৃলে তোরাই বা কোথায় থাকিতিস্, আর আমরাই বা কোথায় থাকিতাম?" উপনিষদের "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ" এই গভীর দার্শনিক বাক্যের প্রতিধ্বনি এক অসভ্য সাঁওতালের মুখে স্তম্ভিতহৃদয়ে শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে জানিয়াই তাঁহার চরণে প্রীতিভক্তি অর্পণ করিতেছে।

আত্মার এই স্বাভাবিক জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? মানবজাতি সভ্য অসভ্য, জ্ঞানী মূর্খ নির্ব্বিচারে কি প্রকারে যোগীজনদিগের সাধনার চরম ফল এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইল? ইহার উত্তরে আমরা এই বলি যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে"—ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যেরই আত্মাতে এই জ্ঞান দিয়া রাখিয়াছেন। যদি এই জ্ঞান তিনি আত্মাতে দিয়া না রাখিতেন, তবে কিছুতেই তাহা লাভ করিতে পারিতাম না। সংখ্যাবোধের মূল আমা-

দের অন্তরে আছে বলিয়াই আমরা ক্রমে ক্রমে কত দুর্ব্বোধ্য অঙ্কশাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু মূলেই যদি সংখ্যাবোধ না থাকিত, তাহা হইলে কি কোন প্রকার অঙ্কশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিতাম? সেইরূপ আমরা যদি ব্রহ্মজ্ঞানের মূল আত্মাতে নিহিত না পাইতাম, তবে সহস্র চেষ্টা দ্বারা এক বিন্দুও সেই অমৃত লাভ করিতে পারিতাম না। পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক নাস্তিক গ্রন্থ কোন কোন জাতির মূলেই ধর্ম্মভাব নাই, ইহা প্রমাণ করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই, কারণ সেই সকল গ্রন্থেই উক্ত জাতি সকলের ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়। আমরা সৃষ্ট, আমাদের স্রষ্টা কোন মহান্ অদৃশ্য পুরুষ আছেন, সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য, এইরূপ কতকগুলি পারমার্থিক জ্ঞানের (অন্য জ্ঞানের হোক্ বা না হোক্, সে কথা এখানে বলিতেছি না) মূল তত্ত্ব ঈশ্বর স্বয়ং আমাদেরই মঙ্গলোদ্দেশ্যে আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বরনিহিত এই জ্ঞানই অধ্যাত্ম ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তিভূমি। ঋষিরাও আত্মপ্রত্যয়কেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান প্রমাণরূপে বলিয়া গিয়াছেন। কঠ মুনি কহিলেন—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥

তিনি বাক্যের দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষুর দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

মাণ্ডুক্য মুনিও ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, "একাত্মপ্রত্যয়সারং", এক আত্মপ্রত্যয়ই যাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ।

ঈশ্বর আত্মাতে আর একটী ক্ষমতা নিহিত রাখিয়াছেন—বহির্জগত হইতে তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সকল বুঝিয়া লওয়া। এই কারণে বহির্জগতও অধ্যাত্মধর্ম্মের আর এক ভিত্তি। মস্তকের উপরে অনন্তবিস্তৃত মহান্ আকাশ এবং শরীরের অন্তরে অনন্ত উন্নতিশীল বিজ্ঞানাত্মা—এই দুই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রকৃত অধ্যাত্মধর্ম্ম অটলভাবে দণ্ডায়মান। আত্মপ্রত্যয় সত্যকে প্রকাশিত করে; বহির্জগত আপ্রত্মত্যয়সিদ্ধ সেই সত্যকে সমর্থন করে। আত্মপ্রত্যয় বলিল, ঈশ্বর আছেন; বহির্জগত বলিল যে 'হাঁ ঈশ্বর অবশ্যই আছেন, কারণ প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ দেখিতে পাওয়া যায়—অতএব এই বিশ্বের কারণ না থাকিলে বিশ্ব হইল কিরূপে?' বহির্জগত হইতে নানা দৃষ্টান্ত পাইলাম—দেখিলাম যে প্রাণ আপনা হইতে আইসে নাই, জ্ঞান আপনা হইতে আইসে নাই। আপনাপনি প্রাণ আইসে কি না, তাহার পরীক্ষা হইল, দেখা গেল যে, প্রাণ আপনা হইতে আসিতে পারে না। * প্রাণই যখন আপনা হইতে আসিল না, তখন জ্ঞানই বা আপনা হইতে কি প্রকারে আসিবে? প্রাণ সেই মহাপ্রাণ হইতে আসিয়াছে, জ্ঞান সেই মহাজ্ঞান হইতে আসিয়াছে; জগতের যে কোন শক্তি, সকলই সেই মহাশক্তি হইতে আসিয়াছে। আপ্রত্মত্যয় বলিয়া দিল, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য; বহির্জগতে দেখিতে পাইলাম যে মিথ্যা কথার উপর নির্ভর করিয়া কত কত ধনী মানী ব্যক্তি, কত বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য অকালে লুপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে বহির্জগত আমাদিগকে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়;

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮১৩ শক ৫৮১ সংখ্যা দেখ।

অন্তর্জগত আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়—আত্মার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের স্পর্শলাভ করিতে পারি।

উপনিষৎসিদ্ধ এই আধ্যাত্মিক সত্যের বিরুদ্ধে আমরা সচরাচর দুইটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখিতে পাই। প্রথম এই যে, আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে, তখন আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা, অতএব তাহার উপর কি প্রকারে নির্ভর করা যাইতে পারে? যেমন অতি দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রও মূল সংখ্যাবোধের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আমাদের পারমার্থিক জ্ঞান যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, তাহার নির্ভর থাকিবেই আত্ম-প্রত্যয়ের উপর। এইস্থানে কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি আত্মপ্রত্যয়ের উপর সমস্ত পারমার্থিক জ্ঞান নির্ভর করে এবং সেই আত্মপ্রত্যয় যদি ঈশ্বর সকলকেই সমান রূপে দিয়া থাকেন, তবে ধর্ম্মসম্বন্ধে এত ভ্রম আইসে কেন এবং এত মত-ভেদই বা হয় কেন? একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার মীমাংসা করা যাউক। ধরিয়া লইলাম যে, দুই ব্যক্তির সম্মুখে একই প্রকারের দশটী গোলা রাশীকৃত রহিয়াছে। মূল সংখ্যাবোধ থাকাতে দুই ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে দশটী গোলা গণিতে পারিত। কিন্তু তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার কোন বিশেষ কার্য্য থাকাতে গণিবার অবসর পাইল না এবং সেই স্তূপটী দেখিয়াই মনে করিয়া লইল যে, উহাতে ১৫টী বা ২০টী গোলা আছে। অপর ব্যক্তি ধীরে ধীরে গণিয়া দেখিল যে, তাহাতে দশটী মাত্র গোলা আছে। এখন, প্রথম ব্যক্তি কল্পনার দোষে নানাপ্রকার ভ্রমে পড়িতে পারে; সে ব্যক্তি যেখানে ঐ পরিমিত ক্ষুদ্র গোলার স্তূপ দেখিবে, সেইখানেই দশ-টীর স্থানে ১৫ বা ২০ কল্পনা করিয়া লইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির

সহজে সেরূপ ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা নাই। সেইরূপ অনেক ব্যক্তি বিষয়াসক্তি এবং অন্যান্য নানা কারণে আত্মপ্রত্যয়ের প্রদর্শিত ঠিক পথে না চলিয়া অন্য পথে চলেন এবং অগত্যা, যাঁহারা ঠিক পথে চলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পথের স্থিরতা লইয়া বৃথা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যখন পরস্পরের মধ্যে এত মতভেদ দেখা যায়, তখন সচরাচর যাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলে, তাহাই আমাদিগের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আত্মপ্রত্যয়ের উপর ঠিক দাঁড়াইতে না পারিলেই যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া উক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী বাক্য আছে। * ইহাতেই বুঝা যায় যে সেই সকল শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরপ্রেরিত নহে; সেগুলি একই মনুষ্যের লেখা কি না, তাহা লইয়াও সন্দেহ হয়। যাই হোক্ আমি এখন সে বিষয়ে কোন কথাই বলিতেছি না। ঈশ্বরপ্রেরিত, ইহার ভাব এই যে, ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখানে ঈশ্বর হইলেন বক্তা এবং তাঁহার বলিবার পাত্র হইল অপর এক ব্যক্তি। আমরাও যে বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ উপদেশ প্রদান করেন, তাহা নহে। এবিষয়ে আমাদের সহিত কাহারও বিরোধ হইতেছে না। কিন্তু বিরোধ এইখানে যে, শত শত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর অপর এক জনকে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা আমার পক্ষেও ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিব কেন?

---

* যথা—বাইবেলে রবিবারকে পবিত্র দিবস বলা সম্বন্ধে Exodus (xx, 8---11) এবং Deuteronomy (v, 12---15) এই দুই অধ্যায়ের উক্তি।

ঈশ্বরপ্রেরিত বাক্য সকল প্রত্যেক অবস্থায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে উপযোগী হইয়া আইসে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য যেরূপ ভাবে শুনিতে পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বর-প্রেরিত হইবে। অবশ্য অন্যে যাহা ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া উপদেশ দিবে, তন্মধ্যে আমার আত্মপ্রত্যয় যাহাতে যাহাতে সায় দিবে সেই গুলিই আমি ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিব। তাহার সকল বাক্যই যে অভ্রান্ত বলিয়া মানিব, তাহার কারণ কি? আমি যদি বলি যে ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন যে, ১০০ স্বর্গ পার হইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে, কিম্বা যদি বলি যে, ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, অমুক দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সংহার করিতে হইবে, তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমার এই সকল কথায় বিশ্বাস করিবে? অবশ্য এরূপ অসম্ভব প্রলাপ বাক্যেও বিশ্বাস করিবার মত নির্ব্বোধ লোক এই পৃথিবীতে বিস্তর পাওয়া যায়—কিন্তু তাই বলিয়া সেই সকল সত্য হইতে পারে না। কিন্তু আমি যদি বলি যে, ঈশ্বর বলিয়াছেন 'সর্ব্বজীবে দয়া কর', তখন সকলের আত্ম-প্রত্যয় তাহাতে সায় দিবে। নিষ্ঠুরতার দ্বারা কঠিন-হৃদয় এমন লোকও পাওয়া যায়, যাহাদের আত্মপ্রত্যয় কুসংস্কারে আচ্ছাদিত হওয়াতে হত্যাকাণ্ডকেই ভাল বলিয়া মনে করে; কিন্তু তাহারাও ইহা বলিতে পারিবে না যে, দয়া করা পাপ।

বঙ্গবাসীগণ! হিন্দুভ্রাতৃগণ! তোমরা অনেক দিন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের যত্নের ধন আত্মজ্ঞানকে অবহেলা করিয়াছ, এখনও কি অবহেলা করিতে থাকিবে, এখনও কি তাঁহাদিগের অবমাননা করিবে? তাঁহারা যে রত্ন লাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপরে সকল বিষয়েই একাধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন, সেই রত্ন

তোমরা জানিয়া শুনিয়া পদদলিত করিতেছ, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের অধিকতর অপমান আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মকে, সত্যকে অবহেলা করিয়া আমাদিগকে কত বিপদই সহ্য করিতে না হইয়াছে! আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকল যেন সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে। কিছুতেই মনে করিও না যে, এই সকল পাপ আপনিই ঘুচিয়া যাইবে। সত্য গ্রহণ করিলে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, যখন হৃদয় ক্ষুদ্র আঘাতেই মুহ্যমান হইবে না, যখন হৃদয়ে শূন্যতার পরিবর্ত্তে সর্ব্বদাই পূর্ণতা বিরাজ করিবে, তখনই সর্ব্বপ্রকার পাপাচার পলায়ন করিবে। তাই বলিতেছি যে, আইস আমরা পুনরায় সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের আদরের ধন আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি—ঈশ্বর সহায় হইবেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে অধ্যাত্মধর্ম্মের ভিত্তি বিষয়ক ত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

একত্রিংশ বিবৃতি—ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার।*

"সত্যমেব জয়তে" সত্যই জয়লাভ করে; "নানৃতং" মিথ্যা জয়লাভ করিতে পারে না। সত্য, পরমার্থিক সত্য যাহা কিছু, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়লাভ করিবেই করিবে। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই থাকিবে—তাহার বিনাশ নাই, আমরা গ্রহণ করি বা নাই করি। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন ভাস্করাচার্য্য, তবে তাঁহার পূর্ব্বে কি মাধ্যাকর্ষণ ছিল না? ছিল, কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কেহ সেই সত্যের অনুসন্ধানে যান নাই; ভাস্করাচার্য্য সত্যের অনুসন্ধানে পরিশ্রম করিলেন এবং সেই পরিশ্রমের ফললাভ করিলেন। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম; ইহা পূর্ব্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে। পূর্ব্বে এক সময়ে ইহার প্রচার হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে তাহা হইতে পারিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোর বিপ্লব হইতে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন ব্রহ্মবাদীগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে নানাপ্রকার কাল্পনিক আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। তাহার ফল অতীব শোচনীয় হইল। সকলে ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিপূজাই আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে নানাপ্রকার কুসংস্কার সমুদয় ভারতের সুবিমল গগনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভারতবর্ষ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, এমন সময়ে মহাত্মা রাজা রাম

---

* রামপুর বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের ১৮১৩ শকের সাম্বৎসরিক উৎসবে ৯ পৌষ প্রাতঃকালে বিবৃত।

মোহন রায় আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পতাকা উড্ডীন করিয়া মূর্ত্তিপূজাকে পরাস্ত করিলেন। পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞান বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়াছে।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম। অতএব সত্য কথা, সত্য ব্যবহার ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। যাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। আমি মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম আর—তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইল না। আমি মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম তাহাই, কিন্তু কার্য্যে করিলাম আর—তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল না। আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিব, তাহাই প্রচার করিব এবং তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করিব—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। আমি যদি জানি যে ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ, দয়াময় পরমেশ্বর ব্যতীত আমার আর মুক্তি নাই; ইহা যদি প্রকৃতই আমার হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা হইলে অপরকে কি ব্রহ্মোপসনার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে পারি, না আপনারাই গৃহ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কাল্পনিক দেবতাকে পূজা করিতে পারি?

আজকাল হিন্দু কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই একমাত্র মুক্তির উপায়; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। তাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, মূর্ত্তিপূজা দুর্ব্বল অধিকারীদিগের নিমিত্ত; তাঁহারা দুর্ব্বল অধিকারী অতএব তাঁহারা মূর্ত্তিপূজাই করিতে থাকিবেন। তাঁহারা যখন এরূপ তর্ক করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যে ব্রহ্মকে অন্তত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জানিয়াছেন,

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । ব্রহ্মকে কেহই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার অন্তরে তাঁহাকে জানিবার এক শক্তি দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি; এবং সেই শক্তি যতই পবিত্রতা আত্ম-চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট হইবে, ততই আমরা তাঁহাকে আত্মাতে সুন্দরতররূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইব। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ আপনাকে দুর্ব্বল অধিকারী অতএব মূর্ত্তিপূজারই উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তবে আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম প্রচারস্থান এই ভারতের অধিবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। সত্যধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবার ফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এমনও দেখিয়াছি যে যেখানে সাধারণ লোকের প্রশংসাভাজন হইতে পারা যাইবে এমন স্থান কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বক্তৃতা করিলেন—হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম; আবার সেই তিনি, আপনার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধুবর্গের মধ্যে যেখানে নাস্তিকতা সমর্থন করিলে জ্ঞানবীরের সম্মান পাওয়া যাইবে, সেইখানে বলিলেন—ধর্ম্মই যখন নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম কোথায়? আমাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের বন্ধন কিরূপ শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে আমরা কত না অবনতির স্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি!

কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মূর্ত্তিপূজা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করিতে না পারিয়া বর্ত্তমানে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বময়, অতএব মূর্ত্তিপূজা করিলেও ব্রহ্মপূজাই হয়। ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ব্রহ্ম সর্ব্বময় বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা

বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি পূজা করেন কেন? ব্রহ্মসর্ব্বময় বাক্যের অর্থ এই যে, ব্রহ্মের সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই সকলের সত্তা।

এই সকল পাঁচজনের পাঁচ প্রকার মতকে হিন্দুধর্ম্ম বলিব অথবা যে ধর্ম্ম পূর্ব্বতন ঋষিদিগের অমূল্য রত্ন ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থিরতর রাখিতে পারিয়াছে তাহাকেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বলিব? এই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, যাহা অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেরও সার, তাহাকে লোকে এখনও চিনিতে পারে নাই। আমরা তাহাতে নিরাশ হই নাই; ব্রহ্মকে সর্ব্বস্ব প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা অল্প হইলেও আমাদের আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই এবং হইবে না। আমরা সকলের অন্তর্যামী সেই পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি যে, ক্রমে তাঁহার ইচ্ছাতে সমস্ত জগতে ব্রহ্মনামের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কুসংস্কার প্রভৃতি সমুদয় আবর্জ্জনা একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিবে।

এই ব্রহ্মনামের অগ্নি সমস্ত জগতে প্রজ্বলিত হইবার আর বিলম্ব দেখা যাইতেছে না। এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল আমরা এখন চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পাইতেছি। সকল স্থান হইতেই ধূম নির্গত হইতেছে। ভাবিতে কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় যে, কখন্ সেই বিদ্যুৎপুরুষের কৃপাকটাক্ষ আমাদের অন্তরে নিপতিত হইবে, আর সহসা চারিদিক হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার সংবাদ পাইব।

ইংলণ্ডে চার্ল্‌স্ বয়সী আপনার সমুদয় শক্তি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিয়োগ করিতেছেন। সম্প্রতি কুমারী ম্যানিং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেমন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এবং জাতীয়ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, সেইরূপে বয়সীপ্রমুখ ইংরাজেরাও বাই-

বেল হইতে এবং তাঁহাদের জাতীয়ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে-ছেন। কয়েক মাস গত হইল, ডাক্তার স্পিনার ব্রাহ্মসমাজের বিষয় জানিবার জন্য জাপান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে জাপানে এখন একেশ্বরবাদের প্রবল স্রোত বহিয়াছে এবং চীনদেশেও কন্‌ফুসীয় মতের পুনরুত্থান বলিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার স্পিনার স্বয়ং জার্ম্মানিদেশীয় এবং উদারখৃষ্টীয় (Liberal Christian) সম্প্রদায়ভুক্ত। এই উদার খৃষ্টীয়ান-গণ যিশুখৃষ্টকে কেবল ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন এবং জার্ম্মানিদেশে এই সম্প্রদায় ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই মুহূর্ত্তেই সেখানে কুড়িহাজার লোকে যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না—তাঁহাকে সৎধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা কি আমাদিগের পক্ষে কম আশাপ্রদ? আবার কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় আমেরিকা—সেই সুদূর আমেরিকাতেও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব ব্যাপ্ত হইতেছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভায় শুনিলাম আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন নগরে অবস্থানকালে একেশ্বরবাদের প্রভাব আশ্চর্য্যরূপে অনুভব করা যায়; সেখানে অধিকাংশ লোকই ব্রহ্মোপাসক এবং এখনও কোনও ভারতবাসী সেখানে গিয়া রামমোহন রায়ের স্বদেশীয় বলিলে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হয়।

যেমন বিদেশে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবার এই সকল সূত্রপাত দেখি-লাম, সেইরূপ আমাদের এদেশেও দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সূত্রপাত দেখিতে পাইব। হড়া, আন্দুল প্রভৃতি নানাগ্রামের অধিবাসীগণ আপনাদিগেরই যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যুক্ত হইয়া আমা

দের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। আজ যে সমাজে দাঁড়াইয়া বলিতেছি এই ব্রাহ্মসমাজও এবিষয়ে কত না সহায়তা করিতেছে। আমাদের এই সমাজ দরিদ্র নহে; ইহা লোকসংখ্যায় দরিদ্র হইতে পারে অর্থবিষয়েও দরিদ্র হইতে পারে, তথাপি ইহা দরিদ্র নহে—ইহা সেই পরমধন পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া ধনী; ইহার আর অন্য ধনের প্রয়োজন কি? তিনিই সমুদয় অভাব পূর্ণ করিবেন। আর, সেই আদিকাল হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধীপক্ষের সংখ্যাই অধিক চলিয়া আসিতেছে; কারণ অধিকাংশ লোকেই ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সংসারে একান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া, আমি পুনরায় বলিতেছি যে যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপা জানিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। সেখানেও দেখি একইরূপ অবস্থা—অনেক ইহাতে গোপনে যোগ দেন; অনেক খৃষ্টীয় প্রচারক কর্ম্ম হারাইবার ভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও ইহাতে যোগ দিতে পারেন না। আবার অনেকে সময়ে সময়ে সমাজে বাইবেলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হয় বলিয়া যোগ দেন না। কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে এই সকল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না; কোন প্রকার দোষ বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিতে ক্ষান্ত থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবে না। উন্নতি হইবে কিসে? "আমাদের মত ও বিশ্বাস জগতে ঘোষণা করিতে হইবে; অন্যান্য মত ও বিশ্বাসের তুলনায় আমাদের মত ও বিশ্বাসের উচ্চ আদর্শ ঘোষণা করিয়া তাহাতে গৌরব অনুভব করিতে হইবে; অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা কিছু নীচ ও মিথ্যা আছে তাহা আক্রমন করিতে হইবে; আমরা যাহা সত্য

বলিয়া জানিব সেই সত্যকে রক্ষার জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। মনুষ্যদৃষ্টিতে যতদূর বুঝিতে পারি, এই সকল উপায়েই আমরা আমাদের মত ও বিশ্বাস সাধারণ্যে স্বীকৃত হইবার আশা করিতে পারি।" *

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে, তবে সকলে সত্যগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে। আমাদিগের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেখাইতে হইবে, তবে সকলে ইহার জীবন্ত প্রভাব দেখিয়া ইহাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে। এই কঠোর সংগ্রাম করিবার বল পাইব উপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব হইতে। আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্মুখে পড়িয়া; আমরা কর্ম্ম করিয়া যাইব। ইহার ফল আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে চলিবে না; ঈশ্বর যখন উপযুক্ত বোধ করিবেন, তখনই আমাদিগের আত্মাতে আবির্ভূত হইবেন। আমরা যেন আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা না করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি কাহাকে কোন্ পথ দিয়া তোমার কাছে লইয়া যাও, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি এই সমাজস্থ সুহৃদবর্গের হৃদয়ে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়াছ, এখন তাহাতে তোমার করুণাবারি বর্ষণ করিয়া তাহা বৃক্ষে

*It can only be done by publishing to the world our faiths, glorying in them, proclaiming their superiority to all other known creeds...attacking what is base and false in other religions, and waging a continuous warfare in defence of the former, as we ourselves see it. Such, humanly speaking, are the only means by which we can hope to obtain wide acceptance of our beliefs.

পরিণত কর। এমন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর যেন এই সমাজ একদিন শতসহস্র লোকের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়; সকলেই যেন ইহার সুশীতল ছায়াতে বিগতপাপ বিগততাপ হইয়া সংসারের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার বিষয়ক একত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ বিবৃতি—উপধর্ম্ম।*

[নির্ম্মল প্রাতঃকাল। শীতল বায়ু বহিতেছে। সূর্য্যপ্রকাশে সমস্ত সুপ্রকাশিত। আজ ব্রহ্মোৎসব। উপাসকেরা দলে দলে কৃত্রিম উদ্যানপথ দিয়া উপাসনামণ্ডপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরে যথা সময়ে বন্দনগাথা গীত হইলে—]

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যৎশ্রবণং যদর্হণং।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দনা, যাঁহার শ্রবণ যাঁহার অর্চ্চনা লোকের পাপ সদ্য বিনাশ করে, সেই মঙ্গলশ্রবা পরমেশ্বরকে বারবার নমস্কার করি।

---

*১৮১৭ শক ৬৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ, ১১ মাঘ শুক্রবার ষট্‌ষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকোস্থ দ্বারকানাথভবনে প্রাতঃকালে বিবৃত।

সম্বৎসরকাল যে মহোৎসবের জন্য আমরা সাগ্রহ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ সেই আনন্দদিবসের শুভ সমাগম হইয়াছে। প্রতিদিন বিরলে নির্জ্জনে সেই আত্মার অন্তরাত্মার নিকটে প্রাণের কত আশাভরসার কথা বলিয়াছি, কতবার তাঁহার নিকটে আমার হৃদয়বেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা পাইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছি। কিন্তু আজিকার এই মহোৎসবের ন্যায় আনন্দের দিন আর কোথায় পাইব? এই যে আমরা শত শত ভাইবন্ধু আত্মীয়স্বজন মিলিত হইয়া, সেই সকলের অন্তরাত্মা "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" পরমাত্মার চরণে একহৃদয়ে এক-তানে আমাদের সকলেরই প্রাণের আশাভরসার কথা নিবেদন করি-বার অবসর পাইয়াছি, এমন আনন্দের দিন আর কবে আসিবে? আমাদের সকলের সমবেত হৃদয় হইতে যে অপূর্ব্ব স্তুতিগীত সেই দেবদেব পরমদেবের জ্যোতির্ম্ময় মহাসিংহাসনের দিকে সমুত্থিত হইতেছে, এই সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি কি আর ইহা কখনও ভুলিতে পারেন? এই মহান্ সঙ্গীত গাহিবার ও শুনিবার জন্যই বৎসরে বৎসরে এই উৎসবের আয়োজন এবং বৎসরে বৎসরে উৎসবের এই আনন্দকোলাহল। এই স্তুতিগীতির এমনি মহিমা যে চক্ষু নিমীলন করিয়া ধ্যানযোগে দেখিলে দেখিতে পাইব যে এই গীত শুনিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া আমাদের শূন্য হৃদয়কেও পূর্ণ করিয়া তথায় স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

এই আনন্দমহোৎসব আমরা কাহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি? এই যে পরমদেবের স্তুতিগীত গাহিবার ও শুনিবার জন্য আমরা এখানে ব্যাকুলভাবে আসিয়াছি, আমাদিগকে এরূপ ব্যাকুল করিল কে? ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগকে এরূপ ব্যাকুল করিয়া

তুলিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মধুময় আহ্বানে আমরা সকলে সমাগত হইয়া এই আনন্দোৎসব উপভোগ করিতেছি। যে মঙ্গলময় পরমপুরুষের এক ইঙ্গিতমাত্রে এই অসীম নভস্তলে কোটি কোটি গ্রহচন্দ্রসূর্য্যের সহিত এই সুমহান্ ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে; যাঁহার অনিমেষ নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্রহ্মচক্রের একটী রেণুকণাও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে স্খলিত হইতেছে না, এবং যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাতে জগতে ধর্ম্মরাজ্য অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই আনন্দময় পরমদেবতারই ইচ্ছাতে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রীতিআহ্বান শুনিতে পাইয়াছি। আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষ ঋষিগণ এই সত্যধর্ম্মকে বহু যত্নে বেদবেদান্তের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদেরই সন্তান হইয়াও আপনাদেরই দোষে তেমন অমূল্য ধনও হারাইতে বসিয়াছিলাম। অবশেষে কতিপয় মহামনা ব্যক্তি সেই অমূল্য রত্নকে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসীকে মোহিত করিলেন এবং এই পুণ্য ১১ই মাঘ দিবসে জগতের মধ্যে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সত্যধর্ম্ম প্রচারের অতি সুন্দর একটী পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন; ইহারই জন্য আমরা কৃতজ্ঞতাভরে, এত আনন্দের সহিত এই মাঘ মাসে শুভ ব্রহ্মোৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। এই শুভদিনের মঙ্গল প্রাতঃকালে যেমন এই ভূলোকে সাধুসজ্জন পুরুষেরা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রীতিভক্তি কৃতজ্ঞতা সেই বিশ্ববিধাতার চরণে নিবেদন করিতেছেন, সেইরূপ আমাদের মস্তকের উপরে দেবতারাও আমাদের আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। যাঁহার প্রসাদে আমরা অযাচিত

ভাবে কত শোভা গন্ধ, কত আনন্দ অহর্নিশি লাভ করিতেছি, যাঁহার কৃপাতে নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও এই শোভন-সুন্দর জগতে জীবিত থাকিয়া সুখে বিচরণ করিতেছি, আজ সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতাকে সম্মুখে দেখিয়া আমাদের হৃদয় হইতে দুঃখ শোক নিরানন্দ প্রভৃতি সকল প্রকার মলিনতা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার পবিত্র নাম অন্তকালেও একবার ভক্তিভরে উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, আজ তাঁহাকে এই উৎসবের মধ্যে জীবন্তজাগ্রতরূপে দেখিয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া আমরা আনন্দসাগরে অবগাহন করিতেছি।

যে সত্যধর্ম্মের কৃপায় সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতিমহান্"। তাঁহার অনন্তস্বরূপ ধারণ করিতে না পারিয়া সকলেই "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই কথাই জিজ্ঞাসা করে। তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া ভারতের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাসদেব প্রভৃতি কত শত ঋষি নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া উপনিষৎ বারংবার বলিয়াছেন "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। সেই ভূমা ঈশ্বর যেরূপ মহান্, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনি মহান্, তেমনি উদার, তেমনি অসাম্প্রদায়িক। সেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ঈশ্বর মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মও মানবাত্মাতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন ; এবং এই সত্যধর্ম্ম আমাদের এই ভারত-বর্ষে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া বেদবেদান্তাদির মধ্য দিয়া সুদূর

অতীত কাল হইতে আবহমানকাল চলিয়া আসিয়া কত সংসার-তাপদগ্ধ ব্যক্তিকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়চ্ছায়া দেখাইয়া দিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

আর, আমি রোগশোকের অধীন, পাপতাপের অধীন, জন্ম-মৃত্যুর অধীন, অজ্ঞানমোহের অধীন ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর দুর্ব্বল বঙ্গ-বাসী মাত্র। আমার সাধ্য কি যে, সেই পরব্রহ্মের মহিমা অথবা তাঁহার সেই উদার মহান্ ধর্ম্মের মহিমা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু তথাপি আমি যে আজ এই বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে, এই সাধুমণ্ডলীর মধ্যে আমার হৃদয়ের দুই চারি কথা বলিতে এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আমার সেরূপ সাহস পাইবার কারণ এই যে, যে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষের প্রকাশে গ্রহশশিতারকা, অযুত কোটী সূর্য্য, সকলই হীনপ্রভ হইয়া যায়, আজ সেই দেবদেব আমার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিতেছেন। আমি যে মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ম্মের কল্যাণে ইহা জানিয়াছি যে ইহলোকে কি পরলোকে আমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র হইলেও সেই মহান্ পরমেশ্বর আমার পরম আশ্রয় আছেন। ভয় ও বিপদের মাঝে তিনিই আমার বর্ম্মদুর্গ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন এই অসীম আকাশে বর্ত্তমান, তেমনি তিনি আমার এই চর্ম্মচক্ষের অন্তরে, আমার রসনার অন্তরে বর্ত্তমান; তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শরীরের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর অন্তরে বর্ত্তমান এবং তিনি আমার আত্মার অন্তরেও বর্ত্তমান। তিনি আমার অন্তরে আছেন, বাহিরে আছেন তিনি আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া, আমার পিতা মাতা ও সখারূপে নিয়ত সহচর হইয়া, আমার আত্মার অন্তরাত্মা

হইয়া সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। আমি তাঁহারই আশ্রয় পাইয়া, তাঁহারই বলে বলী হইয়া আজ এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মূক ব্যক্তি বাচালতা প্রাপ্ত হয় এবং পঙ্গু যে, সেও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। সুতরাং তিনি যখন আমার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিয়াছেন, তখন আমার কিসের ভয়? সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ এই ব্রহ্মোৎসবেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুনিয়াছি যে প্রথমকার ব্রহ্মোৎসবে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; আজ দেখিতেছি, এই ব্রহ্মোৎসবে এই উৎসবপ্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ। এই প্রাঙ্গন কেন, আজ এখানকার মত কত স্থানে এই ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে—সকল স্থানেই গিয়া দেখ, সেই সেই স্থানের উৎসবপ্রাঙ্গন আজ লোকে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মুক্তির প্রকৃত সরল উপায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সকলের অন্তরের ধন, এতদিনে লোকে তাহা বুঝিয়াছে বলিয়াই আজ ব্রহ্মোৎসব সকলের এতদূর আকর্ষণের বিষয় হইয়াছে।

আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই অন্তরের ধন, কারণ ইহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। আধ্যাত্মিক সত্যসমূহই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্রদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি সকল বৈচিত্র্যের মূল, সকল সংসারের একাধিপতি, তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান নরনারীর আত্মা। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাত্মার অন্তরে অন্তরাত্মারূপে থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান অহর্নিশি আত্মাতে প্রেরণ করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকল সত্য অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে মুক্তির সরল পথ দেখাইয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাগযজ্ঞের বহুল আড়ম্বর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া

অধ্যাত্মযোগের ও মুক্তির উপায়স্বরূপ যে চারিটী বীজ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে "সর্ব্বস্রষ্টা, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনা দ্বারাই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।" ঈশ্বরোপাসনারূপ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের যে ঐহিক মঙ্গল ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়, আমরা স্বয়ংই তাহার ভোক্তা; অপর কেহ তাহার অংশভাগী হইতে পারে না। আর, পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের যে ঐহিক অমঙ্গল ও পরলোকে দুর্গতিলাভ হয়, তাহারও ভোক্তা আমরা স্বয়ং—তাহারও অংশভাগী অপর কেহ হইতে পারে না। ঈশ্বরের আদেশমতে আমাদিগের প্রত্যেককে আপনার আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। তিনিই পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের মোচয়িতা। পুণ্যের চরম পুরস্কার যেমন একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, তেমনি তিনিই একমাত্র আত্মাকে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন। সেই শরণাগতবৎসলের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত পাপমলিনতা হইতে মুক্তি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

উপধর্ম্মের সেবা করিয়া আমরা এরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সহজ সত্যটুকু ধারণা করিতে পারি না। আমরা জাগ্রতভাবে বিচারপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা মোহমুগ্ধ হইয়া থাকিতে অধিকতর ভালবাসি। আমাদের নিকটে যুক্তিবল ও শাস্ত্রবল সকলই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রসমূহের যে অংশে ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ব্যক্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, আমরা সেই অংশ লইয়াই আপনাদিগকে প্রবোধ দিয়া থাকি। কিন্তু যে অংশ মনুষ্যকে জাগ্রত করিয়া ধর্ম্মপথে

অগ্রসর করিতে চাহে, আমরা স্বীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্যের বৃথা আপত্তি করিয়া তাহার উপদেশ ও আদেশ প্রতিপালন করিতে নিরস্ত থাকি। উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমির যে কিরূপ অবনতি ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার উপর, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বর্ত্তমানকালে কতকগুলি কৃতবিদ্য ভারত-বাসী উপধর্ম্মের অসত্যভাব উপলব্ধি করিতে করিতে অবশেষে ধর্ম্মের উপরেই অশ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহারা তাঁহাদের কোন কর্ম্মে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না। তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে প্রশস্তহৃদয় হইবার পরিবর্ত্তে কিছু সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। চতুর্দ্দিকে যে সত্যধর্ম্মের উৎস সকল সংসারমরুভূমি ভেদ করিয়া উৎসারিত হইতেছে, তাহা তাঁহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দৃষ্টি করেন না। হায়! এই ভারতবর্ষকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপধর্ম্ম আনয়নের ফলে যে লোকে উপধর্ম্ম হইতে পুনরায় নাস্তিকতার দিকে যাইবে, তাহা কে জানিত? ভারতের এপ্রকার অদৃষ্ট ভাবিতেও কি কষ্ট! আমরা যেন সকলে পুনরায় সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করি এবং অধ্যাত্মধর্ম্মের আদি জননী বলিয়া ভারতভূমির যে গৌরব আছে, তাহাও অক্ষুণ্ন রাখি।

উপধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতায় আত্মা যে বিকৃত ও মলিন হইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে বংশবৃক্ষ মুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে গগন ভেদ করিয়া উচ্চতায় সুবৃহৎ অট্টালিকাকেও পরাজিত করে, তাহাকে প্রথম হইতে কোন পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে তাহা বংশ নামের অযোগ্য হইয়া নিতান্ত বিকৃতাকার ধারণ করে। একটা প্রাণময় জড়পদার্থও যখন সঙ্কীর্ণ বন্ধনের মধ্যে

থাকিলে সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের আত্মাও যে বদ্ধভাবে থাকিলে বিকৃত হইয়া পড়িবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। আমাদের আত্মা যেমন একদিকে লৌহ অপেক্ষা শতগুণ দৃঢ়তর, তেমনি ইহা সুকোমল কিসলয় অপেক্ষাও কোমলতর। সত্যধর্ম্মের মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিতে পারিলেই আত্মার প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয়, স্বাস্থ্য ও বল আইসে।

সত্যধর্ম্মের মূলভিত্তি ঈশ্বরপ্রীতি, উপধর্ম্মের মূলভিত্তি ঈশ্বরভয়। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় বীজে ঈশ্বরপ্রীতিকেই ব্রহ্মোপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের প্রত্যেককে স্বীয় আত্মার দিকে চাহিয়া ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য উপদেশ দেন। পাপতাপে দগ্ধ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে সেই দীনদয়ালের চরণে গিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে উপদেশ পাইয়াছি; পাপের জন্য সেই রুদ্রদেবের হস্তে বজ্রদণ্ড পাইলেও তাহা ঔষধ বলিয়া অমৃত বলিয়া মস্তকে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে ইহাও শিখাইয়াছেন যে সেই প্রেমময়ের বিরহে কাতর হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আপনার দুর্লভদর্শন স্বপ্রকাশরূপ দেখাইয়াও, তিনি আপনাকে দিয়াও সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। আমরা ব্রহ্মোপাসক হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে এতটুকুও ব্যবধান সহ্য করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের পরম স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময় পিতা; তিনি আমাদের এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে ওতপ্রোত আছেন; তিনি আমাদের আত্মাতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। প্রকৃতই পরমাত্মা

ও জীবাত্মার মধ্যে সামান্যও ব্যবধান নাই। ইহাঁদের মধ্যে সৃষ্ট বস্তুমাত্রকেই ব্যবধান করিলে তাহা ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় হইয়া উঠিবে। তাই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের সময় এই একটী প্রধান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি যে "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিব না।" মূর্ত্তি হউক, জীবজন্তু বা মনুষ্য হউক, আমরা কোন সৃষ্ট পদার্থকেই ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে পারিব না। আশ্চর্য্য এই যে, বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীতে আমাদিগের উপনিষদাদিনিহিত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সাধু পুরুষেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছেন; আর আমরা ঋষিদিগের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তির ভান দেখাইলেও, বাস্তবিক তাঁহাদিগের উপদেশ অবহেলা করিয়া উপধর্ম্মের উপদেশে মনুষ্যপূজা প্রভৃতি পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভের কত গুরুতর ব্যবধান সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া দেখ, দেখিবে যে, শাস্ত্রকার ঋষিমুনিগণ সত্য ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে বেদবেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকেই অশ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মনোগত ভাব এই ছিল যে, যেখান হইতেই হউক, যে কোন উপায়ে হউক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই হইল। উপনিষদ কেমন বলের সহিত বলিয়াছেন—

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণন্নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ প্রভৃতি সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, কেবল যাহা দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। উপনিষদ গীতা প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানকে যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিবেন, তাহা

কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যে শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করিবার জন্য পৌত্তলিকতারূপ সোপান-ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং যে শাস্ত্রের অপব্যবহার করিয়া আমরা ব্রহ্মদর্শনের নানা অন্তরায় আনয়ন করিয়াছি, সেই তন্ত্রশাস্ত্রেও কেমন তেজের সহিত উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মবিদ্যাসমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাসমা ক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যাসমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥

ব্রহ্মবিদ্যার সমান বিদ্যা নাই, ব্রহ্মবিদ্যার সমান ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার সমান জ্ঞান নাই। আবার, যাঁহারা অধম জীব মর্ত্ত্য মানবকে ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে চাহেন, চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে অতি কঠোররূপে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছেন—

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

আমরা শাস্ত্রোক্ত এই সকল উপদেশ অতীব সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি বটে, কিন্তু আমরা আজকাল এত তেজোহীন, এত বলহীন হইয়া পড়িয়াছি যে এই সত্যকথাটুকুও বলিতে কেমন যেন সঙ্কুচিত হই—এতদনুসারে কার্য্য করা, ইহাকে জীবনে পরিণত করা তো দূরের কথা।

মূল কথা এই যে ঋষিদিগের ন্যায় ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিতে গেলে কিঞ্চিৎ কঠোর সাধনা আবশ্যক—আমাদের কিন্তু সে সাধনা নাই। পরমেশ্বরের অনন্ত সত্যভাব, অনন্ত মঙ্গলভাব, অনন্ত প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই অনুসরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য এবং অধিকার ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এই অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব

রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের যে প্রকার সাধন করা কর্ত্তব্য, যে প্রকার স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, সংসারের সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করা আবশ্যক, আমরা তাহা করি না বলিয়াই ব্রহ্মকে সকল সময়ে আমাদের জীবনের ধ্রুবতারারূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হই না। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও হৃদয়ের সমুদয় প্রীতিভক্তি দ্বারা পূজা করা আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপযুক্ত সাধনের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হইবে—কখন সেই বিদ্যুৎপুরুষ আসিয়া তথায় অধিষ্ঠান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী উপাখ্যানে আছে যে, "অলিঙ্গং অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বর নারদকে বলিতেছেন যে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একবারমাত্র দেখা দেন; সেই দর্শনলাভে যদি সে মোহিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ন করে, তবে তিনি তাহারই হৃদয়ে চিরবিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন।" প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে একবার ধর্ম্মপিপাসা, ঈশ্বরকে জানিবার পিপাসা আসিবেই; সেই পিপাসা উপস্থিত হইলেই বিদ্যুৎপুরুষ পলকমাত্র দেখা দেন এবং সেই সময়ে যে ব্যক্তি যতটুকু পরিমাণে প্রস্তুত থাকেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে সেই বিদ্যুৎপুরুষের বিদ্যুতাগ্নি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই আমাদিগকে জ্বলন্ত ঋষিবাক্যে সেই মহান্ পুরুষ পরমদেবকে আত্মাতে চির-অধিষ্ঠিত দেখিয়া চিরকৃতার্থ হইতে উপদেশ দিতেছেন—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং" তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্যসুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। বন্ধুগণ! আজ যেন আমরা এই ব্রহ্মোৎসবের দিনে শুভ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই

মহান্ উপদেশ গ্রহণ করিয়া পূর্ণহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করি এবং এই উপদেশ যেন জীবনে পরিণত করিয়া এই ব্রহ্মোৎসবকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখি।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! এই মহাশূন্যে তোমারই শাসনে চন্দ্রসূর্য্যের, দ্যুলোক ও ভূলোকের অবিরোধে অবস্থিতিতে তোমার অতুলনীয় শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি। মনুষ্যসমাজে তোমারি ধর্ম্ম সেতুস্বরূপ হইয়া যে সংসারকে রক্ষা করিতেছে সেই সংসারে থাকিয়া আমরা তোমারি অনুপম স্নেহ নিত্য অনুভব করিতেছি। তোমারি প্রসাদে নদীসমুদ্র ধরণীকে শস্যশ্যামলা করিয়া আমাদিগের জীবনরক্ষার উপায় করিতেছে। তোমারি প্রসাদে আমরা পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র, ভাইভগিনী সকলের সুকোমল প্রেম নিত্য নূতন ভাবে অনুভব করিতেছি, এবং তোমারি প্রসাদে আজ এই শুভ উৎসবে তোমার অনুপম আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া কত আনন্দিত হইতেছি। হে পরমাত্মন্! আমরা দুর্ব্বল ভ্রান্ত জীব, তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর এবং তোমার জ্ঞানালোকে প্রেমালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার চূর্ণ করিয়া দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে উপধর্ম্ম বিষয়ক দ্বাত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

ত্রয়ত্রিংশ বিবৃতি—সংশয়াত্মা।*

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক অতীত হইতে চলিল, একদিকে উপধর্ম্মের ভ্রান্ত মত অপর দিকে নাস্তিকতা এই দুইটী বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইয়াছেন যে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির যাহা সনাতন ধর্ম্ম, তাহা নাস্তিকতার সহস্র কুটতর্কে টলিবার নহে। তাহা অটল এবং তাহাই জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের মূলভিত্তি। কিন্তু আজকাল কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, কি প্রাচ্য ভূখণ্ডে ধর্ম্মের প্রতি কেমন এক উপেক্ষার ভাব প্রবাহিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে, কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে, ধনীদের মধ্যে, নির্ধনের মধ্যে, অলস মূর্খদের মধ্যে, বিদ্বান্‌দের মধ্যে, সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, শোনা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের প্রতি কেমন এক উপেক্ষার ভাব বহিতেছে। কুসংস্কার সংশোধন করিতে করিতে এক মোহ আসিয়া পড়িয়াছে—এখন তাহারা আর ধর্ম্মকেও রাখিতে চাহে না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে যখন এটা কুসংস্কার দেখিতেছি, ওটা কুসংস্কার দেখিতেছি, তখন ধর্ম্মই যে একটা কুসংস্কার নয় তাহার প্রমাণ কি? পরকাল যে আছে, কয়জন মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া তাহার তথ্য বলিতে পারিয়াছে? আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তাহা কে ঠিক করিয়া বলিতে পারে? এ পর্য্যন্ত কত মানবদেহ অস্ত্রের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, আত্মা থাকিলে কি অন্ততঃ একটীও দেখিতে পাওয়া যাইত না? ঈশ্বর যে আছেন,

---

* ১৮১৬শক, চৈত্র সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

তাহা আস্তিকেরা মনকে প্রবোধ দিবার জন্য কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যাঁহাকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাঁহার অস্তিত্বে কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? এই প্রকার বৃথা তর্ক আজ কাল অনেকেরই বিশেষতঃ ছাত্রদিগের মনকে আক্রমণ করিতেছে। অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা যদি বা দৈবাৎ এই প্রকার সংশয়ে পড়িল, অমনি অধিকবয়স্ক দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্রেরা, এবং এমন কি শিক্ষকেরাও, অনেক স্থলে সেই সংশয়াগ্নিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে এবং তাহা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের চিরজীবনের বিষকীট হইয়া থাকে।

যে আর্য্যজাতির প্রত্যেক কর্ম্ম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিতে হয় বলিয়া আজও আমরা গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের এতদূর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা নাস্তিকতার দিকে যাইতে উন্মুখ হইতেছি; ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল সকলই ভুলিয়া যাইতেছি। দিনে নিশীথে অন্তত একবারও কি সেই পরমদেবকে—যিনি জননীর হৃদয়ে স্নেহনীর দিয়াছেন, যিনি সূর্য্য চন্দ্র বায়ু জল সকলকেই আমাদের প্রাণধারণের নিমিত্ত সুধারসে সিক্ত রাখিয়াছেন— সেই পরমদেবকে কি অন্তত একবারও স্মরণ করিব না? আমরা ধর্ম্মকে কি প্রকারে ভুলিব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মকে হৃদয়ের ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর আমরা তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভুলিয়া যাইব? তাহা অসম্ভব। আমরাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের নিকটে শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ করিতেছি যে ধর্ম্মই জগতকে ধারণ করিতেছেন। ধর্ম্মই এই বিবাদপরিপূর্ণ জগতসংসারে শান্তিবায়ু আনয়ন করিতেছেন। এখানে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

যে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে; আত্মা, ঈশ্বর, পরকালে অবিশ্বাস করে,

সে কত দীন, কৃপাপাত্র; তাঁহার দুরবস্থা কত, তাহার অসুখই বা কি। সে জানে না যে, সে জগতে কেনই বা জন্মগ্রহণ করিল, কোথায় বা যাইবে; মৃত্যুর পরপারে দৃঢ় আশ্রয় আছে অথবা, কেবলি অন্ধকার—এ সকলই তাহার পক্ষে গভীর প্রহেলিকা। সে ইহার তত্ত্ব অন্বেষণ করিতেই চাহে না, কারণ সে পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া রাখিয়াছে যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি কিছুই নাই—দেহ কতকগুলি জড়পদার্থ বা জড়শক্তির সমষ্টি মাত্র; আর চৈতন্য সেই শক্তিসমষ্টিরই বিকাশ। এরূপ ব্যক্তির পাপাচার করিয়া স্বীয় জীবনকে চিরনষ্ট করিবার পক্ষে কোনই দৃঢ় বাধা দেখা যায় না। এই কারণে গীতা সংশয়াত্মাদিগকে মর্ম্মস্পর্শী কথার দ্বারা সাবধান করাইয়া দিতেছেন—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

নাস্তিকের ইহলোক নাই, পরলোক নাই, কোন সুখই নাই; সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

নাস্তিকের শান্তি কোথায়? তাহার প্রিয়জন যখন রোগে কাতর, তখন তাহার কি ভয়ানক অবস্থা। একদিকে প্রকৃতির দয়ামায়া-রহিত শক্তি সমূহ, অপরদিকে দিশাহারা সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য। আস্তিক সকল প্রকার বিপদের অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় থাকে, কিন্তু নাস্তিকের নির্ভর করিবার স্থল নাই; প্রার্থনা করিয়া আপনার হৃদয়কে শান্তি দিতে সে অক্ষম। কোন পাশ্চাত্য নাস্তিবাদ-প্রচারকের উক্তি হইতে আমরা উপরোক্ত গীতাবাক্যের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করি। * তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন

* David Hume.

যে "আমি আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিরোধরাশির বিষয় যতই তলাইয়া দেখি, ততই গাঢ়তর অন্ধকারে পড়িতে থাকি ; আমি কে ; আমি কোথায় ; কাহাকেই বা ভক্তি করিব ; কাহাকেই বা ভয় করিব, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি চতুর্দ্দিকে কেবলি অন্ধকার দেখি, আমার অঙ্গ সকল অবশ হইয়া আসে।" নাস্তিক-হৃদয়ের কি ভয়ানক অবস্থা !

কিন্তু একটী প্রকৃত আস্তিককে দেখ, তাহার হৃদয়ের অবস্থা নাস্তিক হইতে কি বিপরীত। তাহার প্রিয়জন যখন রোগে কাতর, তখন সে ঈশ্বরেরই চরণে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে। সে জানে যে তাহার প্রিয়জন ইহলোকেই জীবিত থাকুক অথবা পরলোকেই গমন করুক, মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যের সীমা অতিক্রম কিছুতেই করিতে পারিবে না, তখন কিসের ভয় এই অভয়ধামে ? সে প্রস্ফুটিত কুসুমদলের সৌন্দর্য্যে সেই চিরসুন্দর পুরুষের সৌন্দর্য্যের আভাস পায় ; পদ্মবনের সৌগন্ধে "তাঁহারই গাত্রের সৌগন্ধ" পাইতে থাকে ; শারদীয় জ্যোৎস্নার বিমল বিকাশে তাঁহারই প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পায়; প্রভাতের সমীরণের নিকট তাঁহারই মধুর কথা শুনিতে থাকে। সে যেমন শরতের প্রশান্ত প্রভাতের মধ্যে সেই শান্তস্বরূপের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পায়, সেইরূপ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যেও তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি জাগ্রত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। মহান্ জলধির মাঝে সে যেমন ঈশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিভাত দেখে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মহিমাতেও সেইরূপ তাঁহাকেই দেখিতে পায়। তাই উপনিষদকার বলিয়াছেন —

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

দ্যুলোক ইহাঁর মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, দিক্ সকল ইহাঁর কর্ণ, বিবৃত জ্ঞান ইহাঁর বাক্য, বায়ু ইহাঁর প্রাণ, বিশ্ব ইহাঁর হৃদয় ও পৃথিবী ইহাঁর চরণ এবং ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

আস্তিক ব্যক্তি দেখে যে তাহার ন্যায় কত অসংখ্য মনুষ্য সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়া ঈশ্বরের করুণা ভোগ করিতেছে। আস্তিক ব্যক্তি কেবল বাহিরে বাহিরেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। আত্মার মধ্যেও তাঁহাকেই দেখিয়া কৃতার্থ হয়। রোগ শোকে, পাপতাপে সহস্র কষ্ট পাইলেও সে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিয়া কত না সান্ত্বনা পায়। সেই সময়ে সে তাহার হৃদয়ের প্রীতিভক্তি, স্নেহ প্রেম প্রভৃতির মধ্যে এক অপূর্ব্ব শান্তি পায়, নাস্তিক ব্যক্তির ন্যায় তাহার নিকটে এই সকল কিছুই প্রহেলিকা নহে; সকলেতেই ঈশ্বরের ছায়া বর্ত্তমান দেখে। আস্তিক ব্যক্তির হৃদয় ঈশ্বরকে দেখিয়া যে প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয় তাহা এই সঙ্গীতেই প্রকাশ পাইতেছে "আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে। দেখ রে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময় একদৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত আছেন তাকায়ে; শূন্য পূর্ণ আজি।"

আরও ইহা দেখিতে পাই যে জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল সূত্রপাত ধর্ম্মের দ্বারাই হইয়াছে; অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক এই ভারতবর্ষেই ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৈদিক যুগের শাণ্ডিল্য ঋষি প্রথম আবিষ্কার করিলেন যে আত্মাই পরমাত্মদর্শনের প্রকৃষ্ট স্থান। আর সেই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়াই ভারতের কত উন্নতি হইল; কত উচ্চ আদর্শ ধরিয়া কার্য্য করিতে গিয়া ভৌতিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকারেরই

কত উন্নতি হইল—উপনিষদ্‌ই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দেখ, সেই উপনিষদের আদর্শ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের প্রতি কত সাধুবাদ প্রয়োগ করিতেছেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—কেবল এই যে, প্রতীচ্য ভূখণ্ডও এই আদর্শে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছে; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বিরোধের কারণ অচিরেই লুপ্ত হইয়া গিয়া পৃথিবী আর এক নূতন শ্রী ধারণ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন যে গীতোপনিষদ্ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ভারতে ধর্ম্মভাব আজ পর্য্যন্ত কতটা জাগ্রত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া কত সময়ে আপনাকে উন্নত করিয়াছি। আজও সেই সকল উপদেশ কত সংসারবিদগ্ধ ব্যক্তিকে শান্তি দান করিতেছে। মানব উন্নত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও উন্নতি সাধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। আবার যখন চৈতন্য প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন ভারতের অবনতির স্রোত চলিতেছিল—তাহা প্রতিরুদ্ধ হইল। সেই প্রেমের প্রবাহবলেই সঙ্কীর্ত্তন উত্থিত হইল এবং আজও হয় তো তাহা কত বিপথগামী ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত করিয়া তাহাকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করে। আবার এই বিপ্লবের পর বিপ্লব চলিয়া গেল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিলেন। বর্ত্তমানে যে প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞানের শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সনাতন ঋষিসেবিত আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম না উপস্থিত হইতেন, তবে এই ভারতের কি যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। বৈদিক ঋষিদের গভীর অধ্যাত্মযোগপ্রসূত ধর্ম্ম যদি আমরা না প্রাপ্ত হইতাম,

তাহা হইলে আজ আমরা কি হইতাম, কোথায় দাঁড়াইতাম ? ধন্য ঋষিগণ ! তোমরা আমাদের সম্মুখে এত অমূল্য বস্তু সঞ্চিত রাখিয়াছ, আর আজ একবার তোমরা আসিয়া দেখ যে আমরা কি শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছি ; আমরা মোহমদে মত্ত হইয়া অসৎকে সৎবোধে আলিঙ্গন করিতেছি। ধিক্ আমাদিগকে। তোমরা আর একবার উপস্থিত হইয়া আমাদের পথপ্রদর্শক হও—আমাদের সৎপথ দেখিবার ক্ষমতা আমরা আপনাদের দোষে হারাইয়াছি।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ ! তোমরা আর বিলম্ব করিও না—ব্রহ্মকে অবলম্বন কর, তাঁহাকেই হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও। তর্ক করিয়া তাঁহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না। এমন বলিও না যে, যখন অমুক অমুক নাস্তিক শত শত আস্তিক অপেক্ষা ভাল অতএব নাস্তিকতাতেই প্রকৃত মঙ্গল—এরূপ ভ্রমে পড়িও না। যে সকল নাস্তিক সদাচরণ করেন, তাঁহারা আস্তিকেরই পথানুসরণ করেন এবং যে সকল আস্তিক ব্যক্তি অসদাচরণ করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকেরই পথানুসরণ করেন। এই সকল বৃথা তর্কে কালক্ষেপণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করিওনা। আপনাকে তাঁহারই পথে লইয়া চল, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে সংশয়াত্মা বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ বিবৃতি—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের অন্তরায়।*

আজ আমি আপনাদিগের এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। অনেক দিন হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেখিতাম যে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে এবং আপনাদিগের সাদর নিমন্ত্রণ পত্রও প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু আজ আমি আপনাদিগের উৎসবে যথার্থরূপে যোগদান করিতে পারিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনাদিগের উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ বক্তৃতার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র—বয়সে যেমন ছোট, সকল বিষয়েই তেমনি ক্ষুদ্র। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছি—আপনার স্বার্থ বলিদান করিতে পারি নাই; আপনার মান অপমান বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই। আমা হইতে কত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তথাপি আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহা বক্তৃতা করিবার জন্য নহে—কেবল নিজের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য। ব্রাহ্মসমাজে কিছু কার্য্য করিতে পারায় আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহাই আজ এই উৎসবের দিনে এখানকার বন্ধুগণের সহিত উপভোগ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

ধর্ম্মদানে যে সুখ তদপেক্ষা আর কিসে অধিক সুখী হওয়া যাইতে পারে? ভূমি দানের পর আর দান নাই কিন্তু বিদ্যাদান আরও পুণ্যজনক। কিন্তু যে ধর্ম্মের জন্য জগতের লোকসকল উন্মত্তপ্রায়

---

* ১৮৮৩ শক, ৯ই আষাঢ় সোমবারে সায়ংকালে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে বিবৃত।

হইয়া উঠে, যে ধর্ম্মের আধার ঈশ্বরকে পাইবার পিপাসা প্রতি জনের হৃদয়ে অন্ততঃ একবার না একবার তীব্রভাবে ঝঙ্কার দিয়াছে; যাহার জন্য কত লোকে জগতে তুচ্ছ সুখ দুঃখকে, তুচ্ছ ধনজন মান অপমানকে পদাঘাত করিয়াছে—তথাপি ধর্ম্মের অন্বেষণ না পাইয়া শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, সেই ধর্ম্ম-প্রচারের যিনি সহায়তা করেন, তিনি যে পবিত্র সুখ উপলব্ধি করেন, সে সুখের কাছে আর কি সুখ আছে?

এখানে উপস্থিত অনেক ব্যক্তিরই স্মরণ হইতে পারে যে, কতিপয় উন্নতচেতা ব্যক্তি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী সভার ন্যায় এই ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দিগদিগন্তে বিস্তার করিবার জন্য সত্য-জ্ঞান-প্রচারিণী সভা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা কেবল এই স্থানে সভা স্থাপনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের উৎসাহ তখন এমনি প্রদীপ্ত ছিল যে তাঁহারা, যাহাতে পল্লীগ্রামের কুটীরবাসী পর্য্যন্ত পবিত্র অধ্যাত্মধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার জন্য বেহালায় সেই সভার শাখারূপে নিত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন।

ধন্য তাঁহাদের উৎসাহ! তাঁহাদিগের পরিশ্রমে না জানি ব্রাহ্মসমাজের কত উপকার সাধন হইয়াছে। আজ যদি ব্রাহ্ম-দিগের অন্তঃকরণে সে উৎসাহ, সে ঈশ্বরপরায়ণতা, সে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনের ভাব জাগরূক থাকিত, তাহা হইলে কি আজ ব্রাহ্মসমাজের এরূপ দুরবস্থা দেখিতে হইত? যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রত্যেক ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি প্রাণপণে যথাসাধ্য, ফলদাতা ঈশ্বরের হস্তে ফলদানের ভার ন্যস্ত করিয়া, তাঁর করুণার উপর নির্ভর করিয়া, বিন্দু পরিমাণেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নবান্

হইতেন, তাহা হইলে হয়তো আজ দেখিতে পাইতাম যে কোথায় বঙ্গদেশ, কোথায় পঞ্জাব, কোথায় বম্বে মাদ্রাজ, সকল দেশের সকল লোকে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি অবিদ্বান্, সকলেই সমস্বরে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর জয়ঘোষণা করিতেছে। তাহা হইলে আজ হয়তো দেখিতে পাইতাম যে সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রাতৃসৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আত্মার পরিত্রাণের নিমিত্ত একপ্রাণে সমস্বরে সেই বিশ্বপিতা 'পাবনং পাবনানাং' পরমেশ্বরকে ডাকিতেছে।

কিন্তু আজ কাল কি দেখিতেছি! আজ কাল যেন ব্রাহ্মদিগের অন্তরে সেরূপ উৎসাহ নাই, সেরূপ উদ্যম নাই। কি এক বিষময় নিরুৎসাহের ভাব যেন ব্রাহ্মসাধারণের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে ইহার কতকগুলি কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে একপ্রকার অবহেলা প্রদর্শন করেন; তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্যের গুরুতর ভার সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন না। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে যখনই ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছেন,তখনই একটা কঠিন দায়িত্ব আপনাদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। এই ভাবটী যত দিন কেহ অন্তরে স্থান না দিবেন,ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আশা দুরাশা মাত্র। অনেকে মনে করেন যে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অবশ্য স্বীকার করি যে,অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কাল্পনিক দেবদেবীর উপাসনাই এই বঙ্গদেশে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছিল ; রাজা রাম মোহন রায় সেই সময়ে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়

উত্থিত হইয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে অকাট্য শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি সমূহ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মকে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছিল? তাহা নহে। উপধর্ম্ম যদি বা দূর হইল, পাপপুণ্যের একাকার-ভাব-প্রবর্ত্তক নীরস শুষ্ক যে অপ্রকৃত বেদান্ত মত, তাহাই আসিয়া উপধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পূজ্যপাদ মহর্ষি এই শুষ্ক অপ্রকৃত প্রচলিত বেদান্তমতকে নিরস্ত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির স্রোত, তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব ব্রাহ্মসাধারণের হৃদয়ে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইহার পরে আমাদিগের জন্যও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। জ্ঞানের যুগ গিয়াছে, প্রীতির যুগ গিয়াছে; এখন কর্ম্মের যুগ আসিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানপ্রচার করিয়া সকলকে চেতনা প্রদান করিলেন; পূজ্যপাদ মহর্ষি সাধারণের হৃদয়ে ব্রহ্মপ্রীতি জাগ্রত করিয়া দিয়া সকলকে ব্রহ্মের পথে আর এক পদ অগ্রসর করিয়া তুলিলেন। এখন আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া দেখাইতে হইবে যে, আমরা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে গেলেই পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে প্রবেশ করা আবশ্যক। আমাদিগের এই বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানযুগ ও প্রীতিযুগ যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া কর্ম্মযুগে পরিণত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য আর কি অবশিষ্ট আছে? দু-একটী দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝান যাইতে পারে যে এখনও বহুল কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে। আমি অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিদ্যা-

লয়ের ছাত্র থাকিয়া যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এই মনে হয় যে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি একপ্রকার গরলপূর্ণ তাচ্ছীল্যভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমাদের কি প্রাণপণ কর্ত্তব্য নহে যে তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে সেই প্রকার ভাব সকল উন্মূলিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মের পবিত্রতা মুদ্রিত করিয়া দিই? এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারাও বেশ জানেন যে বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ধর্ম্মের ভাব অপেক্ষা অধর্ম্মের ভাবই অধিকতর লাভ করেন। যখন চারিদিকে এইরূপ দুষ্ট সমীরণ বহিতেছে, তখন কোন্ পিতা আপনার সন্তানগণকে প্রকৃত ধর্ম্মে শিক্ষা না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এইখানেই ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পড়িয়া রহিয়াছে—ভবিষ্যৎ বংশকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে হইবে; ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দিবার একটী সুপ্রশস্ত স্থান। ধর্ম্ম যাহাতে বংশানুক্রমে চির প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার উপায় করা আমাদিগের একটী অপরিহার্য্য কর্ম্ম, কারণ ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজ থকিতে পারে না এবং অন্য কোন প্রকার শুভকর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না; "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। ভবিষ্যৎ বংশকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে কেবল উপদেশের দ্বারা সেরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত চাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথার্থ ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে; প্রীতি ভক্তির সহিত সকল কার্য্যে সেই অখিলমাতা বিশ্বপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে হইবে। যে পরিবারের প্রতি জনের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মভাব প্রবেশ লাভ করে, সে পরিবার কি সুখের পরিবার! এবং সে পরিবারের মধ্যে যদি কোন সুকুমার-

মতি বালক থাকে, তবে সে কি অন্তরে নীরব থাকিতে পারে? তাহার হৃদয় কি ধর্ম্মের পবিত্র ভাবে, ধর্ম্মের জীবন্ত ভাবে মগ্ন হইতে শিক্ষা না পাইয়া থাকিতে পারে?

ছাত্রদিগের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী ভয়ানক ভাব প্রবেশ লাভ করিতেছে—তাহা জড়বাদ। প্রসঙ্গত, একটী তর্ক সহজ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইতেছে—আমি আহার করিবামাত্রই, আমার ইচ্ছা হউক বা না হউক, পরিপাক হইতে আরম্ভ হইবে, ইহার বেলায় আমার ইচ্ছা কোনরূপে কার্য্য-করী হয় না; আর কোন সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম করিবার কালেই আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এইরূপ উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছার স্বাধীনতা, উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছার পরাধীনতা—ইহা কি কখনও জড় অণুসমূহের সংহতি মাত্রের কার্য্য হইতে পারে? যিনি স্বয়ং চেতনাবান্ এবং যিনি "চেতনং চেতনানাং" চেতনাবিশিষ্ট জীব-গণের চেতয়িতা, ইহা কি তাঁহার কার্য্য না হইয়া যাইতে পারে? অতি পুরাকালে, যখন সমস্ত জগত অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, যখন কেবলমাত্র ভারতীয় আর্য্য ঋষিদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা নূতন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, সেই পুরাতন বৈদিক কালে বিশ্বামিত্র ঋষি এই ভাবটি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; তিনিই বলিয়াছেন যে "ত্রিলোক প্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞানশক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।" এই জড়বাদ "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"; আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক অনেকেরই দেখি-য়াছি যে এই জড়বাদের কুযুক্তি সকল প্রথম প্রথম অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু যখন এই কালফণীর আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারা ক্লেশ হইতে ক্লেশে, দারিদ্র্যদুঃখ হইতে দারিদ্র্যদুঃখে

নিপতিত হয়, তখন তাহাদিগের চেতনা হয়; তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে ধর্ম্মের রাজ্যে না থাকিলে আর নিস্তার নাই। এই জড়বাদের গতিরোধ করা ব্রাহ্মসমাজের আর একটী অতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার এই ত উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পিতার কর্ত্তব্য যে স্বীয় সন্তানদিগকে সেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। এই ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে পূর্ব্বে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল; শুনিয়াছি পূজ্যপাদ মহর্ষি প্রভৃতি কয়েক সাধু ব্যক্তি নিয়মিত রূপে এখানে উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ শুনিতে এমন কি অনেকে দূরস্থান হইতেও পদব্রজে আগমন করিতেন, ইহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কিরূপ উপকার হইয়াছে, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত (এক্ষণে পরলোকগত), প্রভৃতি অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একটী অন্তরায়ের কথা বলিয়াছি তাহা ব্রাহ্মগণের স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন। এইবারে আর একটী অন্তরায়ের কথা বলিব—তাহা এই যে, অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝেন না। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও স্বাধীনতা নামের যোগ্য হইতে পারে না। স্বাধীনতার অর্থ আপনার অধীনতা, যেটী ভাল সেইটী করিতে সক্ষম হওয়া এবং যেটী মন্দ সেইটী ত্যাগ করিতে সক্ষম হওয়া। কিন্তু ভালমন্দের অবিচারে ব্যবহার করাই স্বাধীনতার অপব্যবহার। প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি যে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে, সেই বিষয়ই আমাদের প্রতিপাল্য এবং তাহা-

তেই আমাদিগের স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত মত সময়ে সময়ে ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরোধীও হইতে পারে। এই ব্যক্তিগত মত ও প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি এক ও অভিন্ন ভাবে সময়ে সময়ে চিন্তিত হয় বলিয়া স্বাধীনতার অর্থ বিপরীত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে।

আবার আরও দেখিতে হইবে এই যে, কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে বলিয়া যে সকলগুলিই একই সময়ে করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সত্য দুই প্রকার, এক নির্ব্বিশেষ সত্য, আর এক বিশেষ সত্য। মাধ্যাকর্ষণের বলে সকল বস্তুই পড়িয়া যায়, এই একটী নির্ব্বিশেষ সত্য; কিন্তু এটী পড়িতেছে, কি ওটী পড়িতেছে, কি কোন বিরোধী বলের দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে এই বস্তুটী পড়িতেছে না—এই সকল হইল বিশেষ বিশেষ সত্য। কর্ত্তব্যও সেইরূপ দুইপ্রকার, এক নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্য, আর এক বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য। শরীর অসুস্থ হইলে গুরুপাক দ্রব্য আহার নিষেধ, এইটী হইল অসুস্থ শরীরের পক্ষে নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্য; কিন্তু এই জিনিষটী খাওয়া উচিত, কি ওই জিনিসটী খাওয়া উচিত—এইগুলি তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য। আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজেরও কর্ত্তব্য দুই প্রকার। ঈশ্বরের উপাসনা—ঈশ্বরবোধে অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা না করা; কোন গৃহকর্ম্মে, কোন অনুষ্ঠানে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ না করা; সত্যকথা বলা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অর্থাৎ এই কর্ম্মগুলি ব্রাহ্মমাত্রেরই সকল অবস্থায়, সকল দেশে এবং সকল কালে করা কর্ত্তব্য। আর সমাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার, এইরূপ কতকগুলি কর্ম্ম দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইগুলি সাধন করি-

বার সময়ে দেশকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে।

প্রত্যেক জাতীয় সমাজই কতকগুলি জাতীয় মঙ্গলজনক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সেই বন্ধনগুলিকে আমরা যদি অবিবেচনার সহিত সহসা পরিত্যাগ করিয়া, এদেশের পক্ষে অনুপযোগী হইলেও আপাতরমণীয় বলিয়া বিদেশীয় সমাজ-নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করি,তবে তাহাতে আমাদের কেবলমাত্র যে মূর্খতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, প্রত্যুত তাহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করা হয়। এই হিন্দু সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন নিয়ম থাকে, যাহা এক্ষণেই পরিত্যাগ না করিলে এই মুহূর্ত্তেই উৎসন্ন দশা ঘটিতে পারে, তবে তাহা অবশ্য অবিলম্বেই পরিত্যজ্য। কিন্তু যদি এমন কোন নিয়ম থাকে, যাহা এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ না করিলে সমাজ একেবারে উৎসন্ন যাইবে না, অথচ তাহা পরিত্যাগ করিলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে, তবে সে নিয়মটী ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করাইতে হইবে। ইহাও করিতে হইবে সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া এবং সমা-জের অভ্যন্তরস্থিত বলের দ্বারা। বিদেশীয় সমাজনিয়ম যদি প্রবেশ করানো নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা অতি সাবধানে করিতে হইবে—সহজে একদেশীয় সমাজনিয়ম অপর-দেশীয় সমাজে প্রবেশ করান উচিত নহে—তাহাতে কুফল প্রসব করে। আমাকে এত কথা বলিতে হইল, তাহার কারণ এই যে, কতক-গুলি ব্রাহ্ম-বন্ধু ভ্রমক্রমে সমাজসংস্কার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়া ও তৎসঙ্গে কতক-গুলি বিদেশীয় রীতিনীতি সমাজ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আপনা-দিগের উপর সমস্ত হিন্দুসমাজের বিদ্বেষ আনয়ন করিয়াছেন।

তাঁহারা ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহাকে তত বিশেষ মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি না—বরঞ্চ সময়ে সময়ে আমাদের অত্যন্ত শঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, জাতির সার্ব্বভৌমিকতা আনয়ন করিতে গিয়া বৈষ্ণবদিগের ন্যায় "ব্রাহ্ম" নামে একটী বিশেষ জাতি বা সংগঠিত হয়। এরূপ অভিনব জাতি উৎপন্ন হইলে, দূরদর্শী সাধু ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইবেন যে সমাজ মধ্যে আর এক বিষ-বীজ রোপিত করা হইবে—মঙ্গল কোথায় পলায়ন করিবে—অমঙ্গলের স্রোতই বৃদ্ধি পাইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ এই সকল ভবিষ্যৎ বিপদের সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধানে চলিতেছেন। এই কারণেই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে শাস্ত্রসঙ্গত হিন্দু অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি বাহির হইয়াছে। ইহাতে বিদেশীয় ভাবের কোন সংস্পর্শই নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষি, পুরাতন ঋষিদিগের পথ অনুসরণ করিয়াই এই অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি, যে সমাজের মঙ্গল-চ্ছায়ায় এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছি, এত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি, সেই সমাজের আচার ব্যবহার সকল রক্ষা করিয়া চলি—কেবল পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া। তবে যাহা নিতান্ত পরিত্যাগের উপযুক্ত হইবে, তাহা যেন ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করি—যেন সেই একটু খানি মন্দ পরিত্যাগ করিতে গিয়া সমুদয় সমাজের মর্ম্মগ্রন্থি সমূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া না ফেলি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমরা যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহারা বিরাম লাভ করিবে না। ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা যে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। এই

জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি নিত্যকাল হইতেছে এবং হইবে। একজন না গ্রহণ করিল অপর একজনে গ্রহণ করিয়া আরও উন্নতি করিবে। ফরাসিবিপ্লব হইয়া গেল—কারণ ফরাসি জাতি সাম্যভাবের মহা-মন্ত্র লাভ করিয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল না—তাহার অপব্যবহার করিয়া বসিল; কিন্তু সেই বিপ্লবের পর হইতে ইউরো-পীয় জগৎ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সংগঠিত হইল। একজাতির কাছে সাম্যভাব উপস্থিত হইল, সে জাতি গ্রহণ করিতে পারিল না—অপর দশ জাতি তাহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। সেই-রূপ আমরা যদিও এই পবিত্র ধর্ম্ম হস্তামলকের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াও উদাসীন হইয়া রহিয়াছি তথাপি ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছার বিরাম নাই। ব্রহ্মজ্ঞান এখন সমস্ত ভারতবর্ষকে পুনরায় সেই পুরাতন কালের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমরা যদিও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান বিষয়ে তত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেছি না, কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেকগুলি "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী" প্রভৃতি নামধারী সভা অনুষ্ঠানগুলি অপৌত্তলিক ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ধন্য হে পরমেশ্বর, তুমিই ধন্য; ইহাতে তোমারই অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে।

হে পরমাত্মন! তুমি যে কত উপায়ে আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া যাইতেছ, আমরা তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না। আমরা কত সময়ে জানিয়া শুনিয়াও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করি—আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই; কিন্তু আবার যেই চেতনা পাইয়া অমৃতের পিপাসু হইয়া আসি, তখনই তুমি রাশি রাশি অমৃতবারি প্রদান করিয়া আমাদিগের দগ্ধ হৃদয়কে শীতল কর। হে বলদাতা! আমাদিগের আত্মাতে এ প্রকার বল

দাও যে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি অনুষ্ঠানে তোমাকেই আহ্বান করিতে পারি। সমাজের ভয়েই হউক, কি পরিবারের ভয়েই হউক, কি সমস্ত জগতের ভয়েই হউক, কোন প্রকার ভয়েই যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার অবমাননা করিয়া, তোমারি সৃষ্ট বস্তু সকলকে তুমি বলিয়া আরাধনা করিতে না হয়—এ প্রকার সাহস দাও, বল দাও—হৃদয়কে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করিয়া দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের অন্তরায় বিষয়ক চতুস্ত্রিংশ বিবৃতি সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ বিবৃতি—ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। *

পল্লীগ্রামের অন্তরে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া হৃদয়ে যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র ভাব সকল পল্লীগ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধারণ হয় না। নরনারীগণ সকলেই যখন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের জয়ঘোষণা করিবে, সে দিন কি আনন্দের দিন হইবে। হিমালয়ের শেষ প্রান্ত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত—সমস্ত ভারতবর্ষ যখন ব্রহ্মের জয়গানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, যখন বিশকোটী

---

* রামপুর বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৩ শক পৌষমাসে বিবৃত।

ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপ্রসারিত হৃদয় হইতে ব্রহ্মমহিমা-গান সকল শ্রদ্ধাপ্রীতি-গদগদস্বরে উত্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিকট যাইতে থাকিবে, সে দিনের কথা স্মরণ করিলে শরীরে কি রোমাঞ্চ হয় না, আত্মায় কি অপূর্ব্ব বল আইসে না?

উপনিষদের কালে আমাদের এই আশা অনেক পরিমাণে সফল হইতেছিল; তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আশা সফল হইল না। যেমন একমুখী গভীর স্রোতস্বতীকে বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করিয়া দিলে সেই স্রোতস্বতীর স্রোত আর সেরূপ তীব্র থাকে না এবং সেই ভিন্নমার্গ-প্রস্থিত নদীশাখাগুলিও সেরূপ গভীর হয় না—পঙ্কিল হইয়া উঠে, সেইরূপ উপনিষদের পরবর্ত্তী দেশহিতৈষী লোকেরা পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞা-নের গভীর স্রোতকে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি নানা বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করিতে নানা কারণে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও এইরূপ উপায় তখনকার প্রবল নাস্তিকতাকে কতক পরিমাণে বাধা দিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষ মরুভূমি হইবার উপক্রম হইল।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা। তিনি ঠিক উপযুক্ত সময়ে ভারত-বর্ষকে উদ্ধার করিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শাখা-স্রোতের মুখবন্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোতকে পুনরায় একমুখী করিতে চেষ্টা করিলেন; ঈশ্বর তাঁহার এই শুভকার্য্যের সহায় হইলেন—তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার মস্ত-কের উপর দিয়া কত যে বিঘ্নবিপত্তির ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? তিনি এই সমস্ত বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম

করিয়াও বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর ব্রাহ্মসমাজে উন্নতির স্রোত কতকটা বন্ধ হইয়াছিল। তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে এইবারেই বুঝি ব্রাহ্মসমাজ গেল। কিন্তু একবার যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মনামের জয়পতাকা ভারতের মুক্ত গগনে উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন আর ইহা মৃত্যুমুখে যাইতে পারে না—ইহা অমৃতের নাম লইয়া অমর হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সেই ঘোর দুরবস্থার সময় পূজ্যপাদ পিতামহদেব সেই বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণা করিবার জন্য সমুদয় ভারতবর্ষকে আহ্বান করিলেন এবং চারিদিক হইতে সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তরও আসিতে লাগিল। আবার তাঁহার অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের খরস্রোত একটু মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়া আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই। আমরা যখন দুইবার দুইবার ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত দেখিতে পাইলাম তখন তৃতীয় বারই বা কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্ধার না করিবেন? এ বিষয়ে সন্দেহ হওয়াই আমাদিগের পাপ। আমরাও যদি আবার যথার্থ প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরাও ব্রাহ্মসমাজের উপর ঈশ্বরের সুবিমল প্রসাদ প্রত্যক্ষ অনুভব করিব। আজই যদি আমরা উৎসাহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হই, এই মুহূর্ত্তেই ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে এক মহান্ বল প্রদান করিবেন; সেই মহান বলের প্রভাবে আমরা সকল দেশকে একত্রিত করিব এবং সকল জাতিকে একত্রিত করিব এবং তখন মর্ত্ত্যলোকবাসী আমা-

দিগের দ্বারা সেই দেবদেব পরব্রহ্মের এরূপ জয়ঘোষণা হইতে দেখিয়া দেবলোক হইতে দেবতারা আনন্দিত হইবেন এবং আমাদিগের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। যাহাতে লোকে সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পবিত্র সহবাসে আনন্দ উপলব্ধি করেন; যাহাতে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন, এই সকলের উপায় করা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেবলমাত্র পরব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি নহে, কিন্তু যাহাতে দেশে দেশে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়, এ বিষয়েও চেষ্টা করা ব্রাহ্মসমাজের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। সকল প্রকার শুভ কার্য্যই ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য হইলেও তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য, মূর্ত্তিপূজা মনুষ্যপূজা বা দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে সেই দেবাধিদেব অনন্তদেবের পূজা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াই প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মকে, যিনি সকলের অন্তর্যামী, সেই ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাঁহারই চরণে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদিগের ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই কেন্দ্র ব্রহ্ম এবং সমুদয় সংসার পরিধি। কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কার্য্য করা আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমরা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কার্য্য করিলে কোন কার্য্যেরই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারিব না—কোন কার্য্যই স্থায়ী হইতে পারিবে না; সকল কার্য্যেই ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমরা সমাজসংস্কার করিতে যাই, রাজনীতিসংস্কার করিতে যাই অর্থাৎ আমরা সমাজকে রাজনীতিকে নিতান্ত সংকীর্ণভাবের পরিবর্ত্তে একটু মুক্ত ভাব দিতে যাই; কিন্তু যখন আমরা মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মকে আদর্শ করিতেছি না, সত্যস্বরূপকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে অগ্রসর হই না, তখন কিসের বলে, কিসের উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইব? সমাজকে মুক্ত করিব—কতটা মুক্ত করিব? আমার নিজের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবে আমি কোথা হইতে মুক্তভাবের আদর্শ (Ideal) পাই? আমি সমাজকে মুক্ত করিব—মিথ্যা হইতে; লইয়া যাইব কোথায়?—মুক্ত সত্যের দিকে। কিন্তু এই সত্যের আদর্শ কোথায় পাই? আমরা দেখি যে আমাদিগের আত্মা সীমাবদ্ধ হইয়াও অসীমের দিকে ছুটিয়া যায়; নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য দেখিয়া তাহাদিগের আদি কারণ এক মহান্ সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়—তখনই আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা বুঝিতে পারি যে এই সীমাবিশিষ্ট জগতের পশ্চাতে এক অনন্ত সত্যস্বরূপ মহান্ পুরুষ আছেন। আমরা যে কোন সংস্কার করিতে যাই না কেন, তাহা এই সত্য-স্বরূপ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পূর্ণপুরুষকেই আদর্শ করিয়া করিতে হইবে। ইহারি জন্য বলিতেছি যে অগ্রে ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা পাও, তবে সকল প্রকার উন্নতি, সকল প্রকার সংস্কার সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহা না হইলে উন্নতির ভিত্তিই দাঁড়াইতে পারিবে না। অতএব আইস, আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া আজ হইতেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে যত্নবান্ হই। আমরা যদি আমাদের স্বদেশের মঙ্গলকামনা করি, আমরা যদি আমাদের আত্মার মঙ্গলকামনা করি, তবে আমরা যেন কোন প্রকার ভয়ে

ভীত না হইয়া ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণা করিয়া কায়মনোবাক্যে সকলের হৃদয়ে ব্রহ্মনাম অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করি। সেই মুক্ত পুরুষের স্বাধীনভাব যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তবে আমরা অচিরাৎ সকল বিষয়েই স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে জাতীয় ভাবের উপযোগীরূপেই তাহা প্রচার করা সর্ব্বোত্তম প্রণালী। আমি যদি কতকগুলি মুসলমানের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া কোরাণের পরিবর্ত্তে হিন্দুশাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দেখাই,তাহা ভাল, অথবা আমি যদি কোরাণ হইতে দৃষ্টান্ত দিই, তাহা ভাল ? আমি যদিও উভয় পক্ষেই একই ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিতেছি ; কিন্তু যদি বাস্তবিক সেই মুসলমানের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করাইবার আমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শেষোক্ত উপায়ই যে প্রশস্ত উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নাই। সেইরূপ খৃষ্টীয়দিগের মধ্যে বাইবেল প্রভৃতি তাহাদিগের উপযুক্ত উপায়ের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক। আমরা হিন্দু, হিন্দু পরিবারে বেষ্টিত, হিন্দু আচার ব্যবহারে লালিত পালিত ; তখন স্বজাতীয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে গেলে হিন্দুর উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জ্ঞানভাণ্ডার মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র সকলকে অবমাননা না করিয়া, তাহার মধ্য হইতে সার সত্যগ্রহণে সচেষ্ট হইব এবং সেই সত্য সকল দেশীয় শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, দেশীয় ভাবের মধ্য দিয়া প্রচার করিলে সর্ব্বসাধারণে আগ্রহের সহিত ধারণ করিবে। দেখ, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতকে সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে প্রচার করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন। এদেশের শাস্ত্র যখন উন্নত মত সকল প্রচার করিতেছে, তখন সে সকল শাস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ করি-

বার প্রয়োজন কি? অল্পে অল্পে তাহার সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমরা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি অতি মহান্ সত্য-বাক্য সকল কত পূর্ব্ব হইতে পাইয়াছি ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এ সকল আমরা বিজাতীয় ধর্ম্ম অনুকরণ করিয়া প্রাপ্ত হই নাই। তবে কেন আবার আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে বিজাতীয় ভাবে পঙ্কিল করিয়া তুলিব? ধর্ম্মের মধ্যে বিজাতীয় ভাব বিজাতীয় আচার ব্যবহার বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইলে ধর্ম্ম বিকৃতভাব ধারণ করে। "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপ থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মো-পাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে।" *

আইস, আমরা আজ হইতেই পূর্ব্বতন মুনি ঋষিদিগের বহু সহস্র বৎসরের কঠোর তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানকে অবহেলা না করিয়া, প্রত্যুত তাহা হৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে আত্ম-সমর্পণ করি। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কর্ম্ম কাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল ব্রহ্মেতে লক্ষ্য স্থির করিয়া সকল শুভকর্ম্ম করিতে হইবে। এই সংসারের মধ্যে থাকিয়াও উপদেশের দ্বারা, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং আপনার আপনার জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত প্রভাব দেখাইয়া ইহার প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিব। আমরা

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম।

যে দিন হইতে ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে এই গুরুতর ভার আমাদের প্রত্যেকের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। আমরা যেন কেবলমাত্র প্রচারকদিগের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকি; ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথাযুক্ত অনুষ্ঠান করিলেই অচিরাৎ তাঁহারই প্রসাদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব। এই উন্নতির সীমা নাই—এই দীর্ঘপথের অন্ত নাই।

হে পরমাত্মন্! তোমারি কৃপায় আমরা তোমাকে জানিয়াছি এবং দেখ, এই বন্ধুবর্গে মিলিত হইয়া তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে আমাদের অন্তরে কি আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সে দিন কি আনন্দের দিন হইবে যে দিন গৃহে গৃহে ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং তোমার জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইবে—সে দিন কি অতুল আনন্দের দিন—ভাবিতে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। হে প্রাচীন ঋষিদের বলদাতা দেবদেব! আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ইচ্ছাতে তুমি বল প্রেরণ কর—ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ যখন তোমারই নিকটে লইয়া যাইবে, তখন কেন আমরা এই আনন্দের পথে না যাইয়া নিরানন্দসাগরে ভাসমান হই? তুমি আমাদের এই ভারতবর্ষের চিরন্তন দেবতা, তুমি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েশ্বর; আমরা জানি যে, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিলে আমরা নিরাশ হইব না। তাই হে দেবদেব পরমেশ্বর, আমরা সকলে যোড়হস্তে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগের এই ভারতভূমি হইতে অধর্ম্মের ভাব বিদূরিত করিয়া দাও এবং আমাদের শরীর, মন ও আত্মাতে এ প্রকার বল প্রদান কর যাহাতে তোমার কথা দ্বারা সকলের ধর্ম্মভাব আকর্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমাদিগের ধর্ম্ম-

ভাব বর্দ্ধিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত

ষট্‌ত্রিংশ বিবৃতি-কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে।*

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে নহে। কলিযুগের প্রারম্ভে সেই কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই অমূল্য মহাবাক্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আজ আমরাও বেদব্যাসের কৃপায় তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সেই মহাসমরক্ষেত্রে ইহার যেরূপ প্রয়োজন ছিল, আজও ইহার সেইরূপ প্রয়োজন আছে। ইহার প্রয়োজন প্রতি মুহূর্ত্তে, ইহার প্রয়োজন প্রতি যুগে। ইহার প্রয়োজন ভারতে, ইহার প্রয়োজন জগতের সর্ব্বত্র। এই মহাবাক্যটী সমগ্র গীতার সার। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিহিত কৌস্তুভমণি। ঈশ্বর স্বয়ং নিজ দৃষ্টান্তে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিতেছেন। মহামতি ব্যাসদেব ইহারই আদর্শপথে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মহাভারতের জ্বলন্ত ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিলেন।

* আন্দুল আত্মোন্নতি সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে ১৩০৪ সন ১২ পৌষ সায়ংকালে বিবৃত।

আমাদিগের বর্ত্তমান অবনতি কেবল এই মহাবাক্য অবহেলা করিবার কারণেই ঘটিয়াছে। আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা কর্ম্মে অধিকারের প্রতি তত নহে, যত কর্ম্মফলে অধিকারের প্রতি। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়সাগরমন্থনে এই মহাবাক্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সময়েও এই একই কারণে ভারত গুরুতর অবনতির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখনও অধিকাংশ ব্যক্তিরই লক্ষ্য কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মফলের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্ম্য উপায়ে রাজ্য অর্জ্জন করিতে গেলে কত যে তপস্যা চাই, কত বুদ্ধিপরিচালনা চাই, জগতের কত মঙ্গলকামনা চাই, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ সেই সকলের অর্জ্জনচেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক অতি সহজে অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাজ্যলাভরূপ ফললাভের কামনায় মুগ্ধ হইয়াই যত অমঙ্গলরাশি আনয়ন করিলেন। আর বর্ত্তমানে আমরাও কৌরবদিগের ন্যায় অত্যন্ত ফলকামী হইয়াই অবনতির পথে ছুটিয়া চলিতেছি। এই কারণে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" এই মহাবাক্যের সার্থকতা তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনিই আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা সর্ব্বরোগের মহৌষধ।

কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে মিথ্যারাশি প্রসূত হয় এবং বর্ত্তমানে সকলে যেন তাহাই প্রার্থনা করে। যে বিদ্বান নহে, সে বাক্যচ্ছটায় নিজের বিদ্যাবত্তা ফলাইয়া প্রশংসালাভের চেষ্টা করে; যে নির্ধন সে আপনাকে ধনী; যে ধার্ম্মিক নহে, সে আপনাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়। বর্ত্তমানের এমনই অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে যে মিথ্যা ভিন্ন সংসার যেন চলিতে চাহে না। সহজ সত্য কথাটী আমরা ভুলিয়া যাই যে মিথ্যা অবলম্বন করিলে আমাদের নিশ্চয়ই পতন—পতন

একেবারে অনিবার্য্য, কারণ মিথ্যা সত্য নহে, মিথ্যার অস্তিত্ব নাই। মিথ্যা অবলম্বনে অন্যকে প্রতারিত করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনার অধিক কিছু নহে এবং আত্মবঞ্চনার অপর নাম আত্মঘাতী হওয়া। প্রতারণা বা আত্মবঞ্চনা করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ বড় লোক হইতে পারে নাই; আত্মবঞ্চনা করিয়া এপর্য্যন্ত কোন জাতিই উন্নত হয় নাই। মিথ্যাবলম্বনে প্রতারণা বা আত্মবঞ্চনা করিয়া কিছু-তেই যে উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের অভ্যুদয় এবং স্পেন প্রভৃতি দেশের দুর্গতি আলোচনা করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

আমাদের ভারতবর্ষে এই সত্যের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অশ্রুসম্বরণ দুরূহ হয়। ভারতের রাজন্য-গণ যে ঘোরতর মিথ্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজন বিরোধ করিয়া পরস্পরের প্রতি যেরূপ কপটতা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, আমাদিগের সর্ব্ববিধ পরাধীনতা কি তাহা হইতেই প্রসূত নহে? সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় আমাদের মহাভারতে কেমন জ্বলন্ত ভাষায় আলিখিত হইয়াছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অনুচিত মায়ায় বশীভূত হইয়া স্বীয় পুত্রাদির অবলম্বিত মিথ্যার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার ফলে তাঁহার শতাধিক পুত্র সেই দীপ্তশিখা মিথ্যাগ্নির আহুতি স্বরূপে নিপতিত হইলেন; অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী সেনা সেই একই অগ্নিতে আহুতি নিক্ষিপ্ত হইল। অবশেষে সত্যপথের পথিক পাণ্ডবেরাই শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় ও ধর্ম্মের বলে রাজ্য লাভ পূর্ব্বক তাহাতে আপনাদেরই বংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। তাই মহাকবি ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন "যত্রায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথায় ধনুর্দ্ধর

অর্জ্জুন, আমার বিবেচনায় তথায়ই শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং ধ্রুব নীতি"।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

সেই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে ভারতে ধর্ম্ম ও নীতির দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল, সে দুর্ভিক্ষ যে আজও থামিতেছে না! দেশে দেশে, গৃহে গৃহে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা পুত্রে, স্বামীস্ত্রীতে আজ কত না বিরোধ বিষাদ হইতেছে! কিন্তু এই সকলের মূল কোথায়?—সেই কর্ম্মের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাজনিত মিথ্যার পদতলে মস্তকলুণ্ঠন। ভারতের ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিলে দেখা যায় যে এমন সময় গিয়াছে যখন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া গৃহস্বামী বিদেশে গেলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সকল চুরি করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না; আর আজ কিনা গৃহে গৃহে দ্বার সকল কুঞ্চিকাবদ্ধ, গৃহদ্বার মুহূর্ত্তের জন্য খুলিয়া রাখিতে কাহারও সাহস হয় না! অনৃত ভারতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে—ফলে, বিশ্বাস স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ মানুষকে ব্রহ্মলোকের যাত্রী করিতে পারে, সেই সকল সদ্‌গুণ বিলুপ্ত হইতেছে।

ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত লোকেরাও বর্ত্তমানের এই ভয়াবহ আবর্ত্তের পরিধি যে একেবারেই স্পর্শ করেন না, তাহা বলা যায় না। এরূপ কতশত ব্যক্তির ধর্ম্মধন যে ফলস্পৃহার উদ্দীপ্ত অগ্নিতে আহুতি পড়িয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এই অগ্নিতে বিদ্বানের বিদ্যা, ধনবানের ধন সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধর্ম্মও যে অধিকাংশস্থলে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না,

তাহাই আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয়, কারণ ধর্ম্মই সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি। আর হৃতসর্ব্বস্ব ভারতবাসীর ধর্ম্ম ব্যতীত আছে কি? তাহাও যদি হারাইয়া বসি, তবে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য কে আছে? তাই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্যই আমাদিগের এরূপ অনুরোধ। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা কাহার না আছে? কিন্তু ধার্ম্মিক হইবার ইচ্ছাটা যত সহজ, ধার্ম্মিক হওয়াটা যেন ততদূর সহজ নহে বলিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট সমগ্র জগৎ অবনতমস্তক—অনেক সময়ে প্রকৃত অপ্রকৃত নির্ব্বাচন করিবারও অবকাশ হয় না। ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য রক্ষা করিলেই প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায়, সভাসমিতি বা বক্তৃতা দ্বারা ধার্ম্মিক নাম পাইবার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মরক্ষা হয় না। এই জন্যই পুণ্যকীর্ত্তি ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখে সত্যই বলাইয়াছেন যে মনুষ্যসহস্রের মধ্যে এক আধজন মাত্র সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন এবং সেই চেষ্টাবান্ মনুষ্যদিগেরও মধ্যে মাত্র এক আধজন ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করেন। আমরা তো দেশ-বিদেশে কত সন্ন্যাসীকে অগ্নিসেবা করিতে দেখি, কিন্তু তাঁহারা যদি সকলেই নিরাকাংক্ষ নিস্পৃহ সন্ন্যাসী হইতেন, তাহা হইলে কি আর ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা, এরূপ ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ দেখিতে পাই-তাম? হইতে পারে যে সেই সকল সন্ন্যাসীদিগের অধিকাংশ বিপদের কশাঘাতে অথবা ধর্ম্মের উদ্দীপনায় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রথমে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন সেই পবিত্র আদিমভাব চিরস্থায়ী রাখিতে পারেন? শিষ্যবৃদ্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধার কঠোর তাড়না, এবং তজ্জন্য ধনসংগ্রহে কামনা প্রভৃতি নানাশিখ কামাগ্নিতে সেই আদিম ভাব

আহুতিস্বরূপে অর্পিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তখন কেবল মৃত সন্ন্যাসব্রতের কঙ্কালখানি পড়িয়া থাকে—তাহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক হইতে থাকে।

সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় গৃহস্থেরাও যদি ধার্ম্মিক নাম কিনিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইবার অভিলাষ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও নির্দ্বন্দ্ব ও বিগতস্পৃহ হইতে হইবে; নিঃস্বার্থপর ও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হইতে হইবে। নিজে চর্ব্যচোষ্য প্রভৃতি আরামদায়ক বস্তু সকল পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবেন, সামান্য উত্ত্যক্ত হইলেই দাসপরিজনের প্রতি রোষকটাক্ষে মর্ম্মভেদীস্বরে তিরস্কার করিবেন, আত্মীয়স্বজনকে দারিদ্র্যনিপীড়িত দেখিয়াও যশোলাভবশবর্ত্তী হইয়া, আপনার নামের জন্য পাগল হইয়া বাহিরের দশজনকে শত শত মুদ্রা দান করিবেন, এবং আবাল্যবার্দ্ধক্য পরের নিকট তোষামোদ শ্রবণ ও আত্মকাহিনী বর্ণন করিবেন, এরূপ হইলে গৃহস্থ ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। দানবশীভূত সেই বাহিরের দশজন মুখে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের নিকট, আত্মীয়স্বজনের নিকট এবং সর্ব্বশেষে অন্তর্যামী ভগবানের নিকট তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। তাঁহাকে সমদৃষ্টি হইয়া ন্যায়বিচার করিতে হইবে। পরিবারেরই হউক অথবা বাহিরেরই হউক, যে কেহ সত্যপথে চলিতে চাহেন এবং অপ্রিয় হইলেও নির্ভীকভাবে তাঁহাকে সত্যকথা শুনাইতে চাহেন তাঁহারই কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া প্রয়োজন হইলে নিজ সহায়হস্ত বিস্তার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সেই নির্ভীকতার কারণে বক্তার প্রতি বিরক্ত হইয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করিবার অথবা তাহাতে অসমর্থ হইলে তাঁহার

যথাসাধ্য অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে গৃহস্থ যোগীর উপযুক্ত কার্য্য হইবে না। যিনি নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ না হইতে পারিলেন, তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যাতাই হউন, সুপণ্ডিত শাস্ত্রবক্তাই হউন, অথবা রাশি রাশি শিষ্যসমন্বিত সম্প্রদায়েরই নেতা হউন, তাঁহাকে আমরা গৃহস্থ যোগী নামে অভিহিত করিতে পারিব না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমান কালে ভারতে প্রকৃত পরমহংসের ন্যায় এরূপ গৃহস্থ যোগীও অতীব দুর্লভদর্শন।

ধর্ম্মপদার্থ যেমন উচ্চ, তাহার বিঘ্নসকলও তেমনি গুরুতর ও সূক্ষ্ম —এত সূক্ষ্ম যে সহজে উপলব্ধ হয় না। সকল বিঘ্নের মূল ফলাকাঙ্ক্ষা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু বসন্ত যেমন কামদেবের প্রধান সহায় বলিয়া উক্ত আছে, সেইরূপ এই ফলাকাঙ্ক্ষার প্রধান সহায় তোষামোদ। প্রসিদ্ধিই আছে যে ত্রিলোকে কেহ দুশ্চর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার তোষামোদ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দিয়া তপোভঙ্গ করিতেন। তোষামোদের নিকট যখন দেবযক্ষ প্রভৃতি সকলেই পরাজিত, তখন দুর্ব্বল মানবের জয়াশা কোথায়? ধনী, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক প্রভৃতির মধ্যে ধার্ম্মিকেরই পক্ষে তোষামোদ সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। স্বর্গগত কোন গৃহস্থযোগী এই কারণে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন "তোষামোদ করিবে না, তোষামোদ চাহিবে না।" গৃহস্থ যোগীর, বিশেষতঃ ধনবান্ মর্য্যাদাবান্ গৃহস্থ যোগীর পক্ষে এই তোষামোদই বিশেষ অবধানের বিষয়। সন্ন্যাসীদিগের শিষ্যগণ বিভূতিযোগ ও তদানুষঙ্গিক ঐশ্বর্য্যলাভ অথবা কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় মধুময় স্তুতিবাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে অহমিকা-স্ফীত করিয়া তুলেন; তাহার পরিণামে

গুরু ও শিষ্য উভয়েরই যোগভ্রংশ ও দারুণ পতন। সেইরূপ তীর্থবায়-সের ন্যায় অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণ ধনবান গৃহস্থযোগীর শিষ্য সাজিয়া তাঁহাকে তোষামোদতৈল প্রদান করিতে থাকেন। ধর্ম্মের জন্য যে কেহই তাঁহার নিকটে আসেন না, তাহা নহে; তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই একটা না একটা স্বার্থ লইয়া আসেন। প্রকৃত ধর্ম্মেরই জন্য উপস্থিত হউন অথবা ধর্ম্মের নামে কোন স্বার্থ লইয়াই আসুন, অধিকাংশ ব্যক্তিই ধনবান গৃহস্থের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না এবং তাঁহার প্রত্যেক কথায় সায় দিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে তোষামোদ করিতেই অগ্রসর হয়েন। ধনী গৃহস্থ ধার্ম্মিক হইতে চাহিলে তাঁহার সিদ্ধির পথে এই সকল শিষ্যপারিষদ ব্যাঘ্র ও সর্পরূপে দণ্ডায়মান হয়। প্রকৃত সাধকের পক্ষে নির্জনতাই প্রার্থনীয় এবং পারিষদসমাগম ও তাঁহাদের মধুময় স্তুতিবাক্য সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মনু বলিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ অপমানকে আকাঙ্ক্ষা করিবে।"

ধর্ম্মপারিষদদিগের তোষামোদ এমনি গূঢ়ভাবে কার্য্য করে যে তাঁহাদিগের গুরু প্রথমতঃ অনেক সময়েই বুঝিতে পারেন না যে তিনি তোষামোদে ভুলিতেছেন এবং কিছু পরে বুঝিতে পারিলেও তাহার কর্ণরোচক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। এই কারণেই জগতে এবং বিশেষতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষে রাশি রাশি সম্প্রদায় উত্থিত হইতেছে, কিন্তু টিঁকিতে পারিতেছে না। কতকগুলি শিষ্যের গুরু অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেতা জনসাধারণ অপেক্ষা কিয়দ্দূর অধিক অগ্রসর হইয়া আপনাকে অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতে, মুখে না হউক, অন্তরে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন এবং স্তোতা ধর্ম্মপারিষদগণ মুখে দেখান যেন তাঁহাকে বাস্তবিকই

অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে মিথ্যার প্রতিষ্ঠা নাই, অভ্রান্তবাদের ভ্রান্তি অল্পদিনেই অপসারিত হইয়া উক্ত গুরু বা নেতার সত্যবিযুক্ত কঙ্কালনেতৃত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়। এই প্রকারের নেতা কথায় কথায় ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরেরই আদেশে অনুষ্ঠান করিতেছেন, ন্যায় কার্য্য হইলেও তাহা ঈশ্বরের আদেশ এবং অন্যায় কার্য্য হইলেও তাহা ঈশ্বরের আদেশ। তাঁহার ধর্ম্মপারিষদগণ যদি এই প্রকার আদেশের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন, অমনি তিনি বিরক্ত হইলেন এবং সপক্ষে বলিলেই সন্তুষ্ট। এই কারণে তাঁহারাও তাঁহার ভাল মন্দ সকল কথায় সায় দিয়া, তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশরূপে প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে তোষামোদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। যাঁহারা ঈশ্বরাদেশের এইরূপ আদর্শ সমর্থন করেন তাঁহাদিগকে ধিক্ এবং এইরূপ আদেশকেও ধিক্। এরূপ আদেশ আদেশের প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত নহে।

আমরা এরূপ আদেশের আদর্শে চলিতে পারিব না বটে কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরেরই আদেশে চলিব। নিষ্কাম ও নিস্পৃহ হৃদয়েই ঈশ্বরাদেশ স্বীয় সত্যসুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। সেই মনের নিয়ন্তা ভগবান নিয়তই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে শুভবুদ্ধির ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছেন, ইহারই সূত্রে আমাদিগের প্রত্যেককে তাঁহার সহিত জীবনে মরণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই শুভবুদ্ধির রশ্মি নির্ম্মল সূর্য্যালোকের ন্যায় সরল রেখাপাতে নিপতিত হয়। কোন স্থানে একটা ব-আকার কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক পাতিত করিলে অথবা সূর্য্যালোক একেবারেই প্রবেশ করিতে না

দিলে যেমন তাহার মঙ্গল ফল পাওয়া যায় না, সেইরূপ পক্ষপাত প্রভৃতির মধ্য দিয়া শুভবুদ্ধির রশ্মিকে পাতিত করিলে অথবা অশুভ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিলে তাহার শুভফল হয় একেবারেই পাওয়া যাইবে না অথবা আমরা আংশিকভাবে বিকৃত আকারে তাহা লাভ করিব। ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদিগের সরল শুভবুদ্ধিকে বিকৃত ভাবে উপস্থিত করে। নিস্পৃহ ভাবে কার্য্য করিলে পক্ষপাত প্রভৃতি দোষ আসিতেই পারে না। আমাদিগের নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগের কুকর্ম্ম করিলে চলিবে না; সেই শুভবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সত্যকে অবলম্বন করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ফলাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তোষামোদের প্রতি ঘৃণা হইবে, মিথ্যা আচরণ করিবার অবসর ঘটিবে না, হৃদয় ক্রমশই নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে এবং ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যাঁহারা কিছুরই প্রত্যাশী নহেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য ও সুখী কে? দুগ্ধফেণনিভ শয্যা ও ভূমিতল, রৌপ্যপাত্র ও অঞ্জলি যাঁহাদের নিকট তুল্যমূল্য তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য কে? তাঁহারাই সত্যের পথে সুদৃঢ় থাকিতে পারেন, তাঁহাদের মানুষকে ভয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

সত্যপালন করিতে কি ভয়—সত্যস্বরূপ যে আমাদের নিকটেই আছেন। তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদিগকে অভয় দিতেছেন।

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যাপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

সেই অন্তর্যামী ভগবান অন্তরে থাকিয়া অনাহতধ্বনিতে সর্ব্বদাই বলিতেছেন "হে ভদ্র, ভয় নাই—মনে করিও না যে তুমি একাকী আছ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে সাক্ষীস্বরূপে, রক্ষাকবচস্বরূপে অবস্থিত আছি।" এই কথাটি কেবল শুনিবার কথা নহে, বলিবার কথা নহে, ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার কথা—নিভৃত প্রদেশে শুভমুহূর্ত্তে শান্ত সমাহিতভাবে ধ্যানে বসিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই প্রীতি করিয়া তাঁহারই আদেশে চলিতে থাকিব। আর যদি ভয়ও করিতেই হয়, তবে তাঁহাকেই ভয় কর, যাঁহাকে ভয় করিলে "না থাকে অন্যের ভয়"। মানুষকে ভয় করিবে কেন? মানুষ অতি ক্ষুদ্র কীট। যে জগতের অন্তর্গত নক্ষত্রের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যেখানে নিত্য নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইতেছে, যে জগতের একটী কণা এই পৃথিবীরই সকল বিষয় এখনও আয়ত্ত হইতে পারে নাই, সেই জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট মানুষ —যে মানুষ আপনার সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত শরীরকেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, সেই মানুষকে ভয় করিতে হইবে? সম্মুখে এই যে অনাদ্যনন্ত মহাকাল পড়িয়া আছে, সম্মুখে এই যে অনাদ্যনন্ত মহান্ আকাশ পড়িয়া আছে, ইহার সম্মুখে ক্ষুদ্র দেহধারী নিতান্তপক্ষে শতবর্ষ পরমায়ুবিশিষ্ট মানুষকে ভয় করিতে হইবে? আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এক একটী আত্মা রহিয়াছে বলিয়াই ক্ষুদ্রদেহধারী হইলেও আমাদের গুরুত্ব আছে, ক্ষুদ্রকীট আমরা বিশ্ববিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে উদ্যত, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই সেই এক একটী আত্মা বলিয়াই, প্রত্যেকেই সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবের সন্তান বলিয়াই, মানুষের নিকট আমা-

দিগের ভয় পাওয়া কর্ত্তব্য নহে। মানুষের ভয় করিবই বা কেন? ভয়শীল মানবের মৃত্যুর অধিক ভয়ের কারণ কি আর কিছু আছে? কিন্তু একটী কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিলেই সে ভয় আর থাকিবে না—তাহা এই যে মৃত্যুতেও আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারিব না। জীবনেও যেমন তাঁহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ প্রেমবন্ধন দেখিতে পাই, মরণেও সেই প্রকারই বিশেষ প্রেমবন্ধন বর্ত্তমান থাকে। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা থাকি না, অথবা তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকেন না।

আজ এই যে সভার অধিবেশনে বন্ধুগণের সহিত আনন্দ উপ-ভোগ করিবার অবসর পাইয়াছি, এই সভার নামটী আমার বড়ই প্রিয়। আত্মোন্নতিতেই, প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নতিতেই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। আমরা যখন সেই হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ের পূজা দিতে পারিব; যখন সেই সত্যস্বরূপের নিকট মিথ্যারাশি বলিদান করিয়া নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে পারিব; শত বাধা বিঘ্নের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে নির্ভর করিয়া যখন কর্ত্তব্য পালনে পরাংমুখ হইব না তখনই দেখিতে পাইব যে, সত্যপালনে দৃঢ়ব্রত ভীষ্মদেবের মুখে যে অমানুষিক স্বর্গীয় প্রভা ক্রীড়া করিয়াছিল, কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব বল উদ্ভূত হইয়াছিল, আমাদেরও হৃদয়ে সেই অপার্থিব বল আসে কি না; আমাদেরও মুখে সেই দেবপ্রতিভা নামে কি না। এই সভার সভ্যগণ যদি নিষ্কাম ভাবে সত্যপালনে এইরূপ দৃঢ়ব্রত হয়েন, কর্ত্তব্যপালনে যদি এইরূপ নির্ভীকহৃদয় হয়েন, তবেই তাঁহাদিগের প্রকৃত আত্মোন্নতি সাধিত হইবে, এই আত্মোন্নতি

সভার নাম সার্থক হইবে এবং ইহার কার্য্যস্রোত এই গ্রামের এই দেশের মলিনতা দূর করিতে সমর্থ হইবে। পরিশেষে গীতার এই উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া উপসংহার করি—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

ভগবানের উপর সমস্ত কর্ম্মফল সন্ন্যস্ত করিয়া ফলাকাংক্ষারহিত হও, মায়া-বশীভূত হইওনা এবং শোকতাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হও।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে বিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ বিবৃতি—আনন্দাহ্বান।*

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্যপুত্রা॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং॥

শরতের এই সুমধুর প্রভাতকালে কাহার হৃদয় না সেই সূর্য্যের অন্তরাত্মার মহিমা গান করিতেছে? মলয়বায়ু সুদূর সাগরপার হইতে সংবাদ আনিতেছে যে এই মধুময় প্রভাতে সেখানেও সেই দেবদেবের অনন্ত মহিমা বিঘোষিত হইতেছে; আবার স্রোতস্বতী জাহ্নবী উদাসভাবের আবাসস্থান হিমালয় হইতে পুরাতন ঋষিদিগের

---

* ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

পবিত্র গান সকল লইয়া সাগরের সমীপে উপস্থিত করিয়া দিতেছে; বিমল আকাশ সেই দেবদেব পরমদেবের পদতল হইতে রোমাঞ্চ-শরীরে জগতের মহাগীত অবিশ্রান্ত শুনিতেছে। বোধ হয় এই-রূপ কোন শরতের প্রভাতে, মহাতেজের কণিকামাত্রে উদ্ভাসিত, কনকতপনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ কোন পুরাতন ঋষি আপনার হৃদয়ের গভীর সন্দেহের সহসা নিরাকরণ হইতে দেখিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন আলোকের দেখা পাইয়া জগতের উচ্চসিংহাসনে দাঁড়াইয়া সুগভীর বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামনিবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি॥

এমন জ্বলন্ত অগ্নিময় বাক্য কাহার হৃদয় হইতে বিনির্গত হইতে পারে?--যিনি ব্রহ্মরসামৃতপানে পূর্ণপ্রাণ হইয়াছেন; যিনি দিবানিশি বিশ্বপিতার ধ্যানে মুদিতনয়ন রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণ হইতে এরূপ সুগভীর তেজপূর্ণ বাক্য সকল বাহিরিতে পারে। কেবল যে সেই পুরাতন ঋষিদিগের মুখ হইতেই এইরূপ তেজোময়ী বাণী বিনির্গত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু আমরাও যদি সেই তেজো-ময় মহান্ পুরুষকে ধ্যান করি, তাঁহার প্রসাদে আমাদেরও হৃদয় হইতে জ্বলন্ত বাক্য স্বত উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিবে এবং সকলের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতে পারিবে। তবে ভাই সকল, আইস এমন মধুময় প্রভাত বৃথা যাপন না করিয়া সেই

পরম পিতার উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, হৃদয়কে উন্নত করি এবং সত্যব্যবহারকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া থাকি।

হে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ! সূর্য্য তোমারি জ্যোতির কণা-মাত্র গ্রহণ করিয়া জগৎকে আলোক প্রদান করিতেছে, চন্দ্রমা তোমারি অমৃতের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া জগতকে অমৃতবর্ষণ দ্বারা সুশীতল করিতেছে। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমার মহিমা সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে পারিব; তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমার আত্মাতে আবির্ভূত হও, তাহা হইলে স্বতই হৃদয় হইতে তোমার মহিমাগান উত্থিত হইয়া জগ-তকে অশ্রুজলে ভাসাইতে পারিবে। হে পরমাত্মন্! আইস তুমি হৃদয়ে আইস এবং তোমার বিষয়ে অবিশ্রান্ত গান করিবার ক্ষমতা প্রদান কর।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি
গ্রন্থে আনন্দাহ্বান বিষয়ক সপ্তত্রিংশ
বিবৃতি সমাপ্ত।

জীবনসমর্পণ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

জীবন সঁপিনু আজ,
তোমারি করিতে কাজ ;
তোমারি আশীষ পেয়ে,
প্রেমেরি মহিমা গেয়ে,
ঘুচাব বিরহ সাজ।
নয়নেরি জলে দেখিব যাহার
পাপতাপ ঝরে যায়,
ভাই ভাই বলে ডেকে লব তারে
আকুল মরম মাঝ।
ভ্রমিয়া অরণ্য সারা
আসিবে যে পথহারা,
তোমারি অমৃত নামে
জুড়াব তাহারি প্রাণে ;
বহিবে মিলন ধারা।
গাহিবে তখন বিশ্বচরাচরে
প্রেমেতে আপন-হারা ;
অসীম সে প্রেম ধরিয়া জীবনে
ভাঙ্গিব মোহেরি কারা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

বিজ্ঞাপন।

"অভিব্যক্তিবাদ" গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মতামত।

অভিব্যক্তিবাদ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২॥০ টাকা। গ্রন্থকার যোড়াসাঁকোর ৺দ্বারকা নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও ৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র। বলা বাহুল্য, ইনি ব্রাহ্ম-বংশীয়। ইহাঁর, অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পাশ্চাত্য দেশের ডারউইন, ওয়ালেস প্রভৃতি জীবের অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছেন। বাঙ্গালায় অবশ্য এ ধরণের পুস্তক নাই। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে একটা বড় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাতে নাস্তিকতা নাই, ইহাই একটা সুখবর। গ্রন্থকার যে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ সংক্রান্ত অনেক পুস্তকের আলোচনা করিয়াছেন তাহা এই আলোচ্য পুস্তক পাঠ করিলেই বুঝা যায়। জীবদেহ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক বিবরণের পরিচয় পাই। ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের সুসম্বদ্ধ প্রণালীগুণে এত বড় জটিল বিষয় বেশ সহজবোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকগুলি চিত্র আছে তবে, যুগাদি নির্ণয়ের তথ্যে, ইনি পাশ্চাত্য মতেরই অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। যাঁহারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ পুস্তকের বেশী আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা এ পুস্তক পাঠে প্রীতিলাভ করিবেন। ক্ষিতীন্দ্র নাথ নিজে অনেক নূতন কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার অনেক কথার সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও আমরা তাঁহার বলিবার প্রণালীটীর প্রশংসা করি।

বঙ্গবাসী ১৩১৩ সাল, ১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ।

অভিব্যক্তিবাদ।' শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর (বি এ) তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ২৷৷৹ টাকা (আপাততঃ অর্দ্ধমূল্য ১।৹ টাকা মাত্র) সুপ্রসিদ্ধ চার্লসডারউইন কর্ত্তৃক প্রকাশিত অভিব্যক্তিবাদ বা নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি-বিষয়ক মত এই গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বুঝান হইয়াছে। সেই সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জীবনসংগ্রামের মূলতত্ত্ব, পরিবৃত্তি (প্রাণরাজ্যের পরিবর্ত্তনের ক্রম), অভিব্যক্তিবাদের আপত্তিখণ্ডন, ভূগর্ভে অভিব্যক্তিবাদের সাক্ষ্য,প্রাণিদেহে বর্ণভেদের নিগূঢ় রহস্য, জড়সৃষ্টি হইতে প্রাণের উৎপত্তিকথা ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার,মানব শরীরের ও মানবাত্মার অভিব্যক্তি, আদিম মানবের স্থান ও কালনির্ণয়, আদিম মানবের আচার ব্যবহার, পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, জীবনমৃত্যু, পাপপুণ্য ও জড় আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সর্ব্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ ও বঙ্গের গৌরব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু মহোদয়ের আবিষ্কৃত তত্ত্বনিচয়ের বিষয় ৬৫টি খানি সুদৃশ্য ফুলপেজ হাফটোন চিত্র সহ বিবৃত করা হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চ্চায় যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ মাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদিগেরই নিকট এই পুস্তক নিঃসন্দেহে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থ খানিকে উপাদেয় করিবার জন্য ক্ষিতীন্দ্র বাবু যত্নের ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানের কোনও ধার ধারেন না, তাঁহাদিগের নিকটেও এই গ্রন্থ সরস ও বিস্ময়োদ্দীপক বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থকার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত সমূহ ভারতীয় ভাবে আলোচনা করিয়া উহার উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এরূপ শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থের প্রচার যত অধিক হয়, ততই মঙ্গল। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর নূতন

পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। আশা করি, তাঁহার অভিব্যক্তিবাদের বহুল প্রচার হইবে।

হিতবাদী, সন ১৩১৪ সাল ৩রা আশ্বিন, ১৯০৭ খৃঃ অঃ ২০ সেপ্টেম্বর।

"কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর পরিচয় দিতে হইবে না;—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এমন বিষয় নাই, যাহাতে এ বাড়ীর প্রতিপত্তি নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত, তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রতিভা সকলেরই জানা আছে। আমরা তাঁহার প্রণীত 'অভিব্যক্তিবাদ' নামক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থই নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় 'মানব-প্রকৃতি' নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা অভিব্যক্তিবাদের একটী অংশমাত্র এবং তাহাও ইংরাজী হইতে সম্পূর্ণ গৃহীত। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রবাবুও ইংরেজ গ্রন্থকারগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক মৌলিক কথারও অবতারণা করিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য, এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ ও বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত সমালোচিত হইয়াছে। এমন মূল্যবান পুস্তকের বিশেষ আদর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির মুল্য ২॥০ আড়াই টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু বহুল প্রচারের অভিপ্রায়ে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই পুস্তকখানি ১।০ পাঁচসিকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন।

সন্ধ্যা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল।

তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বিরচিত "অভিব্যক্তিবাদ" অর্থাৎ ক্রমবিকাশতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম। গ্রন্থকার এজন্য বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে বৈজ্ঞানিকদিগের প্রামাণ্য উক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে নিজ অভিজ্ঞতার কথাও অনেক সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উদ্ভিদ্ ও নিকৃষ্ট জীব জন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কপি, বন-মানুষ, আদিম মানবের অনেকগুলি ছবি ও অস্ত্রাদি ইহাতে তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালাতে এই প্রথম বলিতে হইবে। ক্রমবিকাশের মত সকল অবশ্য ইয়োরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ডারুইন, ওয়ালেস্ প্রভৃতি দ্বারা জগতে ইতঃপূর্ব্বেই প্রচা-রিত ছিল। কিন্তু গ্রন্থকার উহাকে এ দেশের প্রচলিত দশাবতার যথা—মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতির এক একটী যুগের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও পুরাণোক্ত এই সকল যুগের সহিত ভূগর্ভ নিহিত যুগস্তর সমূহের কতদূর ঐকমত্য আছে তাহা বলা অতি সাহসের কার্য্য, তথাপি ক্ষিতীন্দ্র বাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

বিশ্বের সমস্ত বিভাগের বিকাশ এবং উন্নতি একবারে হঠাৎ হয় নাই, ক্রমশঃ হইয়াছে; এ বিশ্বাস স্বাভাবিক এবং বহুল পরি-মাণে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। বর্ত্তমানে যে সকল উদ্ভিদ্, প্রাণী, নিকৃষ্ট জন্তু এবং শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতিকে দেখা যাইতেছে ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী অতি বিচিত্র বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। পৃথিবীর গঠন সময়ের (বর্ত্তমান অবস্থাপ্রাপ্তির পূর্ব্বের) জল বাতাস মৃত্তিকা উত্তাপ প্রভৃতির অবস্থোপযোগী জীবগণ ক্রমশঃ

এখানে দেখা দিয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া উদ্ভিদ্ এবং জীব জন্তু সকল ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পাঠকগণ আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ পাঠ করিলে এ সমস্ত বিষয়ে পরিষ্কার আলোক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিধাতা বিশ্বকর্ত্তা আমাদের সকলকেই সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এ বিশ্বাস যাঁহাদের আছে তাঁহারা নিরীশ্বর অভিব্যক্তিবাদে স্বভাবতঃই কিছু ভয় পান। এই ভয়ের কারণ অবশ্য সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ প্রণালী নহে। অতি নিকৃষ্ট জন্তুই ক্রমে কোটী কোটী বৎসরে রূপান্তরতি হইয়া যদি আত্মাবিশিষ্ট মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সূত্রে প্রমাণই হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কোন সৃষ্ট বস্তু বা মনুষ্য কি স্রষ্টাকে বলিতে পারে, "কেন তুমি এভাবে আমাদের সৃজন করিলে?" তিনি বিশেষভাবে এক একটী স্বতন্ত্র জাতীয় বৃক্ষলতা জীব এবং মনুষ্যকে একেবারে পূর্ণ বিকসিত নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত করিয়া যদি পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিতেন, তাহাতে যে গৌরব সম্ভ্রম বাড়িত ইহাতেও সেই গৌরব সম্ভ্রমই আছে। কারণ, যত প্রকার দুর্ব্বোধ্য দুর্লক্ষ্য অপূর্ণ এবং নিকৃষ্ট অবস্থার ভিতর দিয়াই কেন বিশেষ বিশেষ জীব জন্তু বস্তু ও ব্যক্তি পূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট অবস্থায় আসিয়া উপনীত হউক না, প্রত্যেক অবস্থায় বিধাতার ইচ্ছাশক্তি নিয়মাকারে অদৃশ্য হস্তের ন্যায় তাহাদের গঠনকার্য্য সমাধা করিয়াছে। কেবল মাত্র মৃত, অর্দ্ধমৃত কিম্বা জীবাদি (প্রাণপঙ্ক) নিজেরা সভা করিয়া আলোচনা এবং বিবেচনা পূর্ব্বক ইহা করে নাই। মূল উপাদান এবং জীবাদিতে গতি শক্তি গুণরূপে যাহা কিছু ছিল এবং

তাহাদের যোগ বিয়োগ মিশ্রণে যে কিছু গুণশক্তির মিশ্রফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই মাত্র সৃষ্টির সর্ব্বস্ব নহে তন্মধ্যে বিধাতার অভিপ্রায় মঙ্গল সঙ্কল্প এবং জ্ঞানশক্তি মানবের স্থূল বুদ্ধি ও বিচারদৃষ্টির অন্ত-রালে থাকিয়া চিরদিন এই বিচিত্র বিশ্বব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। নিরীশ্বর অভিব্যক্তিবাদ জ্ঞানান্ধের অনুমান মাত্র। ক্ষিতি বাবু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থে কিছু কিছু অতি সাহসিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মনুষ্য জাতি এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যস্থলের হারাণো সংযোগশৃঙ্খল যে পৃথিবীর কোন্ যুগস্তরে আছে তাহা অপরের ন্যায় ক্ষিতী বাবুও খুঁজিয়া পান নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কৃত বানরবৎ মানবের মানবোন্মুখী দেহকঙ্কালের ছবি কয়েকটী এ পুস্তকে আছে। তার পর আদিম মানবের আদি পিতার কোন চিহ্ন এ পৃথিবীতে নাই। বিধাতা এইখানে জ্ঞানীদের চক্ষে তাঁহার গূঢ় তত্ত্ব আজও প্রকাশ করেন নাই। তথাপি ক্রমবিকাশ তত্ত্ব সত্য এবং তাহা ঈশ্বরেরই স্বহস্তরচিত। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন,—"ডিম হইতে যন্ত্রসাহায্যে উত্তাপ দিয়া যেমন ছানা বাহির করা যাইতে পারে, সেইরূপ আশা করা যায় যে জীবাদি নির্ম্মাণ অথবা আত্মশক্তির উৎ-পাদন কালে সম্ভব হইলেও হইতে পারে।" এটা ভয়ানক সাহসের সিদ্ধান্ত। জীবাদি (Protoplasm) নির্ম্মাণ আর আত্মশক্তির উৎপাদন যদি কালবশে ডিম হইতে ছানা বাহির করার মত মানু-ষের দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ভগবানকে আর এ বৃদ্ধ বয়সে কিছু খাটিতে হইবে না, মানবপুত্রেরা তাঁহার সব কাজ চালাইবে।

নববিধান, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ, জুন।

অভিব্যক্তিবাদ (সচিত্র)—এই পুস্তক খানি ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র আদিব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রণেতা, কলিকাতা, যোড়াসাঁকো নিবাসী, শাণ্ডিল্যগোত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, তত্ত্বনিধি, কর্ত্তৃক বিরচিত। "অভিব্যক্তিবাদ" পুস্তক ১৮২৪ শকে, ৫০০৩ কলিগতাব্দে শুক্লপক্ষে শুভ মহাষ্টমীতিথিতে কন্যারাশিস্থ ভাস্করে আশ্বিনমাসে শুভ চতুর্ব্বিংশদিবসে শুক্রবারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকারের বিজ্ঞানভিক্ষু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের করকমলে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

এ বিষয়ে বাঙ্গালায় একখানি গ্রন্থের একান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল। সামাজিক বৈজ্ঞানিক সকল কথার সহিত এই অভিব্যক্তিবাদের বা ক্রমবিকাশের সংশ্রব। এখনকার দিনে সকল বিষয়েই এই নিয়ম খাটাইয়া দেখা হয়।

কিরূপ সরল ভাবে এই দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা এই পুস্তকে করা হইয়াছে কয়েকটী স্থল হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"জীবগণের বিশেষতঃ মনুষ্যের, উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, এই বিষয়টী বর্ত্তমানকালের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রার সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। * * * * অভিব্যক্তিবাদিগণ বলেন এইরূপে যোগ্যতম হইবার আকৃতি প্রকৃতি লাভ করিতে করিতে আদিজীবের বংশধরগণ ক্রমিক উন্নতিলাভ করিয়া মনুষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অভিব্যক্তিবাদ দেখায় যে জীবনসংগ্রামে পরিবৃত্তির উপযোগীতা অনুসারে যোগ্যতমের রক্ষা হয়। সুরক্ষিত বাগানের গোলাপ ফুলগাছ যখন মালীর যত্নে বৰ্দ্ধিত হয় এবং আগাছা সকল নির্ম্মূল হইতে থাকে তখনও যোগ্যতমের রক্ষা; আবার সেই বাগানে যখন মালী থাকে না, ঘাস নিড়ান বন্ধ হয়, তখন বেড়া ভাঙ্গিয়া যায়, জল দেওয়া বন্ধ হয়, তখন যাহা গোরুতে খাইতে পারে না বা জল দেওয়ার আবশ্যক করে না সেই সকল বৃক্ষ বা আগাছারাই তখনকার পরিবৃত্তির পক্ষে যোগ্যতম হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহারাই বাঁচে আর ভাল গাছ মরিয়া যায়।

পরাধীন দেশে পরাধীনচেতারাই সেই বিষম পরিবৃত্তির পক্ষে যোগ্যতম। তাহাদেরই রক্ষা হয়। স্বাধীনচেতারা হয় দেশত্যাগী হয়, নয় মারা যায়।

মুসলমানেরা ভারত অধিকার করিলে যে সকল রাজপুত অধীনতা স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছুক তাহারা মাড়োয়ারের মরুভূমিতে ও অর্ব্বলী পৰ্ব্বতের ধারে গিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিল। গঙ্গা যমুনাতীরের উর্ব্বর প্রদেশে ঐ স্বাধীনচেতাদের পরিবৃত্তি স্বাধীনতার একান্তই বিরোধী হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু অরণ্যে ও মরুভূমিতে উহাদের পরিবৃত্তি উহাদের রক্ষার পক্ষে, "তত" বিরোধী হইল না—কেন না মুসলমানেরা ঐ মরুভূমি অধিকারের জন্য "তত" অধিক চেষ্টাও করিল না, এবং যতটা করিল তাহা উহাদিগকে অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিয়াই করিতে হইল। যাহারা ধৰ্ম্ম পরিবর্ত্তন করিল, উহারা "রাজপুত মুসলমান" হইয়া কতকটা সুখে এবং যাহারা হতমান ও হতবীর্য্য হইয়া থাকিতে পারিল তাহারা অবজ্ঞাত হইয়া স্বদেশেই বাস করিতে পাইল। সেইরূপ তথ্য

বোয়ার ইতিহাসেও প্রমাণ করিতেছে। কেপকলনি ইংরাজাধিকৃত হইলে যাহারা উহাতে পরাধীন হইয়া বাস করা কষ্টকর মনে করিল তাহারা ক্রমান্বয়ে নেটালে, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট, ও ট্রান্সভালে সরিয়া সরিয়া গেল। এবারেও উত্তরে রোডিসিয়া দেশ ইংরাজের দখল না থাকিলে উহাদের কতক উত্তরের অরণ্যে ও প্রান্তরেই সরিয়া যাইত। এবারে তাহা হইতে পারিল না সুতরাং যাহাদের মন কিছুতেই ইংরাজের সহিত মিশিবে না তাহাদের দেশ ত্যাগ করিয়া একেবারে আমেরিকায় বা জাভায় যাইতে হইবে। যাহারা দেশে থাকিতে থাকিতে ক্রমে নরম হইয়া আসিবে তাহারা ক্রমে ইংরাজের সহিত মিশিয়া যাইবে। "তাহারা" যেমন আদর এখন পাইতেছে তেমনি পাইতে থাকিবে। বর্ত্তমান পরিবৃত্তির যোগ্য হইয়া উঠিয়া রক্ষা পাইবে। যাহারা বড়ই "মন গুমুটে" থাকিবে তাহারা কয়েক জন আবার একদিন হয়ত হঠাৎ একটা মারামারি করিয়া ফেলিয়া মারা যাইবে। উহারা বর্ত্তমান পরিবৃত্তির সম্বন্ধে কোন মতেই যোগ্যতম নহে। এইরূপ আমাদের দেশে স্বদেশদ্রব্যের প্রতি মমতা না থাকায় ও স্বজাতিপ্রীতির একান্ত অভাব থাকায় ও এখানে এ দেশের রাজব্যবস্থায় বৈদেশিক শিল্পের উপর কঠিন পরিমাণে শুল্ক অবধারিত না থাকায় বৈদেশিকেরা অবাধে বিলাতী বস্ত্র শস্তায় আনিতে পারিল এবং ভীষণ জীবনসংগ্রামে আমাদের পরিশ্রমী কিন্তু দলবন্ধনে অনভ্যস্ত তাঁতীরা তাহাদের বর্ত্তমান কঠিন পরিবৃত্তির যোগ্যতম নয় বলিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল। এ দেশের লোকের মধ্যে ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিপ্রীতি থাকিলে তাহা ঘটিতে পারিত না। "জর্ম্মনিতে প্রস্তুত" ছাপ দেখিলে ভাল ইংরাজে তাহা ক্রয় করেন না। উহাদের বাণিজ্যে

পৃথিবী ছাইয়া দিয়াছে। উহাঁদের শিল্পীদের গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টসাধ্য তবুও উহাঁদের এতটা যত্ন !

জর্ম্মনি ও আমেরিকা এক্ষণে ইংরাজি শিল্পের সহিত কতকটা প্রতিযোগিতা করিতেছে। উহাঁরা নিজেরা রক্ষণশীল। অপর জাতির শস্তা শিল্পের উপর কড়া শুল্ক লইয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উহাঁরা নিজেদের শিল্প রক্ষা করে। ইংরাজকেও হয়ত ঐরূপ করিতে হইবে। নচেৎ ইংরাজ শিল্পীদের পরিবৃত্তি তাহাদেরও জীবন-সংগ্রামে হয়ত রক্ষার উপযোগী হইবে না। এই ভয়ে এখন হইতেই মহা আন্দোলন উপস্থিত !

এদিকে আবার ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। স্বাধীনচেতা-দের পক্ষে পরাধীনতা স্বীকার অপেক্ষা দেশত্যাগ করাই ধর্ম্ম-কার্য্য। স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগ করাই ধর্ম্ম। রাজপুতগণ মুসলমান আমলে তাহা করিয়াছিল বলিয়াই রাজপুতানা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

অমন ভয়ানক মিউটিনীর মধ্যে ইংরাজ রাজ্যকে ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় ভারতবর্ষের যে অবস্থা হইয়াছিল তখন উহাতে যেরূপ পরিবৃত্তি, তাহাতে ফরাশি, পোর্টু-গীজ, ওলন্দাজ, মুসলমান, মারহাট্টা, গুর্খা, শিখ, মোগল ও পাঠান সকলের মধ্যে উহাঁরাই উদারতায় কার্য্যদক্ষতায় ও কর্ত্তব্যপালনের দৃঢ়তায়, যোগ্যতম বলিয়া ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছেন এবং উহাঁদের ক্ষমতা রক্ষিত ও বিস্তৃত হই-য়াছে।

এইরূপে সকল বিষয়েই এই অভিব্যক্তিবাদের সূত্র এবং "ধর্ম্মে রক্ষার" সূত্র অভিন্ন দেখা যাইবে। তবে "ধর্ম্মে রক্ষার" সূত্রে

"শেষ রক্ষা" এবং "ইহ পারলৌকিক রক্ষা" এই দুটিও আছে এবং উহাই ব্যাপকতর ও প্রকৃত সূত্র।

জীবনসংগ্রাম, ও পরিবৃত্তি ভিন্ন এই পুস্তকে আপত্তিখণ্ডন, ভূগর্ভে সাক্ষ্য, বর্ণভেদে জীবরক্ষা, ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার, মানবশরীরের অভিব্যক্তি, আদিম মানবের কথা, বামন অবধি কল্কিযুগ, অভিব্যক্তি-বাদ ও পাপ, জড় ও আত্মা—প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ইংরাজীর তরজমা নহে। ইংরাজী মত বুঝিয়া লইয়া শাস্ত্রীয় মতের সহিত সামঞ্জস্য চেষ্টা করিয়া লিখিত। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবেই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনা করিল এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে কার্য্যকারী হইতে পারিবে। "দশাবতারের সহিত বিলাতীবিজ্ঞানের যুগ" মিলানর চেষ্টা বেশ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে না হইলেও কতক কতক কথা মিষ্ট লাগিল। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও আস্তিক্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জন্মে।

এডুকেশন গেজেট সন ১৩১০ সাল, ১৯শে শ্রাবণ।

১। অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি, এ, তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ২৷৷০। বর্ত্তমান যুগের গল্প ও উপন্যাসময় বঙ্গীয় সাহিত্যে এরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা দেখিলেও মন হর্যোৎফুল্ল হয়। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে স্বীয় অভিমত সন্নিবেশিত করিয়া এবং অনেকগুলি সুন্দর প্রতিকৃতি যোজিত করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কেবল জীবদেহের অভিব্যক্তি বিবৃত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জড়, আত্মা, ও মৃত্যুর স্বরূপ, পাপ ও পুণ্যের

দায়িত্ব ইত্যাদিও আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন। আমাদের মতে গ্রন্থখানি আরও কিছু সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। গ্রন্থকার আনুষঙ্গিক অন্যান্য তত্ত্ব স্বতন্ত্র পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিলেই ভাল করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন "সত্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাস্তিকতা লাভও সহ্য হয়, সত্যানুসন্ধানে পরাংমুখ হইয়া আস্তিক্যাভিমানে জীবন্মৃত থাকা অসহ্য।" একথার আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যদি সত্যের স্রোতে পাপ, পুণ্য ও আত্মা সম্বন্ধে চিরন্তন সংস্কার, এমন কি, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণশক্তি মঙ্গলময় বিধাতার আসন পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়, তাহাতে দ্বিরুক্তি করা অর্ব্বাচীনতা মাত্র, কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে যুক্তি ও তর্কের পথ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। "অভিব্যক্তিবাদ" এর মত গ্রন্থের দুই এক অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিয়া জগৎ সমক্ষে "জীবনীশক্তি জড়শক্তিরই সংহত আকার মাত্র। আমাদের বিশ্বাস যে আমরা যাহাকে মানবাত্মা বলি, তাহাও জড়শক্তির সংহত আকার ব্যতীত আর কিছুই নহে" *** ইত্যাদি অভিমত বিজ্ঞানের পবিত্রনামে উপস্থিত করা আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। গ্রন্থকার কোথাও ঘোর অদৃষ্টবাদের পোষকতা করিয়াছেন, কোথাও বা অপরিস্ফুটরূপে মানবকে পুরুষকারের বৈজয়ন্তী পতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। যখন গ্রন্থকারের নিজের মনেই এইরূপ অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তখন এরূপ গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের অবতারণা না করিলেই ভাল হইত।

মানবদেহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষকগণ যতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, সাধারণ মানবসমাজ কখন ততদূর হইবে কি না সন্দেহ। বনমানুষ বা বানর হইতে মানবদেহের

উৎপত্তির সম্ভাবনা বরং স্বীকার করা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র মক্ষিকা বা সলিলস্থ ক্ষুদ্র কীটাণু যে মানবের পূর্ব্ব পুরুষ কিম্বা একই পূর্ব্ব পুরুষের বংশজাত জাতি, অথবা সমস্ত জীব জড়পদার্থের অভিব্যক্তি মাত্র, এইরূপ মতের আরও সমীচীন প্রমাণ আবশ্যক। দশাবতার-বাদের সহিত জীবদেহের অভিব্যক্তির সামঞ্জস্য বর্ণন আমাদিগের ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু অভিব্যক্তির সূত্র-ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার নিজে যে সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিরই যে প্রাসঙ্গিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। গ্রন্থকার দক্ষিণে বা বামে লক্ষ্য না করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বীয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ধীরে ধীরে পরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত করিলে গ্রন্থ উৎকৃষ্টতর হইত। মঙ্গলময় বিধাতার নাম যতই পবিত্র ও মধুর হউক, যাত্রার দলের অধিকারীর ন্যায় প্রস্তাবিত বিষয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে অসংলগ্নভাবে তাহার উচ্চারণ বা অপব্যবহার (?) বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে শোভা পায় না।

গ্রন্থের ভাষা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপযোগী, কিন্তু স্থানে স্থানে বিসদৃশ প্রয়োগও আছে। "জগতে যোগ্যতমের উদ্বর্তনে এই নিয়মেরই প্রাধান্য উপলব্ধি করি" এবং "ধাত-চারার নাগাল না পায়" একই পৃষ্ঠায় পরস্পর নিকটবর্তী থাকিয়া যেন কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। এইরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রণয়ন জন্য বঙ্গভাষা গ্রন্থকারের নিকট ঋণী থাকিবে। মূল্য ২৷৷০ টাকা কিছু অতিরিক্ত বোধ হইল।

নব্যভারত—১৩১১ আষাঢ়।